দশকথা

শাইখুল ইসলাম মুফতী তাকী উসমানী

প্রকাশক : মুহাম্মাদ আশরাফুল আলম

প্রথম প্রকাশ : জুমাদিউস সানী–১৪৩৫ হি., এপ্রিল–২০১৪ ঈ.

কম্পোজ ও ডিজাইন : জামেয়া কম্পিউটার এন্ড গ্রাফিক্স, বগুড়া

মূল্য : দুইশত (২০০) টাকা মাত্র

পাথেয় প্রকাশন
বগুড়া, বাংলাদেশ
০১৮১৮-৩২০ ৬৭৫

একমাত্র পরিবেশক
দারুল কুরআন
ইসলামী টাওয়ার, (দ্বিতীয় তলা)
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৭৩৩-১৮ ১৫ ৯৭

কিছু কথা...

একাধিক লেখক ও অনুবাদক তৈরি করা এবং আলেম-উলামাকে এই ময়দানে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এক মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় **'পাথেয় প্রকাশন'**। অনেকেই এগিয়ে এসেছিলেন। তাদের মাধ্যমে অনুবাদ করে নেয়া হয়েছিল। বিশেষ করে মুফতী তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম-এর 'ইসলাহি খুতুবাত' থেকে দশটি বয়ান অনুবাদ করিয়ে নেয়া হয়েছিল নবীন-প্রবীন দশজন আলেম দ্বারা। পাঁচ টাকা দামের সেই ছোট্ট বইগুলো দেশের বিভিন্ন জেলায়ও পার্সেল করে পাঠাতে হয়েছে। উত্তরবঙ্গে বইয়ের পাঠক বৃদ্ধিতে পাথেয় প্রকাশনের অবদান অস্বীকার করতে পারবে না কেউ। চাহিদার প্রতি লক্ষ্য করে দশ-বার আইটেম বই, ষাট থেকে সত্তর হাজার ছাপানো হয়েছিল। উচ্ছ্বাসী অনেক পাঠক রাত বারটা-একটার সময় ফোন করে বলেছে, 'ভাল লাগল, ছোট্ট বইটি এক বৈঠকে পড়ে ফেললাম। বিভিন্ন বিষয়ে এরকম আরো বই করা দরকার। ঘুমের ব্যঘাত ঘটালাম, ক্ষমা করবেন।'

পাঠকের অনুরোধে এবং সংগ্রহ ও সংরক্ষণের সুবিধার্থে আমরা দশটি বয়ান একত্র করে **'দশকথা'** নামে ছাপার আগ্রহ এবং উৎসাহ পেয়েছি।

শাইখুল ইসলাম তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম-এর পরিচয় দেয়ার দরকার নেই। তার বয়ানের গুণাগুণ সম্পর্কেও বলতে হবে না। পাঠক! আপনি নতুন হলে বলব, একটি বয়ান মনোযোগ দিয়ে পাঠ করুন। আল্লাহ তাআলা এই মহান মনীষীকে আমাদের মাঝে আরো দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রাখুন, তার থেকে উম্মত যেন বেশি থেকে বেশি উপকৃত হতে পারে, সেই তাওফীক দান করুন।

পরবর্তী সংস্করণে নতুন কাজ তো অবশ্যই করা হয়েছে। আয়াত ও হাদীসের হাওলা দেয়া হয়েছে। ভুলগুলো ঠিক করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবুও...। কারো দৃষ্টিতে কোন অসংগতি দেখা দিলে বন্ধুত্বপূর্ণ দাবী থাকল, আমাদেরকে জানান, আমরা পরবর্তীতে শুধরিয়ে নেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ।

সংশ্লিষ্ট সকলকে আল্লাহ তাআলা ধারণার চেয়েও বেশি, তুলনার চেয়েও অধিক প্রতিদান দান করুন। আমাদের সকলকে সঠিকভাবে দ্বীন মেনে চলার এবং ঈমান নিয়ে দুনিয়া ত্যাগ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

মুহাম্মাদ আশরাফুল আলম
পাথেয় প্রকাশন, বগুড়া
২৪-০৪-২০১৪ ঈ.

সংক্ষিপ্ত সূচীপত্র

আখেরাত ....-৩
পাপ থেকে মুক্তির পথ ....-২৩
পিতা-মাতার সেবা : জান্নাত লাভের পথ-৪৭
যাকাত আদায়ের সঠিক পদ্ধতি ....-৬৯
অনাবিল সুখের ঠিকানা ....-৯৩
প্রিয়জনের অধিকার ....-১১৩
বিয়ে ....-১৩৩
ধ্বংসাত্মক একটি ব্যাধি : হিংসা ....-১৫৫
গীবত : একটি ভয়ঙ্কর গুনাহ ....-১৭৭
মৃত্যু আসছে : আপনি কি প্রস্তুত ....-২০৩

আখেরাত

শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
অনুবাদ : মুহাম্মাদ আশরাফুল আলম

প্রথম প্রকাশ : জুলাই– ২০০৬ ঈ.
দ্বিতীয় প্রকাশ : মার্চ– ২০০৭ ঈ.

সূচী

আমাদের একটি ব্যাধি-৭
এ ব্যাধির চিকিৎসা-৮
কোন আনন্দই নিষ্কলঙ্ক নয়-৮
তিন জগত-৯
আখেরাতের খুশি পরিপূর্ণ-১০
মৃত্যু সুনিশ্চিত-১১
হযরত বাহলুল রহ.–এর ঘটনা-১২
মৃত্যুকে স্মরণ করুন-১৩
হযরত ওমর ফারুক রাযি.-এর ঘটনা-১৪
অন্য একটি ঘটনা-১৫
আখেরাতের চিন্তা-১৬
এ চিন্তা কীভাবে আসবে-১৬
সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা-১৭
যাদুকরদের দৃঢ় ঈমান-১৮
সোহবতের উপকারিতা-১৯
বর্তমান পৃথিবীর অবস্থা-২০

অনুবাদকের কথা

আজ আমাদের ব্যক্তিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবন বিপন্ন। খুন-খারাবী, দুর্নীতি ও সুদ-ঘুষের বাজার রমরমা। রক্ষকরাই বনেছে ভক্ষক। যাদের সহযোগিতায় জনগণ সুখ, শান্তি ও নিরাপত্তার মুখ দেখবে, সুন্দর জীবন বির্নিমাণ করবে, তারাই আজ জীবনের যম বনেছে।

আর এর একমাত্র কারণ আমাদের 'আখেরাত-বিস্মৃতি।'

আজ আমরা আখেরাত ও আল্লাহর সামনে জবাবদিহিতার কথা বেমালুম ভুলে গেছি। ফলে আজ আমাদের এ অবস্থা। পতিত এ অবস্থা থেকে মুক্তির পথ কি?

এ সম্পর্কে বর্তমান সময়ের অনন্য ইসলামী ব্যক্তিত্ব শায়খুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী 'ফিকরে আখেরাত' নামক বয়ানে দাঈর দরদ নিয়ে আলোকপাত করেছেন এবং বর্তমান সমাজ ও সময়ের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী যুগান্তকারী দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। 'আখেরাত' উল্লেখিত বয়ানেরই সরল অনুবাদ।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এর মাধ্যমে আখেরাতের ফিকির ও আল্লাহর সামনে জবাবদিহির অনুভূতি জাগ্রত করুন। আমীন ॥

মুহাম্মাদ আশরাফুল আলম
ইসলামপুর, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ
০৬.০৬.০৬ ঈ.

তোমাদের আসল ব্যাধি হল, তোমরা প্রতিটি ক্ষেত্রে পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী জীবনকে প্রাধান্য দাও। পৃথিবীর অস্থায়ী জীবন নিয়ে মশগুল থাক। পার্থিব কল্যাণ, উপকার, উন্নতি ও স্বচ্ছলতার চিন্তায় বিভোর থাক। তোমরা আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনের উপর প্রাধান্য দাও পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী জীবনকে। আর এটাই হল তোমাদের আসল ব্যাধি। মৌলিক সমস্যা।



আখেরাত

আমাদের একটি ব্যাধি

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى

'বস্তুত তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও, অথচ পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী।' (সুরা ৮৭ আল-আ'লা-১৬, ১৭)

পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত যত ছোটই হোক না কেন, কিন্তু তার অর্থ ও উদ্দেশ্য এত ব্যাপক যে, গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সেই একটি আয়াতই একজন মানুষের গোটা জীবনের সংবিধানে পরিণত হবে।

উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তাআলা আমাদের মৌলিক একটি ব্যাধি চিহ্নিত করে দিয়েছেন। যা আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ধ্বংস ও বিলুপ্তি ডেকে আনে। আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে রোগ নির্ণয়ের সাথে সাথে ঔষধও বলে দিয়েছেন। আর এটাও বলে দিয়েছেন যে, তোমাদের মধ্যে এই এই খারাবী রয়েছে। যা থেকে মুক্তির পথ এই...

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

তোমাদের আসল ব্যাধি হল, তোমরা প্রতিটি ক্ষেত্রে পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী জীবনকে প্রাধান্য দাও। পৃথিবীর অস্থায়ী জীবন নিয়ে মশগুল থাক। পার্থিব কল্যাণ, উপকার, উন্নতি ও স্বচ্ছলতার চিন্তায় বিভোর থাক। তোমরা আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনের উপর প্রাধান্য দাও পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী জীবনকে। আর এটাই হল তোমাদের আসল ব্যাধি। মৌলিক সমস্যা।

এ ব্যাধির চিকিৎসা

এ ব্যাধির চিকিৎসা হল– একটু ভেবে দেখুন, আপনাদের এত দৌড়-ঝাঁপ, প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা, অমানুষিক খাটুনী– সবই পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী স্বচ্ছলতা ও সুখের জন্য। বাড়ী-গাড়ী, টাকা-পয়সা, ইজ্জত-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি, পদ-পদবী ও যশ-খ্যাতি অর্জন সব কিছুর কেন্দ্রবিন্দু পার্থিব জীবন।

কিন্তু কখনো কি একটু ভেবে দেখেছেন, যার জন্য এত কিছু করছেন, হালাল-হারাম বৈধ-অবৈধ একাকার করে ফেলছেন, মারা-মারি, ঝগড়া-বিবাদ করছেন, সে জীবন কত ক্ষণস্থায়ী? আর মৃত্যুর পরের আসন্ন জীবন কত দীর্ঘস্থায়ী?

কোন আনন্দই নিষ্কলঙ্ক নয়

মনে রাখবেন, পৃথিবীর কোন সুখ-আনন্দই স্থায়ী, পরিপূর্ণ ও নিষ্কলঙ্ক নয়। আনন্দের সাথে বেদনা, হাসির সঙ্গে কান্না, সুখের সঙ্গে দুঃখ, স্থিরতার সঙ্গে অস্থিরতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দুনিয়ার কোন স্বাদ স্থায়ী নয়। সুস্বাদু খাবার উপস্থিত। পেটে প্রচণ্ড ক্ষুধাও আছে। রুচিও আছে। কিন্তু মাথায় টেনশন থাকার কারণে সুস্বাদু খাবার খেতে পারছেন না। রুচিকে বিকৃত করে দিচ্ছে। পৃথিবীর সব সুখ, খুশি ও আনন্দের বিষয় এমনই।

মানুষ মনে করে ধন-সম্পদ থাকলে শান্তি আসবে। স্থিরতা আসবে। অন্তরে প্রশান্তি লাভ হবে। কিন্তু বড় বড় ধনকুব, মিল-কারখানা ও ইন্ডাষ্ট্রির মালিকদেরকে দেখুন। বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হবে যে, তাদের মিল-কারখানা, বাড়ী-গাড়ী, চাকর-চাকরানী, প্রভাব-প্রতিপত্তি সুখের সমস্ত উপকরণাদী পর্যাপ্ত পরিমাণ বিদ্যমান, কিন্তু বাস্তব সত্য হল রাতে মালিক সাহেবের ঘুম হয় না। ঘুমের বড়ি খেয়ে ঘুমাতে হয়। ডাক্তার দেখাতে হয়, চেকাপ করাতে হয়। ইত্যাদি নানাবিধ পেরেশানীতে তাদের জীবন ওষ্ঠাগত।

আরামদায়ক বিছানা-পত্র ও ইয়ারকন্ডিশন আছে। কিন্তু ঘুম আসে না। এর চেয়ে বড় অশান্তি আর কী হতে পারে?

অপরদিকে একজন দিনমজুর ও কৃষকের অবস্থা? তার আরামদায়ক বিছানা, মশারী, ইয়ারকন্ডিশন কিছুই নেই, কিন্তু মাথার নিচে হাত রেখে সারারাত ঘুমাচ্ছে। কী আরামের ঘুম! প্রশান্তির ঘুম! এক ঘুমেই সারা রাত কেটে যাচ্ছে।

আপনারাই বলুন, রাত্রিটি ভাল কাঁল কার? ধনাঢ্য ব্যক্তির? না কি দরিদ্র, দিনমজুর ও খেটে খাওয়া মানুষের?

আসল কথা হল, পৃথিবীর কোন সুখ, খুশি এবং আনন্দ পরিপূর্ণ ও স্থায়ী নয়। এমনটিই আল্লাহ্ তাআলার ফায়সালা।

তিন জগত

আল্লাহ তাআলা তিনটি জগত সৃষ্টি করেছেন।

এক. জান্নাত।

যেখানে শুধু সুখ আর সুখ। শান্তি আর শান্তি। কোন দুঃখ নেই, কষ্ট নেই। নেই কোন চিন্তা ও টেনশন।

দুই. জাহান্নাম।

যেখানে শুধু কষ্ট আর কষ্ট। দুঃখ আর দুঃখ। অশান্তি আর পেরেশানী। সুখ ও আনন্দের ছিটেফোঁটাও সেখানে নেই। এমন দুঃসহ নর্দমা থেকে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাজত করুন। আমীন।

তিন. পৃথিবী।

দুঃখ এবং সুখের মিলনস্থল। এখানে সুখ আছে, দুঃখ আছে। কষ্ট আছে, শান্তি আছে। শুধু শান্তিও নেই, শুধু কষ্টও নেই। পৃথিবীতে উভয় অবস্থারই মুখোমুখি হতে হবে। এজন্য কেউ যদি পৃথিবীতে শুধু সুখ ও আনন্দ কামনা করে, চায় যে, দুঃখ-কষ্ট তার ধারে কাছেও না আসুক, তার ইচ্ছার বিপরীত কিছু না হোক। তাহলে সে পৃথিবীর বাস্তবতা সম্পর্কে অজ্ঞ। কারণ, পৃথিবীতে এমনটি হবে না, হতে পারে না।

সাধারণ মানুষের কথা বাদই দেয়া হোক, স্বয়ং আল্লাহর প্রিয় বান্দা-নবীগণ এ পৃথিবীতে আগমনের শুরু থেকেই দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হয়েছেন। নির্যাতিত হয়েছেন। হয়েছেন বেদনাহত।

পৃথিবীতে শুধু আনন্দ আর সুখই যদি কারো প্রাপ্য হত, তবে আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণই এর বেশি হকদার ও উপযুক্ত ছিলেন। অন্য কেউ নয়। কিন্তু বাস্তব সত্য হল, তারাও দুঃখ-কষ্ট সয়েছেন। নির্যাতিত হয়েছেন, এমনকি শহীদও হয়েছেন।

হযরত নবী কারীম সা. ইরশাদ করেন–

أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ

‘এ পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি পরীক্ষা নবীগণের উপর এসেছে। এরপর নবীগণের প্রিয় থেকে প্রিয়তম ব্যক্তিদের উপর।’

(সুনানে কুবরা নাসাঈ শরীফ, হাদীস-৭৪৮২)

আমি বলেছি যে, পৃথিবীর কোন সুখ-শান্তিই দীর্ঘস্থায়ী ও পরিপূর্ণ নয়। সুখ ও আনন্দ এখন পেয়ে থাকলেও একদণ্ড পর থাকবে কি না তার কোন নিশ্চয়তা নেই। হতে পারে এখন, একটু পর, এক মাস, এক বছর অথবা আরো কিছুকাল পর তা শেষ হয়ে যাবে। মোটকথা পৃথিবীর সুখ এবং দুঃখ একটিও স্থায়ী নয়।

আখেরাতের খুশি পরিপূর্ণ

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, আখেরাতের জীবন ভাল, উত্তম। অর্থাৎ পরিপূর্ণ, স্থায়ী ও অনিঃশেষ। সেখানকার সকল নেয়ামত চিরদিনের জন্য। কখনো তা শেষ হবে না। ফুরাবে না।

একটি হাদীসের বিষয়বস্তু এমন– ক্ষণস্থায়ী এ পৃথিবীর কোন কোন খাদ্য ভাল লাগে, খাওয়ার ইচ্ছে হয়। এক প্লেট খেলেন, দুই প্লেট খেলেন, খেতে খেতে এক সময় পেট ভরে যাবে। তখন আর খেতে চাইলেও আর খেতে পারবেন না। সুস্বাদু খানাও বিস্বাদ মনে হবে।

অথচ একটু পূর্বেও এই খানার প্রতি আপনার প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল। খাবার জন্য মন আঁকুপাঁকু করছিল। জিহ্বা নাচা-নাচি করছিল। কিন্তু একটু পরই তার প্রতি ঘৃণা জন্ম নিল। এখন আর খাওয়ার ইচ্ছা নেই। কেউ পুরস্কার দিলেও আর খাবেন না।

কেন এমন হল? কারণ, পেটের একটা পরিমাপ ছিল। তা পূর্ণ হয়েছে। আর জায়গা নেই, তাই খেতে পারছেন না। কিন্তু জান্নাতে যে খাদ্য-খাবার সামনে আসবে, সেখানে এমনটি হবে না। অতৃপ্তি হবে না। পেটও ভরবে না, অনীহাও সৃষ্টি হবে না। কারণ, জান্নাতের সুখ-শান্তি, আরাম-আয়েশ, স্বাদ ইত্যাদি পরিপূর্ণ ও স্থায়ী। অফুরন্ত। এজন্য আল্লাহ তাআলা আখেরাতকে উত্তম ও স্থায়ী বলেছেন। দুনিয়া এমন নয়। তবুও আমরা পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী এ জীবনকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকি। আর আখেরাতের চিন্তাই করি না।

এ আয়াতে আমরা চিন্তা করলে দেখতে পাব যে, আল্লাহ্ তাআলা এ ছোট্ট একটি আয়াতে আমাদরে সমস্ত রোগ, রোগের উৎপত্তিস্থল, তার চিকিৎসা এবং ঔষধপত্র সব বলে দিয়েছেন।

মৃত্যু সুনিশ্চিত

পৃথিবীতে মৃত্যুর মত সু-নিশ্চিত কোন বস্তু নেই। সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, ‘প্রতিটি মানুষের মৃত্যু একদিন হবেই।’ এরচেয়ে সত্য ও সু-

নিশ্চিত আর কিছু নেই। এটা এমন একটি বিষয় যা মুসলমান, হিন্দু, খৃষ্টান, কাফের-মুশরিক নির্বিশেষে সকলেই মানতে বাধ্য।

পৃথিবীতে এমন কোন বুদ্ধিজীবীর আগমন ঘটেনি, যার মত ও দর্শন হল- 'মানুষের মৃত্যু হবে না।'

মানুষ নবী-রাসূলকে অস্বীকার করেছে, আল্লাহকে অস্বীকার করেছে, কিন্তু মৃত্যুকে অস্বীকার করেছে এমন কেউ পৃথিবীতে আজও আগমন করেনি, করবেও না। বড় বড় নাস্তিক, পথভ্রষ্ঠ, খোদাদ্রোহী কেউই মৃত্যুকে অস্বীকার করেনি। সকল বিষয়ে মতানৈক্য থাকলেও এ ব্যাপারে সকলেই একমত– 'মৃত্যু একদিন আসবেই, আমাকে মরতে হবেই।'

মৃত্যুর দিন-ক্ষণের ব্যাপারেও সকলে একমত যে, 'এর কোন নির্ধারিত সময় বা মৌসুম নেই।'

সাইন্স উন্নতি করেছে, মানবজাতি চাঁদের দেশে পৌঁছেছে, জয় করেছে মঙ্গলগ্রহও, অত্যাধুনিক কম্পিউটার তৈরি করেছে, সৃষ্টি করেছে কৃত্রিম মানব। তারা সবই করেছে, কিন্তু কোন বিজ্ঞানীকে একজন মানুষের মৃত্যু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর, 'কখন তার মৃত্যু হবে।' কোন দার্শনিক বা বিজ্ঞানী এর উত্তর দিতে পারবে না। কেউই বলতে পারবে না, 'মৃত্যু কখন আসবে।'

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, মৃত্যু যতই সু-নিশ্চিত, আমরা সেই মৃত্যুর ব্যাপারে ততটাই বে-পরোয়া।

একটু ভাবুন, সকালে ঘুম হতে উঠে রাত্রে বিছানায় যাওয়া পর্যন্ত আমরা কত কিছু ভাবি। কখনো কি মৃত্যুর কথা চিন্তা করি? আমাদের কি কখনো এ চিন্তা হয় যে, একদিন অন্ধকার কবরে একাকী শুইতে হবে। আর কবরের সেই ভয়াবহ অবস্থার কথা কী আমাদের মাথায় কখনো আসার সুযোগ পায়?

আমাদের সব চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু হল– ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষেত-খামার, চাকুরী-বাকুরী, দোকান-পাঠ ইত্যাদি। মৃত্যুর চিন্তা, কবর ও আখেরাতের চিন্তা এক দণ্ডের জন্যও করি না।

হযরত বাহলুল রহ.–এর ঘটনা

বাহলুল নামে একজন আল্লাহওয়ালা ছিলেন। তিনি ছিলেন 'মাজযুব' প্রকৃতির মানুষ। প্রায় হেকমতপূর্ণ কথা-বার্তা বলতেন। এজন্য কেউ কেউ তাঁকে 'জ্ঞানী' বলেও আখ্যা দিত।

বাদশাহ হারুনুর রশীদ রহ.-এর আমলের ঘটনা। বাদশাহ তাঁর সাথে কখনো কখনো হাসি-আনন্দ এবং কৌতুক করতেন। বাদশাহর নির্দেশ ছিল,

বাহলুল আমার নিকট আসতে চাইলে বাধা দিবে না। আমার নিকট আসতে দিবে।

বাহলুল রহ. একদিন বাদশাহ'র নিকট আসলেন। কৌতুকচ্ছলে বাদশাহ তার হাতে একটি ছড়ি দিয়ে বললেন, 'হে বাহলুল! ছড়িটি তোমার নিকট আমানত। ছড়িটি তুমি এমন ব্যক্তিকে দিবে, যে তোমার চেয়ে বড় বোকা ও বেকুফ।' বাদশাহ এ দিকে ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন যে, তোমার চেয়ে বড় বোকা ও বেকুফ আর কেউ নেই। বাহলুল রহ. ছড়িটি নিজ হেফাজতে রেখে দিলেন।

এরপর অনেক দিন চলে গেল। হঠাৎ একদিন হারুনুর রশীদ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। একদম শয্যাশায়ী, কোথাও যাওয়া-আসা পর্যন্ত করতে পারছিলেন না। চিকিৎসকগণ চলা-ফেরা করতে নিষেধ করে দেন।

একদিন বাহলুল রহ. বাদশাহ'র সেবা-শুশ্রূষার জন্য আসলেন। অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে বাদশাহ বললেন, বাহলুল! কী আর বলব, সফর খুব লম্বা।

বাহলুল জিজ্ঞাসা করল, কোথাকার সফর? উত্তরে বাদশাহ বললেন, আখেরাতের সফর।

– সৈন্য কতগুলো প্রেরণ করেছেন? কতটি তাবু স্থাপন করেছেন?

– বাহলুল, তুমি তে আশ্চর্য কথা বলছ! এটা এমন একটা সফর, যে সফরে কোন সৈন্যদল প্রেরণ করা যায় না। সঙ্গে নেয়া যায় না কোন দেহরক্ষী। স্থাপন করা যায় না কোন তাবু।

– আচ্ছা জনাব, তবে ফিরবেন কবে?

– তুমি এ কী বলছ? এ সফরতো আখেরাতের সফর। সেখানে গেলেতো কেউ ফেরত আসতে পারে না।

– তাহলে এত বড় সফর! সেখান থেকে কেউই ফেরত আসতে পারে না! আর কোন লোক বা সৈন্যদলও সেখানে পাঠনো যায় না!

– হ্যাঁ, সফরটি এমনই।

– আমীরুল মুমিনীন, বহুদিন পূর্বে আপনি আমার নিকট একটি ছড়ি আমানত রেখে বলেছিলেন যে, তোমার চেয়ে অধিক কোন বোকা ব্যক্তিকে পেলে এটা দিবে। জনাব! আজ এর সঠিক প্রাপক আপনি ছাড়া আর কাউকে দেখছি না। কারণ, আপনি ছোটখাট সফরে যেতে পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন, সৈন্যদল প্রেরণ করতেন। তারা আপনার পথ-ঘাঁ ঠিক করত। প্রস্তুত করে রাখত শানদার তাবু। অথচ আপনি কিছু সময় অবস্থান করেই সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন।

আর আজ আপনার এত দীর্ঘ সফর। কখনো আর প্রত্যাবর্তনও করবেন না সেখান থেকে। তবুও কোন প্রস্তুতি নেই। এটা কেমন বুদ্ধির কথা? তাই বাদশাহ নামদার, আমার চেয়ে বড় বোকা একমাত্র আপনিই। এটা আপনার জন্য হাদিয়া।

বাদশাহ হারুনুর রশীদ বাহলুল রহ.-এর কথা শুনে কান্নায় ভেঙ্গে পরলেন। বললেন– বাহলুল! আমরা তোমাকে পাগল মনে করতাম। আসলে তোমার চেয়ে বড় জ্ঞানী আর দ্বিতীয়জন নেই।

মৃত্যুকে স্মরণ করুন

বাস্তবতা হল, পৃথিবীর সামান্য সফরের জন্য পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়, প্লান-প্রোগ্রাম করা হয়। কিন্তু আখেরাতের সফরের জন্য আমাদের কোন প্রস্তুতি নেই। অথচ বসে থাকলেও আমাদের সকলকে এ সফরের সম্মুখীন হতে হবে।

কোন স্থানে সফরের পূর্বে এ কথা জানা থাকে যে, আমি উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত গাড়ী ছাড়বে না। আমি না থাকলে বিবি-বালবাচ্চার কী হবে? কী হবে আমার ব্যবসা- বাণিজ্য, দোকান-পাঠ ইত্যাদির? কিন্তু আখেরাতের সফরের অবস্থা এই যে, সে ব্যাপারে আমরা চিন্তা করতে প্রস্তুত নই। নিজ হাতে জানাযা কাঁধে উঠাচ্ছে, প্রিয় ব্যক্তিকে কবরস্থ করছে। মাটি দিয়ে ঢেকে দিচ্ছে চিরদিনের জন্য। কিন্তু নিজেকে নিয়ে কোন ফিকির নেই। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, যেন ঘটনার সমাপ্তি লাশ দাফনের সাথে হয়ে গেল। নিজের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই।

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন–

فَأَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ

'সমস্ত স্বাদ ধ্বংসকারী মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ কর।'

(তিরমিযী শরীফ, হাদীস-২৩৮৪)

আমাদের কথা একটু ভাবি। চব্বিশ ঘণ্টায় মৃত্যুকে কতবার স্মরণ করি? এ হাদীসে হুজুর সা. 'আখেরাত হতে বিমুখতা'কেই সকল রোগের মূল উৎস বলে আখ্যা দিয়েছেন। আমাদের সকল চিন্তা যদি আখেরাত, কবর ও মৃত্যুকেন্দ্রিক হয়, তবে আমাদের জীবনের সব সমস্যা দূর হয়ে যাবে। সকল পাপ-পঙ্কিলতা, নিরাপত্তাহীনতা শুধুমাত্র এজন্যই।

পৃথিবীর সামান্য সময়ের আনন্দ ও সুখের জন্য আমরা কারো সম্পদ লুণ্ঠন করছি, কারো হক নষ্ট করছি। আবার কারোবা জীবন ধ্বংস করে দিচ্ছি। মৃত্যুর

পর কী হবে? কবরের জীবন কেমন হবে? এ ব্যাপারে কোন চিন্তাই নেই আমাদের।

মানুষের মাঝে আখেরাতের চিন্তা সৃষ্টি করেছেন রাসূলুল্লাহ সা.। সীরাত গ্রন্থসমূহে শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশিলতার যে সব ঘটনাবলী পাওয়া যায়, তা কেবল আখেরাতের চিন্তার কিছু নমুনা। মন-মস্তিস্কে সর্বদা বেহেশতের চিন্তা, আল্লাহর সামনে জবাবদিহিতার চিন্তা। বেহেশত যেন তার সামনে। এ জন্য তাদের সকল কথা ও কাজ একমাত্র আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্টির জন্যই হত।

হযরত ওমর ফারুক রাযি.-এর ঘটনা

হযরত ওমর ফারুক রাযি. ছিলেন দ্বিতীয় খলীফা। অর্ধ পৃথিবীর বাদশাহ। কেসরা ও কায়সারের প্রাসাদ যার সামনে থরথর করে কাঁপত।

একদা তিনি সফরে বের হলেন। পরনে সাধারণ পোশাক। কারো চেনার উপায় নেই যে, তিনি অর্ধ পৃথিবীর বাদশাহ। পথিমধ্যে তার ক্ষুধা লেগে যায়। ক্ষুধা দূর করার মত হোটেল-রেষ্টুরেন্টের কোন ব্যবস্থা ছিল না সে যুগে।

ইত্যবসরে বকরীর একটি পাল দেখে তিনি ভাবলেন, রাখাল থেকে কিছু দুধ চেয় নিয়ে পান করবেন। এরপর তিনি রাখালের নিকট গিয়ে বললেন- 'ভাই! আমি প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত। ক্ষুধা নিবারণের জন্য আমাকে এক পেয়ালা দুধ দাও। মূল্য যা হয় দেব।'

রাখাল বলল, 'জনাব! দুধ অবশ্যই দিতাম। কিন্তু এ বকরী পাল আমার নয়। এগুলো আমার নিকট অন্যের আমানত। অনুমতি ছাড়া আপনাকে দুধ দেব কীভাবে?'

হযরত ওমর ফারুক রাযি. যেমন আমীরুল মুমিনীন ছিলেন, তেমনি শিক্ষক, মুরুব্বী এবং অভিভাবকও ছিলেন। মাঝে মধ্যে জনসাধারণকে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করতেন।

রাখালকে পরীক্ষা করার জন্য তিনি বললেন, তোমার একটি লাভের কথা বলব কি? সে বলল, বলুন। তিনি বললেন, আমার নিকট টাকার বিনিময়ে একটি বকরী বিক্রি কর। আমি প্রয়োজন মত দুধ পান করব। প্রয়োজন হলে জবেহ করে গোশত খাব। আর তুমি পাবে টাকা। বকরীর মালিক জিজ্ঞাসা করলে বলবে- 'বাঘ একটি বকরী ধরে নিয়েছে।' তাহলে তুমি বেঁচে যাবে। তোমারও উপকারও হল, আমারও উপকার হল।

হযরত ওমর ফারুক রাযি. এ কথা বলা মাত্র রাখাল ছেলেটি চিৎকার দিয়ে বলে উঠল–

يا هذا! فأين الله؟

অর্থাৎ, আরে ভাই, তুমি আমাকে এ কাজ করতে বলছ! আমি এ কাজ করলে আমার আল্লাহ কোথায় যাবে? আমার আল্লাহ কি দেখবেন না?

হযরত ওমর ফারুক রাযি. পরীক্ষার জন্যই শুধু এ কথা বলেছিলেন। রাখালের এ উত্তর শুনে বললেন, ভাই যত দিন তোমার মত মানুষ উম্মাতের মধ্যে থাকবে, ততদিন সফলতা, শান্তি, কল্যাণ, উন্নতি এ উম্মাতের পদচুম্বন করবে। নিরাপদ থাকবে এ উম্মাত সকল অনিষ্ট থেকে।

এ হল আখেরাতের সে চিন্তা, যা একজন রাখালকে নির্জন মাঠে একাকী বকরী চড়াতেও প্রভাবিত করেছে। আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার চিন্তা জাগ্রত করেছে। আখেরাতে জবাবদিহিতার মানসিকতা তৈরি করেছে।

অবৈধ পন্থায় কিছু টাকা অর্জন করে পার্থিব উপকার হলেও আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবন নষ্ট হবে।

অন্য একটি ঘটনা

হযরত ওমর রাযি. গভীর রাতে জনসাধারণের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতেন। একদিন এক বাড়ীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। শেষ রাত্রের সময় ছিল। এক বাড়ীতে মা-মেয়ের মধ্যে কথা হচ্ছিল। মা তার মেয়েকে বলছিলেন, 'দুধ দহনের সময় হয়েছে। দেখ বেটি! আজ-কাল দুধ কম হচ্ছে। এজন্য দুধে পানি মিশাবে, যেন বেশি হয়।'

মেয়েটি বলল, 'আম্মাজান! দুধে পানিতো মিশাব, কিন্তু আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর রাযি.-এর নিষেধাজ্ঞা এসেছে, 'কেউ যেন দুধে পানি না মিশায়।'

মা বললেন, 'বেটি! আমীরুল মুমিনীন নিষেধ করেছেন ঠিক, কিন্তু পানি মিশাতে তিনিতো তোমাকে দেখছেন না। হয়ত তিনি এখন ঘুমাচ্ছেন। তিনি জানতেই পারবেন না।'

মেয়ে বলল, 'আম্মা! হতে পারে তিনি জানতে পারবেন না। কিন্তু তাঁর যিনি আমীর অর্থাৎ আল্লাহ তাআলাতো ঠিকই দেখছেন। তাহলে কি করে পানি মিশাব?'

এদিকে হযরত ওমর রাযি. দাঁড়িয়ে তাদের কথা-বার্তা শুনছিলেন। সকালে মেয়েটির খবর নিলেন এবং তাকে ডেকে পাঠালেন। নিজ সন্তানের সাথে বিবাহ দিলেন। পরর্তীতে তারই বংশে জন্মগ্রহণ করেন দ্বিতীয় ওমর হিসাবে খ্যাত হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ রহ.।

আখেরাতের চিন্তা

এ মানসিকতা সৃষ্টির পিছনে মূলমন্ত্র ছিল 'আখেরাত উত্তম ও চিরস্থায়ী।' মন-মস্তিস্কে এটা দৃঢ়ভাবে জায়গা করে নেয়ার কারণে গুনাহ, পাপ, অন্যায় ও খারাপ কোন কাজ তাদের দ্বারা সংঘটিত হত না। সকলের দ্বারা বেহেশতে যাওয়ার কাজ, আল্লাহকে খুশি করার কাজই শুধু হত। দোযখে যাওয়ার মাধ্যম, আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট হন, এমন সকল কথা ও কাজ থেকে তাঁরা বিরত থাকতেন।

এটা হল সেই আয়াতের উদ্দেশ্য। তোমরা তোমাদের রোগ চিনে নাও। সমস্ত দৌড়-ঝাঁপ, সমস্ত চিন্তা-ভাবনা একমাত্র পৃথিবীকে নিয়ে করছ। একটু বসে এ চিন্তাও কর যে, 'আমি এত মানুষকে মৃত্যুবরণ করতে দেখলাম, কবরস্থ করলাম। একদিন আমিও মৃত্যুবরণ করব। আমাকেও কবরস্থ করা হবে। কবরে কী হবে? হাশরের ময়দানে কী হবে? পুলছিরাতে কী হবে? ফায়াসালা বেহেশতের হবে, নাকি দোযখের?' এ কথাওভাবো।

রাসূলুল্লাহ সা.-এর বিবরণ বিস্তারিত দিয়েছেন। বলে দিয়েছেন, আখেরাতে কী হবে। পূর্ণ কুরআনুল কারীম ভরপুর এই আলোচনায়। যেন আখেরাতের চিন্তা মন-মস্তিস্কে ভালভাবে বসে। কিন্তু আফসোস! আমরা এ জন্য একটুও সময় দিতে রাজি নই।

এ চিন্তা কীভাবে আসবে

এখন প্রশ্ন হল- পৃথিবীর জীবন নিয়ে আমাদেরকে যে চিন্তা-চেতনা গ্রাস করে রেখেছে, এ থেকে পরিত্রাণের উপায় কী? কীভাবে মুক্তি পাওয়া যাবে ক্ষণস্থায়ী জীবনের এ মানসিকতা থেকে? আর কীভাবে আমাদের মন-মস্তিস্কে বদ্ধমূল করা যাবে আখেরাতের চিন্তা। রাখাল ছেলেটির মত আমাদের অন্তরে কী করে সেই চিন্তা আসবে। 'সর্বদ্রষ্টা আল্লাহ তাআলা রাতের অন্ধকারেও দেখার' যে চিন্তা যুবতী মেয়েটির অন্তরে ছিল, তা আমরা কীভাবে অর্জন করব।

পথ একটাই। মন-মস্তিস্কে আখেরাতের চিন্তা বদ্ধমূল করা। 'আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে জবাব দিতে হবে' এ অনুভূতি যাদের অন্তরে রয়েছে, তাঁদের সোহবত অবলম্বন করা। তাঁদের নিকট অবস্থান করা। তাঁদের কথা শোনা। এতে তাঁদের চিন্তা-চেতনা আপনার অন্তরে স্থান করে নিবে। চিন্তা-চেতনায় আপনি একজন আখেরাতমুখী মানুষে রূপ নিবেন।

এই সোহবতই সাহাবাগণের জাহেলীয়াতের নোংড়া জীবনকে পরিবর্তন করে ফুলের মত পবিত্র জীবনে রূপ দিয়েছে। যারা সামান্য বিষয় নিয়ে একে

অন্যের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ করত, এক মুরগীর বাচ্চার জন্য চল্লিশ বছর পর্যন্ত যুদ্ধ করত, একটি কূপের জন্য, এক হাত জমির জন্য, সাধারণ গরু-ছাগলের জন্য একে অপরের রক্তপিপাসু হয়ে যেত। তাঁরাই নবীর সোহবত পেয়ে এমন সোনার মানুষে পরিণত হলেন যে, সমস্ত সহায়-সম্পদ, ঘর-বাড়ী, আসবাবপত্র সবকিছু মক্কায় ছেড়ে রাসূলের সাথে হিজরত করে মদীনায় চলে গেলেন।

সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা

মদীনার আনসারী সাহাবাগণ তাঁদেরকে আনন্দচিত্তে অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁদেরকে নিজেদের অর্ধেক আবাদী জমি উপহার দিলেন। অন্যদিকে মুহাজির সাহাবীগণ এভাবে জমি গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। রাসূলুল্লাহ সা.কে বললেন, আমরা এভাবে জমি গ্রহণ করব না। তবে আমরা জমিতে ফসল উৎপাদনের জন্য কাজ করব। উৎপাদিত ফসল পরস্পর বণ্টন করে নেব।

তাহলে বলুন! তাঁদের পৃথিবী অর্জনের সেই চিন্তা-চেতনা ও মানসিকতা কোথায় গেল?

অবস্থা এমন ছিল, জেহাদের ময়দানে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলছে। চোখের সামনে মৃত্যু নাচা-নাচি করছে। এমতাবস্থায় একজন হাদীস বর্ণনা করলেন– 'রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হবে আল্লাহ তাআলা তাঁকে বেহেশতের সু-উচ্চ মর্যাদা দান করবেন।'

এক সাহাবী এ হাদীস শুনে জিজ্ঞাসা করলেন, রাসূলুল্লাহ সা. কি সত্যি এ কথা বলেছেন? তুমি কি এ কথা শুনেছ? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি নিজ কানে শুনেছি। আমার অন্তরে এখনো তা গেঁথে আছে।

সেই সাহাবী এবার বললেন, আচ্ছা! তাহলেতো জিহাদ থেকে দূরে থাকা আমার জন্য হারাম। অতঃপর তাওবারী উঠালেন। যুদ্ধ করতে করতে দুশমনের ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করলেন। হঠাৎ একটি তীর তার বুকে এসে বিদ্ধ হল। রক্তের ফোয়ারা বইতে দেখে তার মুখে উচ্চারিত হল–

فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ

'পবিত্র কাবার প্রভুর কসম, আজ আমি সফল। সফলতা আমার পদচুম্বন করেছে।' (বুখারী শরীফ, হাদীস-২৫৯১)

এরা সে সব দুনিয়াপাগল, যারা দুনিয়ার জন্য এমন কোন কাজ নেই যা করত না। অথচ নবী কারীম সা.-এর সোহবতের বরকতে তাঁদের মন-মস্তিস্কে আখেরাতের চিন্তা-চেতনা গভীরভাবে রেখাপাত করে।

যাদুকরদের দৃঢ় ঈমান

পবিত্র কুরআনে মুসা আ. এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। মুসা আ. যখন দাওয়াত দিয়েছেন, মুজেযা দেখিয়েছেন। মাটিতে লাঠি নিক্ষেপ করেছেন, সাপ হয়ে গেছে। ফেরাউন ভাবল, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য যাদুকরদের আনতে হবে।

ফেরাউন সকল যাদুকরকে একত্রিত করে বলল, 'বড় একজন যাদুকরের সঙ্গে তোমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। আমি চাই তোমরা তার উপর জয়ী হও। তোমরা তোমাদের বিদ্যার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন কর।

তারা ছিল ফেরাউনের দরবারী যাদুকর। তবুও সম্মানী নির্ধারণ করল।

قَالُوٓا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ

তারা বলল- 'হে ফেরাউন, আমরা মুসার উপর জয়ী হলে সম্মানী পাব কি? কোন পুরস্কার মিলবে কি?' (সূরা ৭ আরাফ, আয়াত-১১৩)

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ

'হ্যাঁ! অবশ্যই পুরস্কার পাবে। শুধু পুরস্কারই নয়, বরং তোমরা আমার নৈকট্যশীলদের অন্তর্ভূক্ত হবে।' (সূরা ৭ আরাফ, আয়াত-১১৪)

সময় মত যাদুকরদল উপস্থিত হল এবং তাদের রশি ও লাঠির মাধ্যমে যাদুবিদ্যা প্রদর্শন শুরু করল। রশি ও লাঠি সাপে পরিণত হয়ে চলতে লাগল।

আল্লাহ তাআলা মুসা আ. কে ওহীর মাধ্যমে বললেন– মুসা! এবার তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর। হযরত মুসা আ. লাঠি নিক্ষেপ করলেন। লাঠি বিশাল এক আজদাহা সাপে পরিণত হল। যাদুকরদের সমস্ত সাপ একে একে গ্রাস করতে শুরু করল। নিঃশেষ করে ফেলল সমস্ত সাপ।

যাদুকররা যাদুবিদ্যার গুঢ় রহস্য জানে। তারা বুঝল, যা ঘটেছে তা যাদু নয়। যাদু হলে আমাদের যাদুর উপর এভাবে প্রাধান্য লাভ করতে পারত না। আমরাই জয়ী হতাম।

তারা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করল, 'মুসা আ. আল্লাহর নবী'। তাঁরা নবীর মুজেযা স্বচোক্ষে দেখল। সোহবত লাভ হল। এক বাক্যে সকলে বলে উঠল–

آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ

'আমরা হারূন ও মুসার প্রভুর প্রতি ঈমান আনলাম।'

(সূরা ২০ ত্বহা, আয়াত-৭০)

এ সব দেখে ফেরাউন ক্রোধান্বিত হয়ে বলল-

آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ

'আরে! আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার পূর্বেই তোমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনলে?' (সূরা ২০ ত্বহা, আয়াত-৭১)

সাথে সাথে শাস্তির ধমকিও দিল। যদি তোমরা তাঁর উপর ঈমান আনো, তাহলে তোমাদের অবস্থা হবে–

فَلَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُصَلِّبَنَّكُمْ

فِيْ جُذُوْعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَا اَشَدُّ عَذَابًا وَّاَبْقٰى

'সুতরাং অবশ্যই আমি তোমাদের হাত-পা কেটে ফেলব বিপরীত দিক থেকে। এবং আমি তোমাদেরকে খেজুর গাছের কাণ্ডে শূলিবিদ্ধ করবই। তখন নিশ্চিতরূপেই জানতে পারবে, আমাদের মধ্যে কার শাস্তি বেশি কঠোর ও বেশি স্থায়ী।' (সূরা ২০ ত্বহা, আয়াত-৭১)

ফেরাউন তাদেরকে এভাবে ধমকি দেয়।

এখন ভাবার বিষয় হচ্ছে, একটু পূর্বে যেসব যাদুকররা মুসা আ. এর বিরুদ্ধে ফেরাউনের ডাকে সারা দিয়ে যাদুর পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করছিল, তাদের সম্মানী নিয়ে আলোচনা করছিল, এখন আর সেই বিনিময়-সম্মানীর কথা মাথায় নেই। ভুলে গেছে সেসব। ফেরাউন ভয় দেখাচ্ছে হাত-পা কেটে দেবে, ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাবে। এরপরও তারা নির্ভিকভাবে উত্তর দিচ্ছে–

قَالُوْا لَنْ نُّؤْثِرَكَ عَلٰى مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالَّذِيْ فَطَرَنَا فَاقْضِ مَآ اَنْتَ قَاضٍ

'তারা বলল, 'আমাদের নিকট যে সকল স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে এবং যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তার উপর আমরা তোমাকে কিছুতেই প্রাধান্য দেব না। সুতরাং তুমি যা ফায়সালা করতে চাও, তাই কর।' (সূরা ২০ ত্বহা, আয়াত-৭২)

তুমি আমাদের হাত কাটো আর পা কাটো, শূলিতে চড়াও আর ফাঁসিতে দাও, এটা হবে পৃথিবীর শাস্তি। আর আমরা যা দেখেছি, তা ছিল আখেরাতের দৃশ্য। চিরস্থায়ী অনন্ত জীবনের দৃশ্য।

দেখুন! একটু পূর্বেই যারা পারিশ্রমিক দাবি করছিল। অথচ একটু পরই তাদের এমন অবস্থা হল যে, ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলতেও প্রস্তুত হয়ে গেছে।

অবস্থার এ পরিবর্তন কীভাবে সম্ভব হল? কে করল এই পরিবর্তন?

ঈমানের সঙ্গে সোহবত অর্জন হয়েছে। এ কারণেই এ পরিবর্তন।

সোহবতের উপকারিতা

মোটকথা, ঈমান- আকীদা ঠিক রেখে আল্লাহওয়ালাদের সোহবত অর্জন করতে পারলে অন্তরে আখেরাতের চিন্তা, আল্লাহর রেজামন্দি ও বেহেশত

অর্জনের বাসনা সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর সকল কামনা-বাসনা দূর হয়। পরাজিত হয় পার্থিব সকল চিন্তা-চেতনা। জয়ী হয় আখেরাতের চিন্তা। আর কেবল তখনই একজন মানুষ পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত হয়।

পার্থিব চিন্তা মন-মস্তিস্কে প্রভাব বিস্তার করে রাখলে সে পূর্ণ মানুষ হতে পারে না। পশুতে পরিণত হয়। কারণ, তখন পৃথিবীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ অর্জন করাই কেবল তার কামনা-বাসনা ও লক্ষ্য হয়। এতে কার রক্তপাত হল, আর কার জীবন গেল এ নিয়ে তার কোন মাথাব্যথা থাকে না। তার কাছে ব্যক্তি স্বার্থই সবার উপরে স্থান পায়।

মৃত্যু, মৃত্যু পরবর্তী জীবন ও আখেরাতের কথা চিন্তা-চেতনায় না আসা পর্যন্ত পূর্ণ মানুষ হওয়া কোনভাবেই সম্ভব নয়। আর এ চিন্তা-চেতনা ও মানসিকতা অর্জিত হবে এমন মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তির সোহবতের মাধ্যমে। এটাই চিরন্তন সত্য।

দ্বীন অর্জন এবং তা ব্যক্তি জীবনে প্রতিফলন ঘটানোর একমাত্র পথ এটাই– 'আল্লাহওয়ালাদের সোহবত অর্জন করা।' আর যাদের অন্তরে আখেরাতের চিন্তা আছে, তাঁরাই আল্লাহওয়ালা, তাঁদের সোহবতে যখন কেউ বসবে, তখন আখেরাতের চিন্তা তার মধ্যে আসবে। আল্লাহ তাআলা নিজ দয়ায় আমাদের অন্তরে এ অনুভূতি সৃষ্টি করে দিলে সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

বর্তমান পৃথিবীর অবস্থা

সমস্যা ও জটিলতার দূর্ভেদ্য জাল আমাদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে রেখেছে। সমাধানের জন্য থানা, আদালত ও পুলিশ বাহিনী থাকলেও সরকারী দফতরগুলোতে ঘুষের বাজার রমরমা। এ সমস্যা সমাধানের জন্য 'দুর্নীতি দমন কমিশন' গঠন করা হয়েছে। ফলাফল কি হল? পূর্বের চেয়ে দ্বিগুণ ঘুষ দিতে হয় এখন। সরকারী অফিসারদেরকে দিতে হয়, দুর্নীতি দমন কমিশনের অফিসারদেরকেও দিতে হয়।

এখন যদি এই কমিশন তদারকির জন্য আরো একটি কমিশন গঠন করা হয় এবং সেটার জন্য আরো একটি কমিশন গঠন করা হয়, এভাবে যদি বিভিন্ন কমিশন গঠন করতেই থাকা হয়, তবুও ঘুষ বন্ধ হবে না, বরং বাড়তেই থাকবে।

কারণ, দুর্নীতি দমনের জন্য যাকেই নিয়োগ দেয়া হচ্ছে, তার সামনে শুধু পৃথিবী আর পৃথিবী। তার একটাই চিন্তা– অন্যের চেয়ে আমার বাড়ীটা ভাল হতে হবে। আমার গাড়ীটি নিউ মডেলের হতে হবে। পোশাক আমারটা আরো দামি হতে হবে। এ চিন্তাই শুধু তার মন-মস্তিস্কে। এমতাবস্থায় যতই থানা-

আদালত গঠন করা হোক, লোক নিয়োগ দেয়া হোক, যত নিয়ম-নীতি ও আইন প্রণয়ন করা হোক না কেন, তবুও কাঙ্খিত ফলাফল পাওয়া যাবে না। কারণ, আমাদের সমাজে দু'টাকা হলেই আইন কেনা যায়।

আমি দৃঢ়তার সাথে এ কথা দাবি করছি যে, আল্লাহর ভয় অন্তরে না আসলে, তার সামনে উপস্থিত হওয়ার চিন্তা না থাকলে, কবরের ভয়াবহতার ভীতি মস্তিস্কে না থাকলে, হাজারো আইন-কানুন প্রণয়ন, আদালত প্রতিষ্ঠা, পুলিশ বাহিনী ও দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করলেও কিছুই হবে না। 'খোদাভীতি' অর্জন ছাড়া এ সবই বেকার ও বৃথা।

সভ্যতার উচ্চশিখরে আমেরিকার অবস্থান। সবাই শিক্ষিত। অর্থনৈতিক দিকে থেকে সচ্ছল। সাইন্স, টেকনোলজি এবং পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের চাবিকাঠি আজ তাদের হাতে। প্রশাসন সজাগ-সচেতন। ঘুষের লেনদেন কল্পনাতীত বিষয়, যে কোন সমস্যায় নোটিশের তিন মিনিটের মধ্যে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে যায় প্রশাসনের লোক।

কিন্তু সেখানকার বাস্তব অবস্থা হল– আমাকে একজন সজাগ করতঃ বলেন, হোটেল থেকে বের হতে সাবধানে বের হবেন। হুশিয়ার থাকবেন। হাতে ঘড়ি রাখবেন না। প্রয়োজনীয় টাকা-পয়সা ছাড়া অতিরিক্ত টাকা-পয়সা সঙ্গে রাখবেন না। ছিনতাই হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, এমনকি এগুলো হাতিয়ে নেয়ার জন্য আপনাকে খুনও করতে পারে।

এ সব আমেরিকার অলিতে-গলিতে হরদম হচ্ছে। আর আইন-কানুন, সংবিধান আপন স্থানে নির্বাক দণ্ডায়মান। পুলিশ বসে বসে তামাশা দেখছে। এক দিকে তারা চাঁদে পতাকা স্থাপন করছে। আর অন্য দিকে আমেরিকার প্রধানের ঘোষণা– দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত পৃথিবী গড়াই এখন আমাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

মরহুম আল্লামা ইকবাল বলেন-

ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا
اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا
جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا
زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا

নক্ষত্রের কক্ষপথ অনুসন্ধান করে,
অথচ নিজেদের চিন্তার পৃথিবীতে ভ্রমণ করতে পারেনি।

সূর্যের রশ্মি হস্তগত করেছে,
কিন্তু জীবনের অন্ধকার রাতের প্রভাত আনতে পারেনি।

পৃথিবী এ দৃশ্য দেখছে, সামনে আরে দেখবে। হযরত মুহাম্মাদ সা.-এর পবিত্র কদমে মাথা নোয়ানোর পূর্ব পর্যন্ত এবং আখেরাতের চিন্তা অস্থি-মজ্জায় স্থান লাভ না করা পর্যন্ত পৃথিবী এ দৃশ্য দেখতেই থাকবে।

আইন প্রণয়ন ও আদালত প্রতিষ্ঠা করে এ সমস্যাবলীর সমাধান কখনোই হবে না। সমাধানের একমাত্র পথ– 'আল্লাহওয়ালাদের সোহবত অর্জন করা। তাঁদের নিকট বসা। তাঁদের কথা শোনা। কবর, হাশর ও আখেরাতের অবস্থা ভালভাবে জানা'।

আল্লাহ তাআলা নিজ দয়ায় আমাদেরকে এ বাস্তবতা বোঝার এবং উপলব্ধি করার তাওফীক দান করুন। আমাদের অন্তরে আখেরাতের চিন্তা জয়ী করুন। পৃথিবী অর্জনের জন্য দৌড়-ঝাপ হতে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাজত করুন এবং আল্লাহওয়ালাদের সোহবত লাভের তাওফীক দান করুন। আমীন ॥

পাপ থেকে মুক্তির পথ

শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
অনুবাদ : হোসাইন আহমাদ (শাহ আলম)

প্রথম প্রকাশ : আগষ্ট– ২০০৬ ঈ.
দ্বিতীয় প্রকাশ : জুন– ২০০৭ ঈ.

সূচী

দু'টি জান্নাতের ওয়াদা + এরই নাম তাকওয়া-২৭
আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব-২৮
আমার অন্তরে আমার আব্বাজানের মর্যাদা-২৮
আল্লাহর অসন্তুষ্টির ভয়-২৮
খোদাভীতির দৃষ্টান্ত + একটি শিক্ষণীয় ঘটনা-২৯
অপরাধ দমনের উত্তম পদ্ধতি-৩০
সাহাবায়ে কেরামের খোদাভীতি + আমাদের বিচার বিভাগের অবস্থা-৩১
উপদেশমূলক একটি ঘটনা-৩১
শয়তানের বিভ্রান্ত করার কৌশল + টিভি সমাজকে ধ্বংস করল-৩২
ছোট গুনাহে অভ্যস্ত ব্যক্তিই বড় গুনাহ করে-৩৩
ছগীরা গুনাহ না কবীরা গুনাহ-৩৩
গুনাহের চাহিদা হলে কী করবেন? + গুনাহের স্বাদ সাময়িক-৩৪
যৌবনে খোদার ভয়, বার্ধক্যে ক্ষমার আশা-৩৫
ভয়–ভীতির উপর পৃথিবীর শৃঙ্খলা নির্ভরশীল-৩৫
স্বাধীনতা আন্দোলন ও লাল টুপি-৩৫
অন্তর থেকে ভয় চলে গেছে + খোদাভীতি অর্জন করুন-৩৬
নির্জনে খোদাভীতি + রোযা অবস্থায় খোদাভীতি-৩৭
সর্বাবস্থায় এ ভয় সৃষ্টি করুন + জান্নাত কার জন্যে-৩৭
জান্নাত দুঃখ-কষ্টে ঘেরা-৩৮
ইবাদত করেও ইস্তিগফার করতে হবে-৩৮
আল্লাহওয়ালাদের অবস্থা + আল্লাহর পরিচয়ের পরিমাণ তাঁর ভয়-৩৯
হযরত হানজালা রাযি.-এর খোদাভীতি-৪০
হযরত ওমর ফারুক রাযি.-এর খোদাভীতি-৪০
খোদাভীতি অর্জনের পদ্ধতি-৪১
আমল করে গর্ব কর না + মন্দ আমলের কুফল-৪২
আল্লাহওয়ালাদের সাথে বেয়াদবীর পরিণতি-৪৩
নেক আমলের বরকত + ভাগ্যের মূলতত্ত্ব-৪৩
নিশ্চিন্ত হইও না-৪৪
জাহান্নামের সবচেয়ে নিম্নমানের শাস্তি + জাহান্নামীদের স্তর-৪৫
হাশরের মাঠে মানুষের অবস্থা-৪৫
জাহান্নামের গভীরতা ও প্রশস্ততা-৪৬

অনুবাদকের কথা

আজ আমাদের ব্যক্তিক, পারিবারিক ও জাতীয় জীবন পাপের অন্ধকার গহ্বরে নিমজ্জিত। ফলশ্রুতিতে খোদার গজব আমাদেরকে ঘিরে ধরেছে অক্টোপাশের মত। অশান্তির দাবানলে দাউ দাউ করে জ্বলছে জান্নাতী সুখ-স্বপ্ন। সবার কাছে এখন একটিই জিজ্ঞাসা– এর থেকে মুক্তির পথ কী?

এ সম্পর্কে যুগের হাকীমুল উম্মাত শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী বিভিন্ন ওয়াজ-মাহফিল, সভা সেমিনার ও ঘরোয়া মজলিসে একনিষ্ঠভাবে আলোকপাত ও দিক নির্দেশনা দিয়ে আসছেন। 'পাপ থেকে মুক্তির পথ' তাঁর এমনই একটি বয়ান 'গুনাহ কি ইলাজ খউফে খোদা' এর বাংলা অনুবাদ।

আল্লাহ তাআলা আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং এর মাধ্যমে আমাদের অন্তরে খোদভীতি অর্জন ও পাপমুক্ত নিস্কলূষ জীবন গড়ার চেতনা লাভের তাওফীক দান করুন। আমীন।

হোসাইন আহমাদ (শাহ আলম)
বেজগাতী, ফুলকোচা, সিরাজগঞ্জ
০৮-০৮-০৬ ঈ.

যদি কেউ নির্জনে কোন গুনাহের ইচ্ছা করে, যেখানে তাকে কেউ দেখবে না এবং প্রকাশ্য কোন বাধাও নেই, কিন্তু সে এই নির্জনেও এ কথা ভাবে যে, আমাকে কেউ না দেখলেও আল্লাহ তাআলা ঠিকই দেখছেন। তার সামনে একদিন আমাকে দাঁড়াতে হবে, এই ভয়ে সে গুনাহ ছেড়ে দেয়। তাহলে তার জন্য দু'টি জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে। এটা হল 'তাকওয়া' বা খোদাভীতি।

কু-দৃষ্টির বাসনা অন্তরে সৃষ্টি হলে ছেলের সামনে, পিতা কিংবা ছাত্র-উসতাদের সামনেও কি কেউ কু-দৃষ্টি করবে? তাদের দেখার ভয়ে বা নিজের মান-সম্মানের ভয়ে হলেও তা থেকে অবশ্যই বিরত থাকবে। সৃষ্টির সামনে লজ্জিত হয়ে খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকলে, সকল সৃষ্টির স্রষ্ঠা, সর্বদ্রষ্টা আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়ানোর কল্পনা সকল গুনাহ থেকে অবশ্যই বিরত রাখবে।



পাপ থেকে মুক্তির পথ

দু'টি জান্নাতের ওয়াদা

'আল্লাহর সামনে আমাদের কৃত কর্মের জবাব দিতে হবে'– এই ভয় যদি অন্তরে থাকে, তবে সে জান্নাতপ্রাপ্ত হবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ

'আর যে ব্যক্তি তার রবের সামনে দাঁড়িয়ে আমলের জবাব দিতে ভয় পায়, তার জন্য রয়েছে দু'টি জান্নাত।' (সূরা ৫৫ আর রহমান-৪৬)

উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রসিদ্ধ তাবেয়ী হযরত মুজাহিদ রহ. বলেন, যার অন্তরে কোন গুনাহ করার ইচ্ছা হয়, কিন্তু সে আল্লাহর সামনে জবাবদিহিতার কথা স্মরণ করে উক্ত গুনাহ থেকে বিরত থাকে, তার জন্য এ পুরস্কার রয়েছে।

এরই নাম তাকওয়া

তিনি আরো বলেন, যদি কেউ নির্জনে কোন গুনাহের ইচ্ছা করে, যেখানে তাকে কেউ দেখবে না এবং প্রকাশ্য কোন বাধাও নেই, কিন্তু সে এই নির্জনেও এ কথা ভাবে যে, আমাকে কেউ না দেখলেও আল্লাহ তাআলা ঠিকই দেখছেন। তার সামনে একদিন আমাকে দাঁড়াতে হবে, এই ভয়ে সে গুনাহ ছেড়ে দেয়। তাহলে তার জন্য দু'টি জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে। এটা হল 'তাকওয়া' বা খোদাভীতি।

আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর ভয়ে নিজের নফসকে এ কথা ভেবে দমন করা যে, পৃথিবীর কেউ আমাকে না দেখলেও আল্লাহ তাআলা ঠিকই দেখছেন। আল্লাহর এ ভয় অন্তরে সৃষ্টি করাই শরীয়ত ও তরীকতের মূল উদ্দেশ্য।

আল্লাহ্ তাআলার বড়ত্ব

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা এ কথা বলেননি, 'যে ব্যক্তি জাহান্নামের শাস্তি ও আগুনকে ভয় করবে।' বরং বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার রবের সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করবে।' এ দ্বারা অন্তরে আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য– আল্লাহ তাআলা গুনাহের শাস্তি দিক বা না দিক, আমি গুনাহ নিয়ে আল্লাহ তাআলার সামনে কীভাবে যাব, কীভাবে দাঁড়াব।

অন্তরে কারো বড়ত্ব থাকলে, তার শাস্তির ভয় না থাকলেও, শুধু তার বড়ত্বই ভয়ের কারণ হয়। তার মর্জির বিপরীত কাজ করে তার সামনে মুখ দেখানোর সংকোচ তাকে তাড়িত করে। এমন ভয়ের নামই 'তাকওয়া' বা খোদাভীতি।

আমার অন্তরে আমার আব্বাজানের মর্যাদা

আমার আব্বা খুব কমই আমাকে শাস্তি দিয়েছেন। কিন্তু আমার অন্তরে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও বড়ত্ব এমন ছিল যে, তাঁর রুমের নিকট দিয়ে হেঁটে যেতে পা কাঁপত। মনে হত– কার নিকট দিয়ে অতিক্রম করছি!

এমনটি হওয়ার কারণ হল অন্তরে এ ভয় ছিল যে, কখনো যেন এমন কোন কাজ তাঁর সামনে না হয়, যা তাঁর মর্যাদা, বড়ত্ব ও আদবের পরিপন্থী হয়। একজন মাখলুকের মর্যাদাবোধ অন্তরে এমন হলে, সকল মাখলুকের সৃষ্টিকর্তা, সবকিছুর মালিকের বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব অন্তরে অবশ্যই থাকতে হবে। অন্তরে এ ভয় থাকতে হবে যে, আমি এমন গর্হিত ও গুনাহের কাজ করে তাঁর সামনে কীভাবে দাঁড়াব?

এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى– فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

'আর যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে এবং নিজেকে কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত রাখে, নিশ্চয় জান্নাত হবে তার আবাসস্থল।'
(সূরায়ে ৭৯ নাজিয়াত, আয়াত-৪০-৪১)

আল্লাহর অসন্তুষ্টির ভয়

জাহান্নামের শাস্তির ভয় এ জন্য করতে হবে, যেহেতু তা আল্লাহর ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির প্রকাশস্থল। প্রকৃত ভয় আল্লাহর বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের হওয়া উচিত। কবি বলেন–

'লাঞ্ছনার সাথে আবে হায়াতও পান করব না। স্বসম্মানে তৃক্ত 'হানজাল' ফল খেতেও আমি প্রস্তুত।'

আল্লাহর বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রকৃত পরিচয় যারা পেয়েছে, তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি চায়, বেঁচে থাকতে চায় তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে। আর জাহান্নাম আল্লাহর অসন্তুষ্টির প্রকাশস্থল, এ জন্য জাহান্নামকে ভয় করে। নতুবা আল্লাহর অসন্তুষ্টিই ভয়ের মূল কারণ।

খোদাভীতির দৃষ্টান্ত

বর্ণিত আছে, হযরত ওমর ফারুক রাযি. তাঁর খেলাফতকালে প্রজাদের অবস্থা জানার জন্যে গভীর রাতে ঘুরে ফিরে দেখতেন। অভাবীদের অভাব, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিদের বিপদ দূর করতেন।

এক রাতে হযরত ওমর রাযি. ঘোরা ফেরা করছিলেন। হঠাৎ এক বাড়ীতে দু'জন মহিলার কথা শুনতে পেলেন। অনুমাণ করলেন, একজন যুবতী অন্যজন বৃদ্ধা। বৃদ্ধা তার যুবতী মেয়েকে বলছিলেন, বেটি! দোহনকৃত দুধে পানি মিশিয়ে পরিমাণে বেশি করে তা বিক্রি কর। মেয়েটি উত্তরে বলল, আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুক রাযি. দুধে পানি মিশাতে নিষেধ করেছেন। এজন্য পানি মেশানো থেকে বিরত থাকা উচিত।

মা আবার বললেন, বেটি! আমীরুল মুমিনীন তো এখন তাঁর বাড়ীতে। এখানে দেখার কেউ নেই। সুতরাং দুধে পানি মিশালে তিনি জানতে পারবেন না। উত্তরে মেয়েটি বলল, আম্মাজান! আমিরুল মুমিনীন দেখতে না পেলেও আল্লাহ তাআলা অবশ্যই দেখছেন। সুতরাং এ কাজ আমি করতে পারব না।

হযরত ওমর রাযি. দরজায় দাঁড়িয়ে সব কথা শুনছিলেন। সকালে তাদের খবর নিলেন, অতপর স্বীয় পুত্র হযরত আবদুল্লাহ রাযি.-এর সাথে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন এবং বিবাহ সম্পন্ন করে দিলেন। পরবর্তীতে ঐ বংশে জন্ম গ্রহণ করেন হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ রহ.। যাকে মুসলমানদের 'পঞ্চম খলীফায়ে রাশেদ' বলা হয়।

মোটকথা, অন্ধকার রাত, নির্জন ঘর, দেখার কেউ নেই, আমীরুল মুমিনীনও দেখছেন না, কিন্তু 'আল্লাহ তাআলা দেখছেন' এ অনুভূতি তাকে গুনাহ থেকে বিরত রেখেছে। একেই বলে 'তাকওয়া'।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

একবার হযরত ওমর ফারুক রাযি. সফরে ছিলেন, রাস্তার সম্বল শেষ হয়ে গেল। মাঠে একটি বকরীর পাল দেখতে পেলেন। আরববাসীরা তৃষ্ণার্ত ও

ক্ষুধার্ত মুসাফিরকে বিনামূল্যে দুধ পান করাতো। তাই তিনি রাখালের নিকট গিয়ে বললেন, আমি মুসাফির, আমার খাদ্য–পানি শেষ হয়ে গেছে। আমাকে কিছু দুধ দাও।

উত্তরে রাখাল বলল, আপনি মুসাফির, দুধ আপনাকে অবশ্যই দিতাম। কিন্তু আমি এ বকরীর প্রকৃত মালিক না। আমি রাখাল মাত্র। আমার দায়িত্ব শুধু বকরী চড়ান। সুতরাং এ বকরীগুলো আমার নিকট আমানত, এর দুধও আমানত । অতএব আপনাকে দুধ দেয়া আমার জন্য বৈধ হবে না।

হযরত ওমর রাযি. রাখালকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে বললেন, দেখ ভাই! একটি লাভের কথা বলি। এতে তোমারও উপকার হবে আমারও উপকার হবে। একটি বকরী বিক্রি কর, তাতে তুমি পয়সা পাবে আর আমি বকরীর মালিক হব, প্রয়োজনে দুধ পান করে ক্ষুধা মেটাবা। আর মালিককে বলবে, একটি বকরী বাঘে নিয়েছে। মালিক তা বিশ্বাস করবে। কারণ, এমন ঘটনা সচরাচর ঘটেই থাকে। এভাবে আমরা উভয়ই লাভবান হব।

রাখাল এ কথা শোনা মাত্র বলে উঠল– يَا هٰذَا فَأَيْنَ اللهُ হে ভাই! এমন গর্হিত কাজ করলে আল্লাহ কি আমাকে দেখবেন না? অর্থাৎ এ কাজ করে মালিককে বুঝাতে পারব। মালিক বিশ্বাস করবে। কিন্তু প্রকৃত মালিক আল্লাহ তাআলাকে কীভাবে বুঝাব?

হযরত ওমর রাযি. রাখালকে পরীক্ষা করছিলেন, তার উত্তর শুনে তিনি অভিভূত হয়ে বললেন, পৃথিবীতে তোমার মত খোদাভীরু মানুষ থাকতে কোন জালেম অন্যের উপর জুলুম করার সাহস করবে না। কারণ, আখেরাতের চিন্তা, আল্লাহর ভয়, তাঁর সামনে দাঁড়ানোর অনুভূতি অন্তরে থাকলে কখনোই অন্যায়-অত্যাচার হতে পারে না। এরই নাম 'তাকওয়া'।

অপরাধ দমনের উত্তম পদ্ধতি

অন্তরে এ ধরনের অনুভূতি সৃষ্টি না হলে পৃথিবী থেকে অন্যায়, অপরাধ ও দুর্নীতি মূলৎপাটিত হবে না। অপরাধ দমনের জন্য পুলিশ, আদালত ইত্যাদি থাকলেও অপরাধ শেষ হবে না। দিনের আলোতে, শহরের লোকালয়ে অন্যায় থেকে পুলিশ বাধা দিলেও রাতের আঁধারে, নির্জন জঙ্গলে অন্যায় থেকে বিরত রাখতে পারবে না। তাকওয়া ও খোদভীতি অন্তরে না থাকলে কোন বস্তুই অন্যায়-অপরাধ প্রতিরোধ করতে পারে না।

বর্তমান পৃথিবীতে অন্যায় প্রতিরোধের জন্য পুলিশ বাহিনী গঠন করা হয়েছে। তাদের সংশোধনের জন্য উর্ধ্বতন পুলিশ নিয়োগ করা হয়েছে।

বানানো হয়েছে নিম্ন আদালত, উচ্চ আদালত। তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের আইন-কানুন ও সংবিধান। আদালত চলছে, পুলিশ বসে নেই, 'দুর্নীতি দমন আদালত' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যার পিছনে ব্যয় হচ্ছে লক্ষ লক্ষ টাকা। অথচ ঘুষের লেন-দেন বেড়েই চলেছে।

অপরাধ নির্মূল করার ব্যবস্থা যতই করা হোক না কেন পৃথিবীর কোন ফরমুলাই অপরাধ নির্মূল করতে পারবে না। অপরাধ নির্মূল করতে পারে কেবল আল্লাহর ভয় ও আখেরাতের চিন্তা।

সাহাবায়ে কেরামের খোদাভীতি

রাসূলুল্লাহ সা. সাহাবায়ে কেরামের অন্তরে খোদাভীতি সৃষ্টি করেছিলেন। এজন্য তাঁদের দ্বারা কোন গুনাহ সংঘটিত হলে তাঁরা অস্থির হয়ে রাসূলের নিকট উপস্থিত হতেন এবং শাস্তি গ্রহণ করতেন। আল্লাহর দরবারে তাওবা করে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন।

আখেরাতের চিন্তা, খোদাভীতি ও তাঁর সামনে দাঁড়ানোর অনুভূতি থাকলে পৃথিবী থেকে সব ধরনের অপরাধ নিঃশেষ হবে।

আমাদের বিচার বিভাগের অবস্থা

বিচার বিভাগের সাথে আমার সম্পৃক্ততা রয়েছে। চুরি-ডাকাতির মামলার শেষ আপিল আমার কার্যালয়ে আসার কথা ছিল। কিন্তু প্রথম তিন বছর চুরি-ডাকাতির কোন মামলা না আসায় আমি বিস্মিত হলাম। তদন্ত করে জানলাম, এ বছরে মাত্র তিন-চারটি মামলা এসেছে।

যে দেশে বছরে মাত্র তিন-চারটি চুরি-ডাকাতির মামলা হয়, মানুষ নিশ্চতভাবে সে দেশকে ফেরেশতাদের আবাসস্থল ভাববে। ভাববে এখন নিরাপত্তার স্বর্ণযুগ চলছে।

অথচ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত খবর–প্রতি দিন প্রায় পঞ্চাশটি চুরি-ডাকাতির মামলা দায়ের হচ্ছে। তদন্ত করে জানতে পারলাম, চুরি-ডাকাতির মামলাগুলো নিম্ন আদালতেই নিস্পত্তি হয়ে যায়। উচ্চ আদালতে আসার সুযোগ পায় না।

উপদেশমূলক একটি ঘটনা

তিন বছর পর ডাকাতির যে মামলাটি আমার নিকট আসলো, তাহল– 'এক ব্যক্তি কুয়েত চাকুরী করত। ছুটিতে করাচি এসে এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সি ভাড়া করে মাল-পত্র নিয়ে বাড়ী যাচ্ছিল। রাস্তায় একদল অশ্বারোহী পুলিশ টহল

দিচ্ছিল। রাত তখন প্রায় তিনটা। পুলিশ বাহিনী তার ট্যাক্সি থামিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কোথায় থেকে আসছ? কোথায় যাচ্ছ? যাত্রী উত্তর দেয়, কুয়েত থেকে আসছি, এয়ারপোর্ট থেকে বাড়ী যাচ্ছি। তারা জিজ্ঞেস করল, কুয়েত থেকে কী কী এনেছ? সে উত্তর দেয়, কাষ্টমস অফিসার চেক করার পর আপনারা আমাকে চেক করার কে? এ কথা শোনামাত্র একজন পুলিশ বন্দুক তাক করে বলল, তোমার কাছে যা কিছু আছে আমাদেরকে দিয়ে দাও।'

এ ছিল প্রথম মামলা, যাতে চুরি-ডাকাতি থেকে রক্ষাকারী পুলিশই বন্দুক তাক করে মাল ছিনতাই করছে। আইন রক্ষাকারী ও নিরাপত্তা কর্মীরাই আইন লঙ্ঘন করছে। 'আল্লাহর ভয়' এবং তাঁর সামনে হিসাব দেয়ার অনুভূতি অন্তরে না থাকাই এর মূল কারণ। 'একদিন মরতে হবে', 'মৃত্যুর পর আরো একটি জীবন আছে' এ কথা মানুষ ভুলে গেছে। এজন্য চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই, হত্যা, নিরাপত্তাহীনতা ও অস্থিরতা ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে।

শয়তানের বিভ্রান্ত করার কৌশল

'খোদাভীতি' অন্তর থেকে এক মুহূর্তেই দূর হয় না, বরং ধীরে ধীরে এ অনুভূতি নিঃশেষ হয়। শয়তান বড় গুনাহের প্রতি প্রথমেই উদ্বুদ্ধ করে না। প্রথমে ছোট ছোট গুনাহে অভ্যস্ত করে তারপর বড় গুনাহ করায়। প্রথমে দৃষ্টির গুনাহ করায়। এরপর বড় গুনাহে উদ্বুদ্ধ করে চুরি-ডাকাতি এমনকি হত্যা পর্যন্ত করিয়ে নেয়।

মৃত্যুর কথা, কবরের কথা, আল্লাহর নিকট হিসাব দেয়ার কথা ইত্যাদি থেকে গাফেল রেখে সকল গুনাহের কাজ তার দ্বারা সম্পাদন করায়। এভাবে শয়তান কৌশলে মানুষকে বড় বড় অপরাধে লিপ্ত করে থাকে।

টিভি সমাজকে ধ্বংস করল

যুবকদেরকে পিস্তল হাতে চলতে দেখা যায়। পিস্তল দেখিয়ে কারো মাল ছিনতাই করছে, কাউকে হত্যা করছে, কারো ইজ্জত-আব্রু নষ্ট করছে। এসব কাজ কি প্রথমেই করত? অবশ্যই না।

শয়তান প্রথমে টিভি দেখতে উদ্বুদ্ধ করে। ফিল্ম দেখার আগ্রহ জাগায়। এরপর ফিল্মি ষ্টাইলে সব কিছু করার স্পৃহা তৈরি করে। অন্তরে জাগ্রত হয়– অমুক ফিল্মে এভাবে অমুক কাজটি করেছিল, আমিও একটু পরীক্ষা করে দেখি। এভাবে যুবকেরা বিভিন্ন পাপাচারে লিপ্ত হয়।

ছোট গুনাহে অভ্যস্ত ব্যক্তিই বড় গুনাহ করে

আমরা প্রথমে ছোট ছোট গুনাহ করি। এর পর বড় গুনাহ করি। শয়তান ছোট গুনাহের সাহস দেয়। তারপর ধীরে ধীরে বড় গুনাহ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে।

যুবকেরা মনে করে, আমরা এ পৃথিবীতে সর্বদাই থাকব। গুনাহে অভ্যস্ত হওয়ার কারণে আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর ভয়, হিসাব দেয়ার অনুভূতি শেষ হয়ে যায়। তাই এরপর তারা বড় বড় গুনাহেও লিপ্ত হচ্ছে। যা ইচ্ছা তাই করছে। কবি বলেন–

'বড় বড় গুনাহের সূচনা, ছোট ছোট গুনাহ থেকে হয়।
আগুনের ছোট শিখা থেকেই বড় অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত হয়।'

কোন গুনাহকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে না। ছোট গুনাহ শয়তানের একটি টোপ মাত্র। জালে আবদ্ধ করার জন্যে সে টোপ দেয়। তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। খোদাভীতি ও আখেরাতের চিন্তা অন্তর থেকে বের করে ছোট থেকে বড় গুনাহ করাতে চায়। এজন্য গুনাহ ছোট হোক বা বড় হোক, আল্লাহর ভয়ে তা ছেড়ে দিতে হবে।

ছগীরা গুনাহ না কবীরা গুনাহ

হাকীমুল উম্মাত আশরাফ আলী থানবী রহ. বলেন, মানুষ জিজ্ঞাসা করে, এটি ছগীরা গুনাহ না কবীরা গুনাহ? উদ্দেশ্য হল, ছগীরা হলে তা করবে, আর কবীরা হলে বাঁচার চেষ্টা করবে।

তিনি বলেন, ছগীরা ও কবীরা গুনাহ একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও একটি প্রজ্জলিত বড় কয়লার মত। কেউ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছোট মনে করে সিন্দুকে রাখে না। কারণ, তা ছোট হলেও সিন্দুকের সব কিছু পুড়িয়ে ভস্ম করে দেবে। গুনাহও এ রকম, ছোট হোক বা বড় হোক তা জীবনের সব সঞ্চয় ধ্বংস করে দেবে।

গুনাহ ছোট না বড় এ কথা চিন্তা কর না। বরং চিন্তা কর, এটা গুনাহ কি না? এ কাজ নাজায়েয কি না? আল্লাহ তাআলা এ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন কি না? মোটকথা, আল্লাহর সামনে জবাবদিহিতার কথা স্মরণ করে সকল গুনাহ থেকে বিরত থাকো।

অন্তরে গুনাহের ইচ্ছা জাগ্রত হলে, আল্লাহর নিকট হিসাব দেয়ার কথা, কবরের কথা, দোযখের কথা চিন্তা করবে, তাহলে সকল গুনাহ থেকে বিরত থাকা সম্ভব হবে।

গুনাহের চাহিদা হলে কী করবেন

হযরত ডাক্তার আবদুল হাই রহ. বলতেন, আল্লাহকে না দেখার কারণে তাঁকে কল্পনা করতে সমস্যা হয়। যে বস্তু দেখা যায় তার কল্পনা করা সহজ। এজন্য আল্লাহর ধ্যান, তার কল্পনা অনেকটা কঠিন হয়ে যায়।

গুনাহের চাহিদা হলে ভাববে, এহেন গর্হিত কাজে লিপ্ত হলে আমার পিতা, সন্তান, উসতাদ অথবা আমার কোন ছাত্র দেখে ফেলতে পারে। অথবা কোন বন্ধু-বান্ধবের মুখোমুখি হতে পারি। তখন আমি লজ্জিত হব। এ ভেবে তা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করবে।

কু-দৃষ্টির বাসনা অন্তরে সৃষ্টি হলে ছেলের সামনে, পিতা কিংবা ছাত্র-উসতাদের সামনেও কি কেউ কু-দৃষ্টি করবে? তাদের দেখার ভয়ে বা নিজের মান-সম্মানের ভয়ে হলেও তা থেকে অবশ্যই বিরত থাকবে। সৃষ্টির সামনে লজ্জিত হয়ে খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকলে, সকল সৃষ্টির স্রষ্ঠা, সর্বদ্রষ্টা আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়ানোর কল্পনা সকল গুনাহ থেকে অবশ্যই বিরত রাখবে।

গুনাহের স্বাদ সাময়িক

গুনাহে অভ্যস্ত হলে তা থেকে বিরত থাকা কষ্টকর হয়। বাচার একমাত্র উপায় হল– নিজেকে সব গুনাহ থেকে জোরপূর্বক বিরত রাখা। আল্লাহর ভয়ে গুনাহের সকল কামনা-বাসনাকে পদদলিত করা। তাহলে অন্তরে ঈমানের স্বাদ পাওয়া যাবে। গুনাহের মজা তুচ্ছ মনে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

হাকীমুল উম্মাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. বলেন, গুনাহের মজা অস্থায়ী ও কৃত্রিম। এ মজা চুলকানির মজার মত। চুলকানোর সময় ভাল লাগলেও তা সুস্থতার ভাল লাগা নয়। বেশি চুলকালে সে স্থানে জখম হয়ে যায়। জখমের কষ্ট চুলকানির মজা দূর করে দেয়। পক্ষান্তরে না চুলকিয়ে ক্ষতস্থানে মলম লাগালে এবং তিক্ত ঔষধ সেবন করলে চুলকানির কষ্ট থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থতার মজা লাভ হয়।

গুনাহের স্বাদ পরিত্যাগ করে তাকওয়ার স্বাদ অর্জন কর। গুনাহ বর্জন করে, তার প্রাপ্তি পদদলিত করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করাই মূল উদ্দেশ্য। আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করে আমাদেরকে এ সত্য উপলব্ধি করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

যৌবনে খোদার ভয়, বার্ধক্যে ক্ষমার আশা

মুমিনের অন্তরে আল্লাহর ভয়ও থাকতে হবে, ক্ষমার আশাও থাকতে হবে। বুযুর্গানে দ্বীন বলেন, যৌবনে আল্লাহর ভয় ও বৃদ্ধাবস্থায় ক্ষমার আশা থাকা বেশি উত্তম। যৌবনে হাত-পা সচল থাকে, মেরুদণ্ড শক্ত থাকে, সব ধরনের কাজ করার ক্ষমতা থাকে, গুনাহের চাহিদাও বেশি থাকে। আল্লাহর ভয় সকল গুনাহ থেকে বিরত রাখতে পারে। এ জন্য যৌবনে আল্লাহর ভয় অধিক উপকারী। কিন্তু বৃদ্ধাবস্থায় আল্লাহর রহমত পাওয়ার আশা বেশি থাকতে হবে, যেন হতাশার সৃষ্টি না হয়।

ভয়–ভীতির উপর পৃথিবীর শৃঙ্খলা নির্ভরশীল

অনেকেই বলেন, আল্লাহকে ভয় করব কেন? তিনি তো আমাদের সৃষ্টিকর্তা। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে– তিনি গফুরুর রহীম, ক্ষমাশীল ও দয়ালু। তাহলে তাঁকে ভয় করব কেন? অন্তরে এমন চিন্তা থাকলে খোদাভীতি অর্জনের প্রয়োজনীয়তা নিঃশেষ হয়ে যায়। ফলশ্রুতিতে জীবন গুনাহের অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যায়।

'ভয়' এমন জিনিস, যা ছাড়া পৃথিবীতে কোন কাজ চলতে পারে না। পরীক্ষায় ফেল করার ভয়ে ছাত্ররা পরিশ্রম করে। বরখাস্ত হওয়ার ভয়ে কর্মস্থলে কর্তব্য পালন করে। ছেলের অন্তরে পিতার ভয়, অধীনস্ত কর্মচারীর অন্তরে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ভয় এবং প্রজাদের অন্তরে আইনের ভয় না থাকলে জুলুম-নির্যাতন ও অন্যায়ে পৃথিবী ভরে যাবে। নৈরাজ্য এবং অরাজকতা সৃষ্টি হবে। নিরাপত্তাহীনতা ও অস্থিরতার তুফান বয়ে যাবে। কারো কোন অধিকার ও ইজ্জত-আব্রু সংরক্ষিত থাকবে না। মানুষের জীবন মশা-মাছির চেয়েও মূল্যহীন হয়ে যাবে।

আমাদের অন্তরে খোদাভীতি নেই, আইনের ভয় নেই। দু'পয়সায় আইন বিক্রি হচ্ছে। শত অন্যায় করেও টাকার বিনিময়ে মুক্তি পাচ্ছে। যার ফলে সন্ত্রাস, খুন-খারাবী ও সব ধরনের অন্যায়ে সমাজ ছেয়ে গেছে।

স্বাধীনতা আন্দোলন ও লাল টুপি

ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজদের বিতারিত করতে হিন্দু-মুসলমান যৌথভাবে আন্দোলন করছিল। মিটিং-মিছিল, হরতাল করছিল। হিন্দু-মুসলমান কোন ভেদাভেদ ছিল না। মাথায় তিলক দিয়ে মুসলমানরাও হিন্দুদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নিতো। আন্দোলনের নামে যেসব কর্ম-কাণ্ড হচ্ছিল তা হযরত

আশরাফ আলী থানবী রহ. পছন্দ করতেন না। এজন্য তিনি তাঁর মুরিদ ও ভক্তবৃন্দদেরকে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করতেন।

আন্দোলনের প্রতিনিধিদল থানবী রহ.-এর নিকট আবেদন করল, 'আপনি আন্দোলনে শরীক হলে ইংরেজদেরকে দ্রুত বিতারিত করা সম্ভব হবে। আপনি বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে ইংরেজরা এখনো বহাল তবিয়তে রয়েছে।'

হযরত থানবী রহ. বললেন, আন্দোলনের পদ্ধতি আমার নিকট পছন্দ নয়, অংশগ্রহণ করব কীভাবে? তাছাড়া মিটিং-মিছিল, হরতাল ইত্যাদি করে এ পর্যন্ত কী কী সফলতা অর্জিত হয়েছে?

তাদের একজন বলল, 'স্বাধীনতা অর্জন না হলেও একটি উপকার হয়েছে– মানুষের অন্তর থেকে 'লালটুপির ভয়' দূর হয়েছে। (তখন পুলিশরা লালটুপি পড়ত। 'লালটুপির ভয়' বলে পুলিশের ভয় বুঝানো হয়েছে) কারো অন্তরে আর পুলিশের ভয় নেই। এটা একটা বড় সফলতা। এভাবে অগ্রসর হলে একসময় স্বাধীনতাও অর্জন করতে পারব।'

হযরত থানবী রহ. একটি বিজ্ঞচিত উত্তর দেন, তিনি বলেন– 'লালটুপির ভয় দূর করে অত্যন্ত খারাপ কাজ করেছেন। কারো অন্তরে পুলিশের ভয় না থাকলে চুরি-ডাকাতি, অন্যায়-অবিচার বেড়ে যাবে। সামাজে নিরাপত্তাহীনতা ও অশান্তি বিরাজ করবে। মানুষের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু ইত্যাদি হুমকির সম্মুখীন হবে। আপনারা যদি লালটুপির ভয় দূর করে 'সবুজ টুপি'র ভয় প্রবেশ করাতে পারতেন তবুও বলা যেত, কিছু সফলতা অর্জিত হয়েছে।

অন্তর থেকে ভয় চলে গেছে

ষাট বছর পূর্বে থানবী রহ. এ কথা বলে গেছেন। আজ আমরা তা স্বচোক্ষে দেখছি। অন্তরে ভয় না থাকার কারণে সমাজে অশান্তি ও অরাজকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ মানুষের অন্তরে যখন ভয় ছিল, তখন কোথাও কেউ নিহত হলে সারাদেশ প্রকম্পিত হত, নিষ্ঠার সহিত তদন্ত করা হত। আর এখন ভয় না থাকার কারণে মানুষের প্রাণ মশা-মাছির চেয়েও মূল্যহীন হয়ে গেছে।

খোদাভীতি অর্জন করুন

পৃথিবীর কোন কিছু 'ভয়' ছাড়া চলতে পারে না। 'ভয়' থাকলে সবকিছু ঠিক থাকবে, অন্যায়-অবিচার দূর হবে। ঠিক তেমনি দ্বীনের মূলভিত্তি হল 'খোদাভীতি'। খোদাভীতি থাকলে দ্বীনের ভিত্তিও ঠিক থাকবে। অন্যথায় মুহূর্তে সব শেষ হয়ে যাবে। পবিত্র কুরআনে বারবার বলা হয়েছে– 'তোমরা আল্লাহকে

ভয় কর, তাকওয়া অর্জন কর'। তাকওয়া অর্থ– আল্লাহর ভয়ে সব গুনাহ থেকে বিরত থাকা। জান্নাত, জাহান্নাম, আল্লাহর বড়ত্ব ও ক্ষমতার আলোচনায় পবিত্র কুরআন ভরপুর। যেন এগুলোর চিন্তা অন্তরে খোদাভীতি সৃষ্টি করে।

নির্জনে খোদাভীতি

পুলিশের ভয়, আইনের ভয়, শাস্তির ভয় এবং জেল-হাজতের ভয় প্রকাশ্যে অন্যায় থেকে বিরত রাখে, কিন্তু অন্তরে আল্লাহর ভয় অর্জন হলে অন্ধকার রাতে, নির্জন জঙ্গলে মানুষকে গুনাহ থেকে বিরত রাখবে। যখন দেখার কেউ থাকবে না।

রোযা অবস্থায় খোদাভীতি

পবিত্র রমযান মাসে খোদাভীতি লক্ষ্য করা যায়। মানুষ যত পাপীই হোক না কেন, রমযান মাসে রোযা রেখে আল্লাহর ভয়েই পানাহার থেকে বিরত থাকে।

প্রচণ্ড গরম, কঠিন পিপাসা, প্রাণ ওষ্ঠাগত, ফ্রিজে ঠাণ্ডা পানি রয়েছে, দরজা বন্ধ, ঘরে কেউ নেই, পানি পান করতে মন চাইছে, দেখার মত কেউ নেই, গাল-মন্দও কেউ করবে না। পানি পান করলেও সবাই তাকে রোযাদার বলবে। কিন্তু একমাত্র আল্লাহ তাআলার ভয়ই তাকে ঠাণ্ডা পানি পান করা থেকে বিরত রাখে।

সর্বাবস্থায় এ ভয় সৃষ্টি করুন

অবৈধ জায়গায় তাকানোর ইচ্ছা হলে, গীবত, পরনিন্দা বা মিথ্যা বলতে মন চাইলে, আল্লাহর ভয়ে তা ত্যাগ করুন। পবিত্র রমযান মাসে রোযা রেখে আল্লাহর ভয়ে যেমন একাকী ঘরের মধ্যে পানাহার করেননি, ঠিক সকল ক্ষেত্রেই আল্লাহর এ ভয় অন্তরে সৃষ্টি করুন। গুনাহের স্বাদকে পদদলিত করুন। অন্তরে খোদাভীতি সৃষ্টি হলে, তাঁর মর্জির খেলাফ কোন কাজ হতে পারে না। এমন তাকওয়া ও খোদাভীতিই শরীয়তের দাবি।

জান্নাত কার জন্যে

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى – فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

'যে ব্যক্তি স্বীয় রবের সম্মুখে দাঁড়িয়ে প্রতিটি আমলের জবাব দেয়ার ভয় রাখবে এবং কুপ্রবৃত্তি থেকে নাফসকে বিরত রাখবে, অবশ্যই তার ঠিকানা হবে জান্নাত।' (সূরা ৭৯ নাজিয়াত, আয়াত-৪০-৪১)

আল্লাহ তাআলা কত সুন্দর ভাষায় সুসংবাদ দিয়েছেন– যে ব্যক্তি নিজ প্রভুর সামনে দাঁড়ানোর ভয় করবে। আমাকে একদিন আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে হবে, আমলের হিসাব দিতে হবে, আমি কোন মুখ নিয়ে তাঁর সামনে যাবো? এ ভয় বেশি বেশি সৃষ্টি করবে যা প্রবৃত্তিকে সকল নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখবে। তাহলে তোমার ঠিকানা হবে 'জান্নাত'। জান্নাত এমন ব্যক্তির জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে।

জান্নাত দুঃখ-কষ্টে ঘেরা

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন–

حُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ

'জান্নাতকে কষ্টদায়ক বস্তু দ্বারা ঢেকে দেয়া হয়েছে।'

(বুখারী শরীফ, হাদীস-৬০০৬)

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা জান্নাতকে এমন বস্তু দ্বারা ঘিরে রেখেছেন, যা মানুষের নিকট অপছন্দনীয়। জান্নাতকে আল্লাহ তাআলা কষ্টসাধ্য বস্তু দ্বারা ঘিরে রেখেছেন। কষ্ট করলে জান্নাতে যাওয়া যাবে। অন্তরে খোদাভীতি সৃষ্টি করতে হবে, নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে এবং কষ্ট করে **ভাল** কাজ করতে হবে, তাহলে জান্নাতে যাওয়া সহজ হবে।

সাহাবায়ে কেরামের অন্তরে এ ভয় এত বেশি ছিল যে, তাঁরা প্রতিটি কাজে আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে বিরত থাকতেন, তাঁর রেজামন্দি ও সন্তুষ্টি তালাশ করতেন। কখনো কিছু হলে তার শাস্তি গ্রহণ করা ছাড়া শান্ত হতেন না।

ইবাদত করেও ইস্তিগফার করতে হবে

'খোদাভীতি' বৃদ্ধি পেলে শুধু গুনাহের ভয়ই সৃষ্টি হবে না, বরং ইবাদতের ক্ষেত্রেও ভয় হবে। আল্লাহ তাআলার শান অনুযায়ী ইবাদত হচ্ছে কি না, তাঁর সামনে পেশ করার মত ইবাদত করতে পারছি কি না। কোন প্রকার ঔদ্ধত্য বা বেয়াদবি তো হয়ে গেল না? এ জন্য বুযুর্গানে দ্বীন বলেন, মুমিন ব্যক্তি ইবাদতও করবে আবার অন্তরে ভয়ও রাখবে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا

'তাদের পার্শ্বদেশ (রাতে) বিছানা থেকে আলাদা হয়। তারা ভয় ও আশা নিয়ে তাদের রবকে ডাকে।' (সূরা ৩২ সিজদা, আয়াত-১৬)

রাত্রে তাদের পাঁজর বিছানা থেকে পৃথক থাকে, তারা আল্লাহকে ডাকে, তাঁর ইবাদত করে। কিন্তু অন্তরে ভয় ও শঙ্কা থেকে যায়, হতে পারে এ ইবাদত আল্লাহর দরবারে পেশ করার উপযুক্ত নয়।

আল্লাহওয়ালাদের অবস্থা

নেককারদের আলোচনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলেন–

كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ - وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

'রাতের সামান্য অংশই এরা (আল্লাহর নেক বান্দাগণ) ঘুমিয়ে কাটাত। আর রাতের শেষ প্রহরে এরা ক্ষমা চাওয়ায় রত থাকত।'

(সূরা ৫১ আয-যারিয়াত, আয়াত-১৭-১৮)

উক্ত আয়াত সম্পর্কে হযরত আয়েশা রাযি. রাসূলুল্লাহ সা.কে জিজ্ঞাসা করলেন– 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইস্তেগফার করা হয় গুনাহের জন্য। সারা রাত ইবাদত করার পর আবার ইস্তেগফার কিসের?'

রাসূলুল্লাহ সা. বললেন– 'তাঁরা ইবাদত করেও ইস্তেগফার করে, কারণ তাঁদের চিন্তা হল– যেরূপ ইবাদত করা উচিত ছিল, তা করতে পারিনি। ইবাদতের হক আদায় করতে পারিনি।'

মোটকথা, আল্লাহর নেক বান্দাগণ শুধু গুনাহের ভয়ই করে না, বরং ইবাদতে ভুল হওয়ার ভয়ও করে যে, এ ইবাদত আবার আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টির কারণ না হয়।

আল্লাহর পরিচয়ের পরিমাণ তাঁর ভয়

আল্লাহর মারেফত তথা পরিচয় বেশি থাকলে, তাঁর অন্তরে ভয়ও বেশি থাকে। পক্ষান্তরে আল্লাহর মারেফত না থাকলে, তাঁর ভয়ও কম হবে। ছোট শিশুর কাছে রাজা-বাদশা ও হিংস্র প্রাণী সমান। কাউকে সে ভয় পায় না। কাছে যেতে, স্পর্শ করতে অন্তর কাঁপে না। বাদশার মর্যাদা ও বাঘের ভয় তার অন্তরে থাকলে নিকটে যেতে অন্তর কাঁপত।

নবীগণ আল্লাহর পরিচয় বেশি লাভ করেছিলেন। তাঁরা সর্বদা আল্লাহর ভয়ে প্রকম্পিত থাকতেন। সাহাবায়ে কেরামের অন্তরে আল্লাহর 'পরিচয়' ছিল, এজন্য তাঁরাও আল্লাহকে বেশি ভয় করতেন।

হযরত হানজালা রাযি.-এর খোদাভীতি

হযরত হানজালা রাযি. রাসূলুল্লাহ সা.-এর দরবারে গিয়ে আরয করলেন–

نَافَقَ حَنْظَلَةُ

'(ইয়া রাসূলাল্লাহ!) হানযালা মুনাফেক হয়ে গেছে।'

(মুসলিম শরীফ, হাদীস-৪৯৩৭)

রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, কীভাবে?

তিনি বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার মজলিসে বসে জান্নাত, জাহান্নাম ও আখেরাতের আলোচনা শুনলে, অন্তর নরম হয়, দুনিয়া বিমূখতা এবং আখেরাতের ফিকির সৃষ্টি হয়। কিন্তু বাড়ী গিয়ে বিবি-বাচ্চার সাথে মিশলে, কায়-কারবারের সাথে যুক্ত হলে অন্তরের সে অবস্থা থাকে না। দুনিয়ার ভালবাসা অন্তরে স্থান করে নেয়। তাহলে এখানে এসে এক অবস্থা আর বাইরে গিয়ে অন্য অবস্থা। এটাতো মোনাফেকের নিদর্শন।'

উত্তরে রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, এতে ভয়ের কিছু নেই। কারণ এমন অবস্থা কখনো কখনো হয়। অন্তরের নম্রতা কখনো কম আবার কখনো বেশি হবে। আল্লাহর নিকট সাময়িক এ পরিবর্তনের কোন ধর্তব্য হবে না। ধর্তব্য হবে আমলের উপর। কোন আমল যেন শরীয়ত পরিপন্থী না হয়।

হযরত ওমর ফারুক রাযি.-এর খোদাভীতি

'ওমর জান্নাতে যাবে' এ ঘোষণা হযরত ওমর রাযি. নিজ কানে রাসূলুল্লাহ সা. থেকে শুনেছেন এবং এ ঘটনাও শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন– 'আমি মে'রাজে গিয়ে জান্নাত ভ্রমণ করছিলাম। সেখানে একটি নয়নাভিরাম প্রাসাদ দেখতে পেলাম। প্রাসাদের পাশে একটি যুবতীকে ওযু করতে দেখে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, প্রাসাদটির মালিক কে? মেয়েটি বলল– এটির মালিক ওমর রাযি.। প্রাসাদটি এত বেশি আলিশান ছিল যে, ভিতরে ঢুকে দেখতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু ওমরের আত্ম মর্যাদাবোধের কথা স্মরণ করে প্রবেশ করিনি।'

ওমর রাযি. এ কথা শুনে কেঁদে ফেললেন এবং বললেন–

أَعَلَيْكَ أَغَارُ يَا رَسُولَ اللهِ

'ইয়া রাসূলাল্লাহ সা., আপনার উপরও কি আত্ম মর্যাদা দেখাব?'

(বুখারী শরীফ, হাদীস-৩০০৩)

হযরত ওমর রাযি. রাসূলের মুখে তাঁর জান্নাতী হওয়ার ঘোষণা শুনেছেন, শুনেছেন জান্নাতে তাঁর আলিশান প্রাসাদের কথা। তবুও ভয়-ভীতির অবস্থা

এমন ছিল, হুজুর সা.-এর ইন্তিকালের পর হুজাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি.-এর নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হুজাইফা! মুনাফেকদের তালিকায় আমার নাম নেইতো?' (রাসূল সা. হুজাইফা রাযি. কে মদীনার মুনাফেকদের নাম বলে দিয়েছিলেন)।

রাসূলের সুসংবাদের পরেও তাঁর অন্তরে ভয়ের অবস্থা এমন ছিল যে, হতে পারে পরবর্তী কোন আমল সুসংবাদকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। তাই ওমর রাযি.-এর অন্তরে সব সময় ভয়-ভীতি ও শঙ্কা লেগেই থাকত।

মোটকথা, যার অন্তরে আল্লাহর পরিচয় যে পরিমাণ থাকবে, তার ভয়ও সে পরিমাণ হবে। এ ভয় একটুও অর্জন না হলে তাকওয়া ও খোদাভীতি অর্জন হতে পারে না।

খোদাভীতি অর্জনের পদ্ধতি

খোদাভীতি অর্জনের পদ্ধতি হল, রাত-দিনের কিছু সময়, ফজর অথবা এশা'র নামায পর একটি সময় নির্ধারণ করে কল্পনা করবে– 'মৃত্যুশয্যায় শায়িত, দেহ ছেড়ে প্রাণ চলে যাচ্ছে, আত্মীয়-স্বজন জমায়েত হয়েছে। মৃত্যুর পর আমাকে কাফনের কাপড় পরিয়ে কবরে রেখে আসছে। মুনকার-নাকীর এসে প্রশ্নোত্তর করছে। আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয়ে হিসাব দিতে হচ্ছে... ইত্যাদি কথা স্মরণ করবে।'

মৃত্যুর কথা ভুলে থাকার কারণে উদাসীনতা ও বেপরোয়াভাব আমাদেরকে গ্রাস করে নিয়েছে। প্রতিদিন কিছু সময় এ কথাগুলো স্মরণ করলে উদাসীনতা ও বেপরোয়াভাব দূর হয়ে যাবে। প্রিয়জনের জানাযা কাঁধে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে, নিজ হাতে কবরে রাখছে। অথচ কিছুক্ষণ পূর্বেই সেই প্রিয়জন দুনিয়া অর্জনের জন্য সকাল-সন্ধ্যা দৌড়-ঝাঁপ করছিল, কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করছিল, কিন্তু কবরে যাওয়ার সময় মুখ ফিরিয়ে একটু দেখার সুযোগও হল না।

এতকিছু দেখার পরও আমরা নিজের সম্পর্কে ভাবি না যে, দুনিয়া থেকে আমাকেও একদিন বিদায় নিতে হবে।

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন–

أَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ

'সকল স্বাদ বিনষ্টকারী মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ কর।'

(তিরমিযী শরীফ, হাদীস-২৩৮৪)

প্রতিদিন কিছু সময় মৃত্যুর কথা, কবরের কথা, আল্লাহর সামনে জবাবদিহির কথা চিন্তা করলে খোদাভীতি অবশ্যই সৃষ্টি হবে, ইনশাআল্লাহ।

আমল করে গর্ব কর না

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন–

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

وَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ

'তোমাদের কেউ কেউ সারা জীবন খারাপ কাজ করে জাহান্নামের উপযোগী হয়ে যায়, কিন্তু ভাগ্য তার উপর বিজয়ী হয়, তখন সে ভাল আমল করে জান্নাতী হয়ে যায়। পক্ষান্তরে কেউ সারা জীবন ভাল আমল করে জান্নাতের নিকটবর্তী হয়ে যায়। জান্নাত ও তার মাঝে সামান্য ব্যবধান থাকে। কিন্তু তার ভাগ্য তার উপর বিজয়ী হয়। তখন সে এমন খারাপ আমল করে, যা তাকে জাহান্নামে নিয়ে যায়।' (বুখারী শরীফ, হাদীস-৬১১৭)

এরপর রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন–

وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ

'জীবনের শেষ আমলের ধর্তব্য হবে'।

অর্থাৎ সারা জীবন যে আমলই করুক, জীবনের শেষ মুহূর্তে কেমন আমল করেছে তার উপরই জান্নাত-জাহান্নাম পাওয়া না পাওয়া নির্ভর করবে। এজন্য নেক আমলের উপর গর্ব করা উচিত নয়। কারণ, কোন আমলের নিশ্চয়তা নেই। নিশ্চয়তা শুধু জীবনের শেষ আমলের। হতে পারে সারা জীবন ভাল আমল করেছে, কিন্তু শেষ জীবনের একটা আমলের কুফল তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। এ জন্য ভাল আমল করলেও ভয় করা উচিত।

মন্দ আমলের কুফল

'জাহান্নামে যাওয়ার আমল বান্দার দ্বারা জোরপূর্বক করানো হয় না। বরং সে নিজের ইচ্ছায় করে।' গুনাহের পরিণতি এত ভয়ঙ্কর যে, একটি গুনাহ সারা জীবনের সঞ্চিত নেকির ভাণ্ডার নিঃশেষ করে দিতে পারে। কিছু কিছু গুনাহ এমন রয়েছে, যা দ্বিতীয় আরেকটি গুনাহের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে, দ্বিতীয়টি তৃতীয় আরেকটি গুনাহের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে, এক সময় তাকে জাহান্নামের গভীরে নিক্ষেপ করে।

এজন্য বুযুর্গানে দ্বীন বলেছেন, কোন গুনাহকে ছোট মনে করবে না। হতে পারে ছোট একটি গুনাহ তোমার সারা জীবনের নেক আমলকে ধ্বংস করে দেবে। ছোট গুনাহই একসময় বড় গুনাহে পরিণত হয়। গুনাহের নগদ শাস্তি হল, এক গুনাহ অন্য গুনাহকে টানে। নতুন নতুন গুনাহে লিপ্ত করে।

আল্লাহওয়ালাদের সাথে বেয়াদবীর পরিণতি

আল্লাহওয়ালাদের সাথে বেয়াদবী করলে, তাঁদের অসম্মানী করলে অথবা তাঁদের অন্তরে ব্যথা দিলে ভাগ্য বদলে যেতে পারে। এজন্য কোন বিষয়ে তাঁদের সাথে 'এখতেলাফ' বা মতানৈক্য হলে তা সাধারণ এখতেলাফ বা মতানৈক্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবে। বেয়াদবী বা ঔদ্ধত্ব আচরণ করলে কঠিন শাস্তি ভোগ করা লাগতে পারে।

আমার আব্বা মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. 'দরসে ইবরত' নামক গ্রন্থে একজন বুযুর্গের ঘটনা লিখেছেন। তিনি সারা জীবন ভাল কাজ করেছেন। হঠাৎ তার ভাগ্য বদলে যায় এবং খারাপ কাজে লিপ্ত হয়।

ছোট গুনাহের শাস্তি কখনো অনেক বড় হয়ে থাকে। এ জন্য বলা হয়, ছোট ভেবে কখনো কোন গুনাহ কর না। কারণ, হতে পারে সেই ছোট গুনাহই জীবনের শেষ মুহূর্তে খারাবী ডেকে আনবে । এ জন্য আল্লাহওয়ালাগণ ভাল পরিণামের জন্য সর্বদা আল্লাহ তাআলার নিকট দুআ করতেন।

নেক আমলের বরকত

সারা জীবন খারাপ আমল করেছে, গুনাহ করেছে, এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা কখনো নেক আমলের তাওফীক দান করেন। কোন নেক আমলের বিনিময়ে এ তাওফীক অর্জন হয়। পরিণতিতে জান্নাতের রাস্তা খুলে যায়।

রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, 'কোন সৎ কাজকে তুচ্ছ মনে কর না।' কারণ, একটি ক্ষুদ্র আমলই জীবনের পরিবর্তন ঘটাতে পারে, সীমানা পার করে দিতে পারে। জান্নাতে পৌঁছে দিতে পারে।

অনেক আল্লাহওয়ালাদের জীবনীতে দেখা যায়, ছোট কোন আমলের বদলায় আল্লাহ তাআলা তাঁদের জীবন পরিবর্তন করে দিয়েছেন। এজন্য ছোট আমলকে তুচ্ছ মনে না করা উচিত।

সৎকাজ করলে আমলনামায় নেকি বৃদ্ধি পায়। এজন্য 'আছান নেকিয়া' নামক একটি পুস্তিকায় ছোট ছোট আমলের ফযীলতপূর্ণ হাদীস একত্রিত করে দিয়েছি। পুস্তিকাটি সকলের উপকারে আসবে। পুস্তিকাটি পাঠ করা উচিত এবং নেক কাজগুলো জীবনের প্রতিটি স্তরে বাস্তবায়ন করা উচিত।

ভাগ্যের মূলতত্ত্ব

অনেকে বলে, ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। কে জান্নাতী আর কে জাহান্নামী তা যেহেতু ফায়সালা হয়েই আছে, অতএব আমল করে লাভ কি? ভাগ্যে যা লেখা আছে তাই হবে।

বিষয়টি ভালভাবে বোঝা দরকার। হাদীসের উদ্দেশ্য এই নয় যে, 'তোমরা ঐ আমলই করবে যা ভাগ্যে লেখা আছে'। বরং উদ্দেশ্য হল– 'তোমরা স্ব-ইচ্ছায় যে আমল করবে তাই লেখা আছে'। কারণ, 'তাকদীর' আল্লাহর জ্ঞানের নাম। আর আল্লাহর এ কথা আগেই জানা ছিল যে, তোমরা কী কী আমল করবে। আল্লাহ তাআলা সে অনুযায়ী সব কিছু 'লাওহে মাহফুজে' লিখে রেখেছেন। জান্নাতে অথবা জাহান্নামে যাওয়া প্রকৃতপক্ষে বান্দার স্বাধীন আমলের উপর নির্ভর করে। 'ভাগ্যে যা লেখা আছে মানুষ তাই করবে' এমনটি নয়, বরং 'ভাগ্যে তাই লেখা আছে যা সে নিজের ইচ্ছায় করবে'।

এ কথা ভেবে হাতের উপর হাত রেখে বসে থাকা যাবে না যে, সব কিছুতো ভাগ্যে লিখে দেয়া হয়েছে, আমার কিছুই করার নেই। কারণ, আল্লাহ তাআলা মানুষকে ইচ্ছা ও ক্ষমতা দান করেছেন। সেই ইচ্ছা ও ক্ষমতাবলে মানুষ আমল করবে।

রাসূলুল্লাহ সা. এ হাদীস ইরশাদ করার পর সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কে জান্নাতী আর কে জাহান্নামী এ ফায়সালা হয়ে থাকলে আমল করে লাভ কি?

উত্তরে তিনি বললেন, তোমরা আমল করতে থাকো। কারণ, সকলকে সে কাজই করতে হবে, যে কাজের জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব ইচ্ছা শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আমল করতে থাকো।

নিশ্চিন্ত হইও না

হাদীসটি এখানে বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হল– কেউ যেন এ কথা না ভাবে যে, আমি অনেক আমল করি, ওযীফা আদায় করি, তাসবীহ পাঠ করি, নফল নামায পড়ি এবং স্ব-ইচ্ছায় শরীয়তের উপর চলি। অতএব আমার কোন ভয় নেই।

মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়, বরং সর্বদা এ চিন্তা ও ভয় রাখা উচিত যে, আমার এ সুন্দর অবস্থা যেন পরিবর্তন না হয়।

আল্লামা রুমী রহ. বলেন–

এ পথে চলতে নেমেছ যদি * অবসর ভেবো না শেষ অবধি

অর্থাৎ এ পথে সর্বদা ছাঁাই-বাছাই হতে থাকে। এজন্য নিজের নফসকে নেগরানী করতে হবে, তত্ত্বাবধান করতে হবে, যেন ভুল পথে না যায়। নফসের নেগরানী ও তত্ত্বাবধান না করার কারণে অনেক বড় বড় মনীষীরা হোঁচট খেয়েছেন। অতএব শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত চিন্তামুক্ত ও শংকামুক্ত হওয়া উচিত নয়।

জাহান্নামের সবচেয়ে নিম্নমানের শাস্তি

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন–

أَهْوَنُ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا أَبُو طَالِبٍ وَهُوَ مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ

‘কেয়ামতের দিন সবচেয়ে নিম্নমানের শাস্তি হবে আবু তালেবের। তার পায়ে আগুনের দুটি জুতা থাকবে। তাপে তার মগজ গলতে থাকবে।’

(মুসলিম শরীফ, হাদীস৩১২)

সে ভাববে, সবচেয়ে বেশি শাস্তি বুঝি তাকেই দেয়া হচ্ছে। অথচ তার শাস্তি সবচেয়ে হালকা!

এই সহজ শাস্তি হুজুর সা.-এর চাচা আবু তালেবের হবে। কারণ, তিনি রাসূলুল্লাহ সা.কে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঈমান আনতে পারেননি।

উক্ত হাদীস দ্বারা এ কথা বুঝানো উদ্দেশ্য যে, সবচেয়ে হালকা শাস্তি হল– ‘আগুনের আংটার গরমে মাথার মগজ গলতে থাকবে’। তাহলে কঠিন শাস্তির ধুমকি যাদের দেয়া হয়েছে, তাদের অবস্থা কেমন হবে? মানুষ যদি মাঝে মাঝে এই ভয়াবহ শাস্তির কথা চিন্তা করত, তাহলে অন্তরে অবশ্যই খোদাভীতি ও তাকওয়া অর্জন হত।

জাহান্নামীদের স্তর

দোযখীদের স্তর বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, কিছু জাহান্নামীর টাখনু পর্যন্ত আগুন হবে। কারো হাঁটু পর্যন্ত, কারো কোমর পর্যন্ত এবং কারো আগুন গলার নিচের হাড় পর্যন্ত পৌঁছবে। আগুন এভাবে গ্রাস করলে, সর্বাঙ্গে শুধু আগুনের জলন্ত কয়লা থাকলে তার ভয়াবহ অবস্থা কেমন হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাঁর দয়া এবং অনুগ্রহে জাহান্নাম থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

হাশরের মাঠে মানুষের অবস্থা

এ ছিল জাহান্নামে প্রবেশ করার পরের অবস্থা। এর পূর্বে হাশরের ময়দানে উপস্থিত করা হলে সকলের অবস্থা কেমন হবে সে ব্যাপারে রাসূল সা. ইরশাদ করেন, মানুষ এমন অবস্থায় আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে যে, নিজের ঘামে কান পর্যন্ত ডুবে থাকবে। অন্য হাদীসে আছে, কেয়ামত দিবসে মানুষ এ পরিমাণ ঘামবে যে, সত্তর হাত জমিন পর্যন্ত ঘাম প্রবাহিত হতে থাকবে এবং তা মানুষের কান পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।

জাহান্নামের গভীরতা ও প্রশস্ততা

আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, ‘একদা রাসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট আমরা বসে ছিলাম। হঠাৎ কোন কিছু পড়ার আওয়াজ হল। রাসূলুল্লাহ সা. আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি জান এটা কিসের আওয়াজ? আমরা উত্তরে বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, আজ থেকে সত্তর বছর পূর্বে জাহান্নামের উপর হতে একটি পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছিল। আজ তা জাহান্নামের নীচে গিয়ে পৌঁছল। এ আওয়াজ সেই পাথরের।’

এক সময় এ ঘটনাকে মানুষ অতিরঞ্জিত মনে করত। বিস্ময় বোধ করত, একটি পাথর সত্তর বছর পর নিপতিত হল? কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির যুগে তা বোঝা সহজ হয়ে গেছে। বিজ্ঞান বলে, অনেক নক্ষত্র এমন আছে যার আলো এখনো পৃথিবীতে এসে পৌঁছেনি। আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট বস্তু এত প্রশস্ত হলে সত্তর বছর পর একটি পাথর জাহান্নামের গভীরে পৌঁছা কোন আশ্চর্যের বিষয় নয়।

মোটকথা, এ হাদীস দ্বারা জাহান্নামের গভীরতা ও প্রশস্ততা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তি থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

এসব হাদীসের উদ্দেশ্য হল, মানুষ মৃত্যু, জাহান্নাম ও জান্নাতের কথা চিন্তা করবে। ফলে অন্তরে নম্রতা ও খোদাভীতি অর্জন হবে। তখন নেক কাজ করা এবং গুনাহ ত্যাগ করা সহজ হয়ে যাবে। পাপ থেকে মুক্তির পথ মিলবে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলের অন্তরে এ ভয় সৃষ্টি করে দিন এবং গুনাহ থেকে বাঁচার হিম্মত ও সৌভাগ্য নসীব করুন। আমীন।

পিতা-মাতার সেবা : জান্নাত লাভের পথ

শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী

অনুবাদ : সালাহুদ্দীন মাসউদ

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর–২০০৬ ঈ.
দ্বিতীয় প্রকাশ : জুলাই–২০০৭ ঈ.

সূচী

সর্বশ্রেষ্ঠ আমল-৫১
ভাল কাজের প্রতি আকর্ষণ-৫২
আমি তো ঠকে গেছি-৫২
একই প্রশ্নের অনেক উত্তর-৫৩
মানুষের ভিন্নতায় আমলের ভিন্নতা-৫৪
নামাযের শ্রেষ্ঠত্ব-৫৪
জিহাদের শ্রেষ্ঠত্ব-৫৫
পিতা-মাতার হক-৫৬
নিঃস্বার্থ ভালবাসা-৫৬
পিতা-মাতার সেবা-৫৭
আত্মতৃপ্তি অর্জনের নাম দ্বীন নয়-৫৭
এটা দ্বীন নয়-৫৭
ওয়ায়েছ কুরুনী রহ. নবীজির সাক্ষাত পেলেন না-৫৮
মায়ের সেবার বদলা-৫৯
ত্যাগের বিরল দৃষ্টান্ত-৫৯
পিতা-মাতার সেবার গুরুত্ব-৬০
পিতা-মাতা যখন বৃদ্ধ হয়-৬১
শিক্ষণীয় ঘটনা-৬১
পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার-৬২
নামায যেমন ফরয-৬২
শিক্ষণীয় ঘটনা-৬৩
আলেম হতে অনুমতির প্রয়োজন-৬৩
জান্নাত লাভের সহজ পথ-৬৪
প্রতিকারের পদ্ধতি-৬৪
মায়ের তিন বাপের এক-৬৪
বাবার জন্য শ্রদ্ধা, মায়ের জন্য সেবা-৬৫
মায়ের সেবার সুফল-৬৬
নবীজি বললেন মা বাবার মুখে হাসি ফুটাও-৬৭
ওলীদের সাহচার্য-৬৭
শরীয়ত, সুন্নাত, তরীকত-৬৭

অনুবাদকের কথা

পিতা-মাতার সেবার গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে অনেক পুস্তক থাকতে পারে। কিন্তু বক্ষমান এই ছোট্ট পুস্তিকাটি একেবারেই ভিন্ন। কারণ, শাইখুল ইসলাম মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী, তাঁর কথা ও লেখা সম্পর্কে সচেতন মহলের অবশ্যই জানা আছে যে, নাম-ভূমিকায় অন্যান্য রচনার মত হলেও উপস্থাপনা শৈলী এবং বচনভঙ্গি অন্যান্য যে কোন রচয়িতার আঙ্গিক থেকে সত্যিই অনন্য।

পুস্তিকাটি ইসলাহী খুতুবাত এর 'অলেদাইন কি খেদমত' এর সরল অনুবাদ। এটিতে পাঠক মহল সেই অনন্য স্বাদ উপভোগের পরই দাবিটির সত্যতা যাচাই করবেন।

এমন একটি ভিন্ন স্বাদের রচনার অনুবাদ করতে পেরে আমি সত্যিই গর্বিত। সেই সাথে একজন বিজ্ঞ কলম সৈনিকের হাতে অনুবাদটির সম্পাদনা করতে পেরে আমার বুক গর্বে ফুলে উঠছে। সম্পাদকের নিপুন হাতের ছোটয়ায় অনুবাদটি রূপ-সৌন্দর্যে ভরপুর হয়েছে, পূর্ণ দ্বীপ্তি পেয়েছে।

প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে পিতা-মাতার সেবা ও খেদমত করে জান্নাত লাভ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

সালাহুদ্দীন মাসউদ
কলোনী, বগুড়া
০৬. ০৯. ০৬ ঈ.

'তোমরা ইবাদাত কর আল্লাহর, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না। আর সদ্ব্যবহার কর মাতা-পিতার সাথে, নিকট আত্মীয়ের সাথে, এতীম, মিসকীন, নিকট ও দূর-প্রতিবেশি, পার্শ্ববর্তী সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের মালিকানাভুক্ত দাস-দাসীদের সাথে। নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন না তাদেরকে যারা দাম্ভিক, অহঙ্কারী।' (সুরা ৪ নিসা, আয়াত-৩৬)



পিতা-মাতার সেবা : জান্নাত লাভের পথ

সর্বশ্রেষ্ঠ আমল

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ

وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ

وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

'তোমরা ইবাদাত কর আল্লাহর, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না। আর সদ্ব্যবহার কর মাতা-পিতার সাথে, নিকট আত্মীয়ের সাথে, এতীম, মিসকীন, নিকট ও দূর-প্রতিবেশি, পার্শ্ববর্তী সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের মালিকানাভুক্ত দাস-দাসীদের সাথে। নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন না তাদেরকে যারা দাম্ভিক, অহঙ্কারী।' (সুরা ৪ নিসা, আয়াত-৩৬)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি নবীজি সা.কে জিজ্ঞাসা করলাম–

أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى مِيقَاتِهَا قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ

قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ পাকের দরবারে সবচেয়ে প্রিয় ও পছন্দনীয় আমল কোনটি? উত্তরে তিনি বললেন, সময় মত নামায আদায় করা আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয় ও পছন্দনীয় আমল। এরপর আবারো আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, নামাযের পর কোন আমল? উত্তরে নবীজি সা. বললেন, পিতা-মাতার সাথে উত্তম ব্যবহার করা। এরপর আমি আবারো জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল সা. পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণের

পর তৃতীয় স্তরে কোন আমলটি আল্লাহর নিকট প্রিয় ও উত্তম? নবীজি সা. উত্তর দিলেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।' (বুখারী শরীফ, হাদীস-২৫৭৪)

লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, উপরোক্ত হাদীসে উত্তম আমলের স্তর বর্ণনার ক্ষেত্রে নামাযের পর পিতা-মাতার সেবার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় স্তরে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের কথা বলা হয়েছে।

ভাল কাজের প্রতি আকর্ষণ

বর্ণিত হাদীসে দু'টি বিষয় লক্ষণীয়। এক. কিছু আমলের ফযীলতের কথা রয়েছে। দুই. সাহাবায়ে কেরামের ভাল কাজের প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণ বোধের চিত্র ফুটে উঠেছে। সুযোগ পেলেই তাঁরা নবীজীর দরবারে বিভিন্ন আমলের কথা জিজ্ঞেস করতেন। এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কেরাম নবীজির কাছ থেকে আল্লাহর প্রিয় আমলগুলোর কথা জিজ্ঞেস করে নিতেন এবং তা পালন করার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়তেন। কারণ, তারা সর্বদা পরকালের ফিকির করতেন। তাদের কামনা একটাই ছিল, কীভাবে বেশি বেশি নেক আমল করার মাধ্যমে আল্লাহ পাকের নৈকট্য অর্জন করা যায় এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়।

আমরা বড় বড় ফযীলতের কথা শুনি, বলি, কিন্তু আমলের প্রতি ততোঁ মনোযোগী হই না। অথচ সাহাবাগণ ফযীলতের আমলের বর্ণনা শোনা মাত্র তা পালন করতে ব্যাকুল হয়ে পড়তেন। সাধারণ কোন আমলকেও তারা ছুটতে দিতেন না।

আমি তো ঠকে গেছি

একদা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. কে হযরত আবু হুরায়রা রাযি. একটি হাদীস শুনালেন। তিনি বলেন, রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন–

مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ

'যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের জানাযায় শরীক থাকবে, সে এক কীরাত ('কীরাত' বিশেষ এক পরিমাণ মাপক যন্ত্রের নাম, যা দ্বারা পূর্বের যুগে সোনা-রূপা মাপা হত) পরিমাণ পূণ্য অর্জন করবে। আর যে ব্যক্তি জানাযার পর কবরস্থান পর্যন্ত লাশের পিছে পিছে যাবে এবং দাফনের কাজে অংশ গ্রহণ করবে সে দুই কীরাত পরিমাণ পুণ্য অর্জন করবে।' (বুখারী শরীফ, হাদীস-১২৪০)

উল্লেখ্য, দুনিয়ার কীরাত তো ছোট হয়ে থাকে, কিন্তু জান্নাতের কীরাতের ব্যাপারে হাদীস শরীফে এসেছে, তা উহুদ পাহাড়ের চেয়েও বেশি বড়। আবু

হুরায়রা রাযি.-এর কাছ থেকে এই হাদীস শুনে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. আফসোসের সুরে বললেন–

لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ

'ইতিপূর্বে হাদীসটি না শোনার কারণে অনেক পুণ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছি।'

(বুখারী শরীফ, হাদীস-১২৩৯)

তার কথার উদ্দেশ্য ছিল, জানাযার নামায পড়া, তার সাথে কবরস্থানে যাওয়া এবং দাফনকর্মে শরীক হওয়া সম্পর্কে আগে জানলে তা পালন করে অনেক সাওয়াব অর্জন করতে পারতাম। না জানার দরুণ আমি ঠকে গেছি। বহু কীরাত পরিমাণ পুণ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছি।

লক্ষণীয় বিষয় হল, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. রাসূল সা.-এর একজন বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। সুন্নাত অনুযায়ী জীবন পরিচালনাসহ বিবিধ পুণ্য কর্মই ছিল যার ব্যস্ততা। যার আমলনামা ছিল উপচে পড়া পুণ্য কর্মে ভরপুর। তথাপি নতুন একটি আমলের কথা জেনে তার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়লেন এবং কিছু দিন তার উপর আমল করতে না পেরে আফসোস করতে থাকলেন। ভাল ও পুণ্য কাজের প্রতি তার এই ছিল আকর্ষণ, আগ্রহ ও অনুভূতি। সকল সাহাবী পুণ্য কর্মের প্রতি এরূপ আকর্ষণ রাখতেন। সাধারণ কোন সাওয়াব ও পুণ্যের কাজ তাঁরা ছেড়ে দিতেন না। আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের জন্য তাঁরা ব্যাকুল থাকতেন।

একই প্রশ্নের অনেক উত্তর

পুণ্যকর্মের প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণের কারণে সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সা.কে বার বার জিজ্ঞেস করতেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সর্বোত্তম আমল কোনটি? প্রশ্নের উত্তরে রাসূল সা.-এর উত্তরের ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন, বর্ণিত হাদীসে রাসূল সা. 'সর্বোত্তম আমল কোনটি' এ প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন–

الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا

'সময় অনুপাতে নামায আদায় করা সর্বোত্তম আমল'।

(বুখারী শরীফ, হাদীস-৬৯৮০)

অন্য হাদীসে অনুরূপ প্রশ্নের উত্তরে রাসূল সা. ইরশাদ করেন, 'আল্লাহর যিকির করা সর্বোত্তম আমল'। আরেক হাদীসে অনুরূপ জিজ্ঞাসার জবাবে রাসূল সা. বলেন, 'পিতা-মাতার সাথে ভাল আচরণ এবং তাঁদের আনুগত্য করা সর্বোত্তম আমল'। অন্য আরেকটি হাদীসে একই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'আল্লাহর পথে জিহাদ করা সর্বোত্তম আমল'।

মোটকথা একই প্রশ্নের উত্তরে রাসূল সা. একেক সাহাবীকে একেক আমলের বর্ণনা দিয়েছেন। বাহ্যিক দৃষ্টিতে উত্তরগুলো পরস্পর বিরোধী হলেও বাস্তবে তাতে কোন বিরোধ নেই।

মানুষের ভিন্নতায় আমলের ভিন্নতা

উপরোক্ত বর্ণনার একটি সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে, তাহল– 'উত্তম আমল কোনটি' ব্যক্তি বিশেষে তার ভিন্নতা রয়েছে। প্রতিটি মানুষের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তার জন্য 'উত্তম আমল' নির্দিষ্ট হয়। কারো জন্য 'নামায পড়া' সর্বোত্তম আমল, কারো জন্য 'পিতা-মাতার খেদমত করা' সর্বোত্তম আমল, কারো ক্ষেত্রে 'আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা' সর্বোত্তম আমল, আবার কারো ক্ষেত্রে 'সর্বাবস্থায় যিকির করা' অতি উত্তম আমল।

রাসূল সা. যে সাহাবীর নামাযের পাবন্দীর ব্যাপারে জানতেন, তাকে পিতা-মাতার সেবার ব্যাপারে বেশি গুরুত্বারোপ করে বলতেন– সর্বোত্তম আমল হল 'পিতা-মাতার সেবা করা'। তেমনি যেসব সাহাবী যাবতীয় ইবাদতের প্রতি গুরুত্ব দিতেন, জিহাদের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে রাসূল সা. তাঁদেরকে বলতেন, সর্বোত্তম আমল হল 'আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।'

কিছু সাহাবীর ক্ষেত্রে রাসূল সা. লক্ষ্য করলেন, তাঁদের ইবাদত, জিহাদ ইত্যাদিতে কোন ত্রুটি নেই, তবে আল্লাহর যিকিরের ব্যাপারে তারা অনেকটা উদাসীন, তাঁদেরকে রাসূল সা. সর্বোত্তম আমল সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দিয়ে বলতেন, সর্বোত্তম আমল হল 'আল্লাহ পাকের যিকির করা।'

এ দ্বারা স্পষ্টই বোঝা যায়, ব্যক্তির ভিন্নতায় সর্বোত্তম আমলেরও ভিন্নতা হয়ে থাকে।

নামাযের শ্রেষ্ঠত্ব

উপরোক্ত হাদীসে সর্বোত্তম আমলের পর্যায় বর্ণনা করতে গিয়ে সর্বপ্রথম নামাযের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নামায সময় মত হওয়া আবশ্যক। আমরা যারা নামায পড়ি, কিছু কিছু নামায সময় মত আদায় করার ক্ষেত্রে অবহেলা প্রদর্শন করি, যা মোটেও উচিত নয়। সময় মত নামায আদায়ে আমাদের গুরুত্বশীল হওয়া আবশ্যক।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ – الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

'ঐ সকল নামাযীর জন্য দূর্ভোগ, যারা নিজদের নামাযে অমনোযোগী ।'

(সূরা ১০৭ মাউন, আয়াত-৪-৫)

নামাযের সময় এসে গেছে অথচ অন্য কাজে ব্যস্ত, নামাযের জন্য তেমন ব্যাকুলতা নেই। এমনকি শেষ পর্যন্ত কাযা হয়ে যায়।

এ বিষয়ে রাসূল সা.-এর পক্ষ থেকে ইরশাদ হচ্ছে–

الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ

'যে ব্যক্তি সময় মত আছর নামায আদায় করতে পারল না, তার উদাহরণ এমন, যেন তার বাড়ী-ঘর লুট হয়ে গেল, যখন গৃহকর্তা ঘুমিয়ে ছিল।'

(বুখারী শরীফ, হাদীস-৫১৯)

অর্থাৎ এই ব্যক্তি যেমন অসহায়, তেমনি নামায না পড়ে কাযা করলেও সে কেয়ামত দিবসে অসহায় হয়ে পড়বে। এজন্য সময় মত নামায আদায়ে সচেতন হওয়া আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরী।

জিহাদের শ্রেষ্ঠত্ব

উল্লেখিত হাদীসে সর্বোত্তম আমলের ধারাবাহিকতা বর্ণনা করতে গিয়ে 'পিতা-মাতার সেবা'র আলোচনার পর জিহাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। জিহাদের ফযীলত সম্পর্কে হাদীস শরীফে এসেছে, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে করতে শহীদ হয়ে যায়, সে সদ্য ভূমিষ্ট নবজাতকের ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে যায়'।

হাদীস শরীফে আরো এসেছে, মানুষ যখন মারা যায় এবং জান্নাতের সুখ শান্তি দেখতে পায়, তখন সে কিছুতেই দুনিয়াতে ফিরে আসতে চায় না। কেননা দুনিয়ার অবস্থান তখন তার সামনে স্পষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ঐ ব্যক্তি, যে জিহাদের ময়দানে জিহাদ করতে করতে শহীদ হয়ে যায়, সে জান্নাতে যাওয়ার পর আবারও দুনিয়ার বুকে ফিরে আসতে চায় এবং আবারও জিহাদ করতে করতে শহীদ হয়ে পুনরায় শহীদের মর্যাদা লাভে আগ্রহী হয়।

এজন্যই রাসূলুল্লাহ সা. বলেন–

وَلَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ

'আমার প্রবল আকাঙ্খা হল, আমি যেন জিহাদ করতে করতে শহীদ হয়ে যাই এরপর আমাকে আবারো জীবন দান করা হোক এরপর আমি আবারো জিহাদ করতে করতে শহীদ হয়ে যাই এর পর আমাকে আবারো জীবন দান করা হোক, জীবিত হয়ে আবারো জিহাদ করতে করতে শহীদ হয়ে যাই।'

(বুখারী শরীফ, হাদীস-৩৫)

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন কথার মাধ্যমে জিহাদের বিরাট ফযীলত স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পিতা-মাতার হক

উল্লেখিত হাদীস শরীফে জিহাদের বিরাট ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার এবং তাঁদের সেবা করাকে তার চেয়েও ফযীলতপুর্ণ বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এজন্যই বুযুর্গানে দ্বীন বলেছেন, বান্দার হকসমূহের মধ্যে 'পিতা-মাতার সেবা করা' সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপুর্ণ। তাদের সেবার মধ্যে যে সম্মান ও ফযীলত রয়েছে, তা অন্য কিছুতে নেই। কেননা আল্লাহ তাআলা পিতা-মাতাকে পৃথিবীতে মানব বিস্তারের মাধ্যম বানিয়েছেন। মানবজাতির অস্তিত্বের সাথে সম্পর্ক হওয়ার কারণে তাঁদের সম্মানও বেশি। আর আল্লাহ তাআলা পিতা-মাতার সেবাকারীর জন্য উত্তম পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন।

হাদীস শরীফে এসেছে–

ما من ولد بار ينظر إلى والديه نظرة رحمة

إلا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة

'যে ব্যক্তি পিতা-মাতার প্রতি মুহাব্বতের দৃষ্টিতে একবার তাকায়, আল্লাহ তাআলা তার আমল নামায় একটি হজ্জ এবং একটি ওমরাহ এর সাওয়াব লিখে দেন।' (মেশকাত শরীফ, হাদীস-৪৯৪৪)

নিঃস্বার্থ ভালবাসা

লক্ষ্য করুন! পৃথিবীতে মানুষের মাঝে একের প্রতি অন্যের যে ভালবাসা থাকে, তাতে কোন না কোন স্বার্থ জড়িত থাকে। নিঃস্বার্থ ভালবাসার অস্তিত্ব বিরল। তবে হ্যাঁ, সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার স্নেহ ও ভালবাসা নিঃস্বার্থ হয়ে থাকে। তাদের স্নেহ ও ভালবাসায় কোন স্বার্থ জড়িত থাকে না। এছাড়া অন্য কোন ভালবাসা নিঃস্বার্থ নয়।

স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসার মধ্যে স্বার্থ থাকে। ভাইদের পরস্পরের সুসম্পর্কের মাঝেও স্বার্থ থাকে। বন্ধুর প্রতি বন্ধুর **ভাল**বাসাও স্বার্থমুক্ত নয়। মোটকথা, সম্পর্ক ও ভালবাসা যত গভীরই হোক না কেন তা অবশ্যই স্বার্থমুক্ত নয়। একমাত্র সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার ভালবাসাই স্বার্থমুক্ত। তারা নিজ সন্তানের উপকার করে। জীবন বাজী রেখে হলেও সকল বিপদ থেকে রক্ষা করে।

তাই আল্লাহ তাআলা জিহাদের চেয়েও পিতা-মাতার হক আদায়ের প্রতি বেশি গুরুত্বারোপ করেছেন।

পিতা-মাতার সেবা

পবিত্র হাদীস শরীফে এসেছে, জনৈক সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মন চায় যে, আমি আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করব। যেন আল্লাহ তাআলা আমার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান এবং আমাকে পুরস্কৃত করেন। শুধু এই উদ্দেশ্যেই আমি আল্লাহর পথে জিহাদ করতে চাই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'সত্যিই কি তুমি সাওয়াব পাওয়ার জন্যই তা করতে চাও?' সাহাবীর সহজ সরল উত্তর, 'হ্যাঁ'। নবীজি সা. বললেন, 'তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত আছেন?' লোকটি বলল– 'হ্যাঁ'। নবীজি সা. বললেন, 'যাও পিতা-মাতার সেবা কর। যদি তুমি সাওয়াব পেতে চাও, তাহলে আল্লাহর পথে জিহাদ করার চেয়ে পিতা-মাতার সেবা করেই বেশি সাওয়াব পাবে। তার মধ্যেই তুমি জিহাদ খুঁজে পাবে'। বিভিন্ন হাদীসে পিতা-মাতার সেবা করাকে জিহাদের চেয়ে বেশি সাওয়াবের কাজ বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

আত্মতৃপ্তি অর্জনের নাম দ্বীন নয়

ডাক্তার আব্দুল হাই রহ. বলতেন, আত্মতৃপ্তি অর্জনের নাম দ্বীন নয়। বরং আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের কাছে নিজের অস্তিত্ব বিলীন করে দেয়ার নামই হল দ্বীন। প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাতলান পথে চলার নামই দ্বীন। মনচাহী জীবন যাপনের নাম দ্বীন নয়। ভাল কোন কাজও নফসের চাহিদা মত করা যাবে না। সময়ের চাহিদা ও দ্বীনি প্রয়োজনকে সামনে রেখে সব কাজ করতে হবে।

জিহাদে যেতে ইচ্ছে করছে, তাবলীগে যেতে মন চাইছে, অথবা প্রথম কাতারে নামায পড়ার প্রচণ্ড আগ্রহ হচ্ছে, ওদিকে বাড়ীতে পিতা-মাতা অসুস্থ, তাদের সেবা করার কেউ নেই। এমতাবস্থায় পিতা-মাতার সেবাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ঘরে বসে যতটুকু সম্ভব অন্যান্য ইবাদত করতে হবে।

এটা দ্বীন নয়

হযরত মাওলানা মসীহুল্লাহ খান রহ. একটি উদাহরণ দিয়ে বলতেন– 'স্বামী তার স্ত্রীকে নিয়ে কোন জঙ্গলে অবস্থান করছে। আশে পাশে নিরাপত্তার কোন চিহ্ন নেই। নামাযের সময় হলে স্বামী স্ত্রীকে বলল, 'তুমি থাক, আমি মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে প্রথম কাতারে নামায পড়ে আসছি'। স্ত্রী বলল,

'আমাকে এ অবস্থায় রেখে যেয়ো না, আমি ভয় পাব'। স্বামী বলল, 'আমি প্রথম কাতারে নামায আদায়ের ফযীলত পেতে চাই, তোমার যা হয় হোক।'

এমতাবস্থায় স্ত্রীকে ফেলে রেখে জামাতে নামায পড়তে গেলে সে গুনাহগার হবে। কারণ, শরীয়তের দৃষ্টিতে স্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্ব স্বামীর উপর। স্ত্রীকে নিরাপত্তাহীনতায় রেখে জামাতে নামায পড়তে গেলে শরীয়তের চাহিদার বিপরীত হবে। মনমত চলা হবে। যা দ্বীন নয়। এমতাবস্থায় তাকে ঘরে একাকী নামায আদায় করতে হবে।

তেমনিভাবে যদি কেউ বাড়ীতে অসুস্থ পিতা-মাতা অথবা স্ত্রী-সন্তান ফেলে রেখে তাদের সেবা যত্ন না করে জিহাদে, তাবলীগে অথবা অন্য কোন ইবাদত করতে বাইরে যায়, এটাও দ্বীনের পরিপন্থী কাজ হবে, যা তার জন্য উচিত নয়।

বর্ণিত হাদীস শরীফে জনৈক সাহাবী জিহাদে যেতে উদগ্রীব ছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সা. তাকে অসুস্থ পিতা-মাতার সেবা করতে বললেন। কারণ, সময় ও চাহিদার প্রেক্ষিতে তার জন্য পিতা-মাতার সেবা করাই বেশি প্রয়োজন।

ওয়ায়েছ কুরুনী রহ. নবীজির সাক্ষাত পেলেন না

দুনিয়ার বুকে একজন মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় নেয়ামত হল– 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্শন লাভ।'

হযরত ওয়ায়েছ কুরুনী রহ. এ নেয়ামত লাভের জন্য নবীজির কাছে অনুমতি চেয়ে লোক পাঠালেন। কিন্তু তার পিতা-মাতার খেদমত করা জরুরী জেনে রাসূলুল্লাহ সা. তাকে সংবাদ পাঠালেন যে, আমার সাক্ষাত লাভের চেয়ে তোমার পিতা-মাতার সেবা করাই বেশি উত্তম। তুমি তাঁদের সেবা করতে থাক।

শেষ পর্যন্ত রাসূল সা. পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন। ওয়ায়েছ কুরুনী রহ. নবীজির সাক্ষাত পেলেন না। সাহাবীগণের তালিকায় নিজের নাম লেখাতে পারলেন না। কারণ, 'সাহাবী' হতে হলে নবীজির সংস্পর্শ জরুরী। যে যত বড় ওলী ও বুযুর্গ হোক না কেন সাহাবাগণের মর্যাদার আশে পাশেও যেতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ সা. ওয়ায়েছ কুরুনীকে সেই মর্যাদা অর্জনের পরিবর্তে পিতা-মাতার সেবা করার নির্দেশ দিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সা.-এর কথা মেনে নিয়ে সফর বাতিল করে পিতা-মাতার সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন।

আর যদি তার স্থানে আমার আপনার মত কোন অজ্ঞ লোক হত, তাহলে নবীজির নির্দেশকে তোয়াক্কা না করে অসুস্থ পিতা-মাতাকে ঘরে ফেলে রেখে

সাক্ষাতের জন্য বেড়িয়ে পড়তাম। কিন্তু এদ্বারা প্রকৃত সফলতা অর্জন হবে না। প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে আল্লাহ ও তার রাসূলের নির্দেশনা মেনে চলার মাঝেই রয়েছে প্রকৃত সফলতা।

মায়ের সেবার বদলা

রাসূলুল্লাহ সা.-এর আদেশ মেনে ওয়ায়েছ কুরুনী রহ. মায়ের সেবায় নিয়োজিত থাকলেন এবং 'সাহাবী' হওয়ার মর্যাদা লাভ থেকে বঞ্চিত থাকলেন। কিন্তু এর বিনিময়ে তিনি একটি বিরল পুরস্কারে ভূষিত হলেন। মৃত্যুর পূর্বে নবীজি সা. হযরত ওমর ফারুক রাযি. কে বিশেষ কিছু গুণাবলী ও নিদর্শন বর্ণনা করে বললেন, হে ওমর! 'ইয়ামান' শহরের 'কুরুন' নামক এলাকা থেকে একজন লোক মদীনায় আগমন করবে। তার নিকট থেকে দুআ নিতে ভুলবে না। কারণ, তার দুআ বিফলে যায় না।

ইতিহাসে পাওয়া যায়, যখনই কোন কাফেলা ইয়ামান থেকে আসত, হযরত ওমর রাযি. দ্রুত সেখানে পৌঁছতেন এবং সেই নাম ও গুণাবলীর লোককে খোঁজ করতেন।

এক সময় অপেক্ষার পালা শেষ হল। হযরত ওমর রাযি. শুনলেন, ইয়ামানের একটি কাফেলায় ওয়ায়েছ কুরুনী নামক জনৈক ব্যক্তির আগমন ঘটেছে। তিনি খুব দ্রুত সেখানে পৌঁছলেন এবং ওয়ায়েছ কুরুনী রহ.কে পেয়ে তার হাত ধরে বললেন, আপনি আমার জন্য দুআ করুন।

অবাক হয়ে ওয়ায়েছ কুরুনী রহ. বললেন, আপনি আমার কাছে কেন দুআ নিতে এসেছেন? হযরত ওমর রাযি. বললেন, নবীজি সা. আমাকে অছিয়ত করে বলে গেছেন, আমি যেন আপনার কাছে দুআ চাই। আল্লাহ পাক আপনার দুআ কবুল করবেন বলে নবীজি বলেছেন। একথা শুনে ওয়ায়েছ কুরুনী রহ. খুশীতে আত্মহারা হয়ে বললেন, আমার ব্যাপারে নবীজি সা. এমনটি বলেছেন! এ বলে তিনি খুশীতে কাঁদতে লাগলেন।

লক্ষণীয় বিষয় হল, রাসূল সা. হযরত ওমর রাযি.-এর মত বিশিষ্ট সাহাবীকে ওয়ায়েছ কুরুনীর দরবারে দুআ নিতে বলেছেন। মায়ের সেবা ও নবীজির আদেশ পালনের জন্য তিনি এত বড় ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। যার বদৌলতে তার এ মর্যাদা অর্জিত হয়েছিল। (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং-২৫৪২)

ত্যাগের বিরল দৃষ্টান্ত

হযরত সাহাবায়ে কেরামগণ রাসূলুল্লাহ সা.-এর জন্য ত্যাগের বিরল ইতিহাস গড়ে গেছেন। তাঁরা কখনো নবীজি সা.কে চোখের আড়াল করতে

চাইতেন না। সময় পেলেই নবীজির সামনে বসার চেষ্টা করতেন। যুদ্ধের মাঠেও তাঁরা নবীজির দিকে কখনো পিঠ দিতেন না।

উহুদ যুদ্ধে আবু দুজানা রাযি. কে হুজুর পাক সা. তরবারী তুলে দিলেন। তিনি যুদ্ধ করছেন। হঠাৎ লক্ষ্য করলেন, প্রিয় নবীর দিকে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুটে আসছে। তৎক্ষনাত এক লাফে নবী আ.-এর সামনে উপস্থিত হলেন এবং নবীজিকে আড়াল করে নিলেন। অসংখ্য তীর আবু দুজানার পিঠকে আঘাত করে দগদগে ক্ষতে পরিণত করে দিল। তিনি একটুও নড়লেন না। হুজুর সা.-এর জন্য সব ব্যথা হাসিমুখে মেনে নিলেন।

লক্ষণীয় বিষয় হল, আবু দুজানার বুকে তীর লাগেনি, লেগেছিল তার পিঠে। বোঝা যায়, তিনি চেহারাকে নবীজির দিকে রেখেছিলেন, যেন রাসূল সা.-এর দিকে পিঠ না দিতে হয়। এমন ত্যাগী ও বীর সাহাবীগণ প্রিয় নবীর সঙ্গ লাভে ব্যাকুল ছিলেন। কখনো তাঁরা রাসূলের সাহচার্য ত্যাগের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু দ্বীনের খাতিরে নবীজি সা. তাদেরকে ইরাক, সিরিয়া, তুরস্ক ইত্যাদি দূরদেশে যাওয়ার আদেশ দিলে, নির্দ্বিধায় তারা সে আদেশ পালনে প্রস্তুত হয়ে যেতেন। নবীজিকে ছেড়ে যেতে তাদের খুব কষ্ট হত। কিন্তু তাঁরা নবীজির প্রতিটি আদেশ, প্রতিটি ইশারার জন্য জান কোরবান করতে সদাই প্রস্তুত থাকতেন। কারণ, এতেই প্রকৃত সফলতা।

পিতা-মাতার সেবার গুরুত্ব

পিতা-মাতার সেবা করা সকল প্রকারের ইবাদত থেকে বেশি গুরুত্বপুর্ণ। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে অসংখ্য আয়াত ও হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا

'এবং আমি মানব সন্তানকে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের উপদেশ দিয়েছি।' (সূরা ২৯ আনকাবুত-৮)

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে–

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

'তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত কর, তার সাথে কাউকে শরীক করিও না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর।' (সূরা ৪ নিসা, আয়াত-৩৬)

লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, আল্লাহ তাআলা তাঁর একত্ববাদ ও ইবাদতের আলোচনার সাথেই পিতা-মাতার সেবার আলোচনা করেছেন। এর দ্বারা একত্ববাদ ও ইবাদতের পরই পিতা-মাতার সেবার গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে যায়।

পিতা-মাতা যখন বৃদ্ধ হয়

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন–

إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ

'তোমাদের জীবদ্দশায় যদি পিতা-মাতা বৃদ্ধ হয়ে যায়, তাহলে তাদেরকে (বিরক্তি বোধক) উফ শব্দটি পর্যন্ত বলিও না।' (সূরা ১৭ ইসরা, আয়াত-২৩)

আল্লাহ তাআলা বৃদ্ধ বয়সের কথা উল্লেখ করেছেন। কারণ, বয়স বেশি হলে বিবেক-বুদ্ধি দূর্বল হয়ে যায়। তখন তাদের কথা বার্তা চাল-চলন ইত্যাদি বিরক্তিকর হতে পারে। তবুও আল্লাহ তাআলার আদেশ– 'তোমরা ন্যূনতম বেয়াদবীও করিও না। তাঁদেরকে যথাযথ সম্মান করতে থাক।'

আরো ইরশাদ হচ্ছে–

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

'তোমরা তাদের সামনে নতশিরে অবস্থান কর এবং তাদের জন্য দুআ করতে থাক, ইয়া আল্লাহ! তাদেরকে রহম কর, তারা যেমন বাল্যকালে আমাকে মায়া করেছে।' (সূরা ১৭ ইসরা, আয়াত-২৪)

শিক্ষণীয় ঘটনা

কোন একটি পুস্তকে একটি ঘটনা পড়েছিলাম। ঘটনাটি সত্য না মিথ্যা তা যাচাই করিনি, তবে ঘটনাটি শিক্ষণীয়।

'জনৈক বৃদ্ধ ও তার ছেলে বাড়ীর আঙিনায় বসে ছিল। এমন সময় একটি পাখি এসে বাড়ীর দেয়ালে বসল। বৃদ্ধ পিতা তার ছেলেকে বলল, বেটা! দেয়ালে কি যেন একটা দেখা যাচ্ছে? ছেলে উত্তর দিল, আব্বু! ওটা কাক। কিছুক্ষণ পর বৃদ্ধ আবার জিজ্ঞেস করল, বেটা কি যেন বললে? ছেলে উত্তর দিল, ওটা কাক। এর পর আরো দু'বার একই প্রশ্ন করলে ছেলে একই উত্তর দিল। পঞ্চম বার যখন বৃদ্ধ পিতা জিজ্ঞেস করল, বেটা ওটার কথা কি যেন বললে? পাঁচ বার একই প্রশ্ন করায় ছেলে রাগত স্বরে বলল, এক কথা কতবার বলতে হয়? 'ওটা কাক' একথা তো বললামই।

বৃদ্ধ পিতা ছেলের অগ্নিমূর্তি দেখে কিছুক্ষণ চুপ-চাপ বসে থাকলেন। এরপর উঠে ঘরে গেলেন এবং পুরাতন একটি ডায়েরী বের করে আনলেন।

একটি পৃষ্ঠা বের করে ছেলেকে লক্ষ্য করে বললেন, বেটা এটা পড়ে দেখ। চমকিত নয়নে পুত্র ডায়েরীর পাতাটি পড়তে আরম্ভ করল। তাতে লেখা ছিল– 'আজ আমার ছোট ছেলে আঙিনায় বসে ছিল। আমিও তার পাশে বসা ছিলাম।

ইতিমধ্যে একটি কাক এল। ছোট ছেলে পর পর পঁচিশ বার আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'আব্বা ওটা যেন কি? আমি ধৈর্য সহকারে পঁচিশ বারই তার উত্তর দিলাম। আর তার প্রশ্নের উত্তর দিতে আমার খুব ভাল লাগছিল।'

পড়া শেষ হল। এবার পিতা স্বীয় পুত্রকে লক্ষ্য করে বলল, বাপ বেটার পার্থক্য দেখেছ! তুমি আমাকে পঁচিশ বার জিজ্ঞেস করেছিলে। আমি মায়া নিয়ে প্রতিবারই তোমার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলাম। আর আজ তুমি মাত্র পাঁচ বারেই বিরক্তি বোধ করলে। ছেলে লজ্জিত হল।

পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার

লক্ষণীয় বিষয় হল, মানুষ বয়সের ভারে দূর্বল হয়ে পড়লে তাদের কথা-বার্তা, আচার-আচরণ কিছুটা বিরক্তিকর হতে পারে।

পিতা-মাতার এমন আচরণের সময় স্বরণ করতে হবে যে, বাল্যকালে আমিও পিতা-মাতার সাথে বিরক্তিকর আচরণ করেছি। তাঁরা হাসিমুখে তা সহ্য করেছেন। আমাকেও তাঁদের বৃদ্ধ বয়সের বিরক্তিকর কিছু আচরণ সহ্য করতে হবে।

অমুসলিম পিতা-মাতার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

'তোমাদের পিতা-মাতা যদি মুশরিক হয়, তাহলে সে তাদের শিরকের ব্যাপারে তো তাদের অনুগামী হবে না, তবে তাদের জীবন যাত্রায় তাদের সাথে ভাল ব্যবহার আবশ্যকীয়।' (সূরা ৩১ লোকমান, আয়াত-১৫)

কারণ, তারা অমুসলিম হলেও সর্বোপরি কথা হল তাঁরা 'পিতা-মাতা'। অথচ বর্তমান সমাজে পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ কমে গেছে। 'তারাও মানুষ আমরাও মানুষ' একথা বলে তাদের হক-প্রাপ্য আদায় করা হচ্ছে না। মূলকথা হল, আমাদের মাঝে দ্বীন নেই। দ্বীন থাকলে এমন পরিবেশ সৃষ্টি হত না।

নামায যেমন ফরয

পিতা-মাতার আনুগত্য করা আবশ্যকীয়। তাদের আদেশ পালন করা নামাযের মতই ফরয। নামায ছেড়ে দিলে যেমনটি গুনাহ হয়, পিতা-মাতার বৈধ আদেশ না মানলেও তেমনটি গুনাহ হয়। তবে পিতা-মাতা শরীয়ত

বিরোধী কোন আদেশ দিলে তা মানা যাবে না। আদবের সাথে তা প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

বুযুর্গানে দ্বীন বলেন, পিতা-মাতার অবাধ্যতার শাস্তি আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতেই দিয়ে দেন। 'মৃত্যুর সময় কালেমা নসীব না হওয়া' পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়ার অন্যতম কারণ।

শিক্ষণীয় ঘটনা

জনৈক ব্যক্তি মৃত্যু শয্যায় শায়িত। সকলেই তাকে কালেমা পড়ানোর চেষ্টা করে বার বার ব্যর্থ হল। কোন উপায় না দেখে একজন আল্লাহওয়ালা ব্যক্তিকে আনা হল।

লোকজন বুযুর্গের কাছে জানতে চাইল, এমনটি কেন হচ্ছে? কেন সে কালেমা পড়তে পারছে না? কীভাবে তার মুখ দিয়ে কালেমা উচ্চারণ করানো যেতে পারে?

বুযুর্গ বললেন, পিতা-মাতার অবাধ্যতার শাস্তি স্বরূপ কখনো এমনটি হয়ে থাকে। খোঁজ নিয়ে দেখ, তার পিতা-মাতা কেউ জীবিত আছে কি না। তাদের কারো সাথে অবাধ্যাচরণ করে থাকলে মাফ চেয়ে নিতে হবে। তবেই মুখ দ্বারা কালেমা উচ্চারিত হবে।

লক্ষণীয় বিষয় হল, পিতা-মাতার অবাধ্যতা এবং তাদেরকে কষ্ট দেয়া কত ভয়ঙ্কর পাপ। মৃত্যুর সংকটময় মুহূর্তে মুখ থেকে কালেমা বের হচ্ছে না। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সা. সাহাবাগণকে এ বিষয়ে খুবই গুরুত্বারোপ করতেন।

আলেম হতে অনুমতির প্রয়োজন

দারুল উলুম, করাচি, পাকিস্তান, মাদরাসায় ছাত্ররা ভর্তি হতে আসলে জিজ্ঞেস করা হয়, তারা পিতা-মাতার অনুমতি নিয়ে এসেছে কি না? অনেকে বলে, পিতা-মাতা আমাকে আলেম বানাতে চায় না। তাদেরকে বলা হয়, দ্বীনের মৌলিক বিষয়াদি, যেমন– নামায-কালাম ইত্যাদি শিক্ষা থেকে পিতা-মাতা বাধা দিলে, তা গ্রহণযোগ্য নয়।

তবে তারা ছেলেকে মাওলানা হওয়ার অনুমতি না দিলে, ছেলের জন্য উচিত, পিতা-মাতার কথা মেনে চলা। কারণ, মাওলানা হওয়া কারো উপর ফরয নয়, কিন্তু পিতা-মাতার আদেশ মেনে চলা ফরয। এর পরও কেউ যদি অনুমতি ছাড়াই আলেম হয়, তাহলে শরীয়তের আদেশ অমান্য করে মনের চাহিদা মেটানো হবে, যদিও তা ভাল কাজ হোক না কেন।

জান্নাত লাভের সহজ পথ

পিতা-মাতাকে জীবদ্দশায় পাওয়া আল্লাহ পাকের মহান নেয়ামত। যে ব্যক্তি স্বীয় পিতা-মাতাকে কাছে পেল, তার জন্য সৌভাগ্যবান হওয়া খুবই সহজ।

হাদীস শরীফে ইরশাদ হচ্ছে, 'যে ব্যক্তি ভালবাসা ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে পিতা-মাতার দিকে একবার দেখবে, সে একটি কবুল হজ্জ এবং ওমরাহ এর সাওয়াব পাবে।'

অন্য হাদীসে এসেছে, 'ঐ ব্যক্তি অভিশপ্ত, যে তার বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে জীবিত পেয়েও তাঁদের সেবা-যত্নের মাধ্যমে জান্নাত লাভ করতে পারল না।'

কেননা বৃদ্ধ পিতা-মাতার সেবা করে জান্নাত লাভ করা বড়ই সহজ। তাঁদের সেবা করলে তারা অন্তর থেকে দুআ করবে। ব্যস, এতেই সফলতা পদচুম্বন করবে। সময় থাকতেই করে নিতে হবে, পরে আফসোস করে কোন লাভ হবে না।

প্রতিকারের পদ্ধতি

অনেকেই পিতা-মাতার জীবদ্দশায় তাদের সেবা-যত্ন করতে না পেরে আফসোস করে থাকে। ইসলাম তাদের এ আফসোস দুর করার দু'টি পথ খোলা রেখেছে। এ দু'টি পথ অবলম্বন করলে কিছুটা হলেও মৃত পিতা-মাতার হক আদায় করতে পারবে।

প্রথম পথ হল, মৃত মা-বাবার জন্য বেশি বেশি দান, সাদকা, কুরআন তেলাওয়াত ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের জন্য সাওয়াব প্রেরণ করা। দ্বিতীয় পথ হল, পিতা-মাতার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার করা। এ দু'টি পথ অবলম্বনের মাধ্যমে মৃত পিতা-মাতার হক কিছুটা হলেও আদায় করা সম্ভব হতে পারে।

মায়ের তিন বাপের এক

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সা.-এর দরবারে এসে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ–

مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي

'পৃথিবীর সকল মানুষের মধ্যে কে আমার নিকট থেকে ভাল ও সদাচরণ পাবার বেশি যোগ্য? কার সাথে আমি সবচেয়ে ভাল আচরণ করব?'

রাসূলুল্লাহ সা. তার উত্তরে বললেন–

أُمُّكَ

‘পৃথিবীর সকল মানুষের মধ্যে তোমার মা-ই তোমার ভাল আচরণ পাওয়ার বেশি যোগ্য।’

লোকটি আবার প্রশ্ন করল, তার পর কে? নবীজি আবার সেই উত্তরই দিলেন, ‘তোমার মা’। তৃতীয় বার লোকটি অনুরূপ প্রশ্ন করলে নবীজি একই উত্তর দিয়ে বললেন, ‘তোমার মা’। চতুর্থবার লোকটি আবার অনুরূপ প্রশ্ন করলে, উত্তরে নবীজি বললেন–

ثُمَّ أَبُوكَ

‘তোমার বাবা’। (বুখারী শরীফ, হাদীস-৫৫১৪)

লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, নবীজি সা. তিন বারই মায়ের কথা বললেন। চতুর্থবারে বাবার কথা বললেন। উক্ত হাদীসের আলোকে ওলামায়ে কেরাম বলেন, মায়ের প্রাপ্য বাবার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি। যেখানে মায়ের তিন, সেখানে বাবার এক অংশ। কারণ সন্তান ধারণ এবং প্রতিপালনে মায়ের যে কষ্ট ও ত্যাগ রয়েছে, তার চার ভাগের এক ভাগও বাবার নেই।

বাবার জন্য শ্রদ্ধা, মায়ের জন্য সেবা

বুযুর্গানে দ্বীন বলেন, হাদিয়া বা উপহার দেয়ার ক্ষেত্রে মাকে প্রাধান্য দাও। তারা আরো বলেন, সেবা এবং সম্মান দুটি বস্তু। সম্মানের ক্ষেত্রে বাবাকে, আর সেবার ক্ষেত্রে মাকে প্রাধান্য দাও।

বাবাকে সম্মান করার অর্থ হল, তার দিকে পা বিছিয়ে বসবে না। তার সামনে জোড়ে জোড়ে কথা বলবে না ইত্যাদি। আর সেবার ক্ষেত্রে মায়ের পাশে থাকবে। মায়ের বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করবে।

বুযুর্গানে দ্বীন আরো বলেন, মায়ের সাথে সন্তানেরা খোলা মেলা কথা বলবে। এমন গোপন কিছু বিষয় থাকে যা সরাসরি বাবাকে বলা যায় না, সেগুলো মাকে বলবে। যে পরিবারে মা ও সন্তানের মাঝে এমন খোলা মেলা সম্পর্ক থাকে, সে পরিবারের সন্তানেরা ঘরমুখো হয় এবং বিভিন্ন অপকর্ম থেকে বেঁচে থাকতে পারে।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন, হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা হল– বাপকে বেশি সম্মান করা এবং মায়ের বেশি সেবা করা। (ফাতহুল বারী)

মায়ের সেবার সুফল

‘মায়ের সেবা’ একজন মানুষকে অনেক উচ্চস্তরে পৌঁছিয়ে দিতে পারে এবং সম্মানী বানিয়ে দিতে পারে। এ ব্যাপারে হযরত ওয়ায়েছ কুরুনী রহ. সম্পর্কে ঘটনা আলোচনা করা হয়েছে।

হযরত ইমাম গাযালী রহ. সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি মায়ের সেবায় উল্লেখযোগ্য সময় ব্যয় করতেন। এরপর যখন পড়া লেখায় মগ্ন হতেন, মায়ের সেবার বরকতে তিনি অতুলনীয় বরকত পেতেন। যার ফলশ্রুতিতে তিনি ‘ইমাম গাযালী’ হতে পেরেছেন। আমরা আজও তাঁদের স্মরণ করছি। প্রসঙ্গত এখানে একটি হাদীস উল্লেখ করা হচ্ছে।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযি. থেকে বর্ণিত, একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সা.-এর দরবারে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ–

أبايعك على الجهاد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : هل لك والدان؟

قال : نعم، قال : إنطلق فجاهد فيهما لجاهد احسنا–

‘আমি আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের জন্য আপনার হাতে জিহাদ ও হিজরতের বাইআত নিতে চাই। নবীজি সা. বললেন, তোমার মা-বাবা কেউ জীবিত আছে কি? লোকটি বলল, হ্যাঁ, উভয়েই জীবিত আছেন। রাসূল সা. তাকে বললেন, তুমি কি সত্যিই আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে চাও? লোকটি বলল, ‘হ্যাঁ ইয়া রাসূলুল্লাহ’। নবীজি বললেন, যাও তোমার পিতা-মাতার সেবা কর, তাতেই তুমি আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারবে।

(মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৭০০)

নবীজি বললেন মা বাবার মুখে হাসি ফুটাও

মদীনা শরীফে যুদ্ধের কাফেলা প্রস্তুত হচ্ছে। একজন সাহাবী এসে রাসূল সা.-এর নিকট আবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জিহাদে যেতে চাই। জিহাদী স্পৃহা বুঝাতে গিয়ে সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! দেখুন, আমি জিহাদের জন্য কতটা উৎসাহী! আমার মা বাবা কাঁদছিল, তারা আমাকে জিহাদে যেতে দেবে না। সে বলল–

تَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ

‘আমি আমার পিতা-মাতাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় রেখে এসেছি’।

লোকটি ভেবেছিল, এতে নবীজি তার জিহাদী স্পৃহার উপর খুশী হবেন। কিন্তু রাসূল সা. বললেন–

فَارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا وَأَبَى أَنْ يُبَايِعَهُ

'তোমার জিহাদে শরীক হওয়ার অনুমতি নেই। যাও! তুমি তোমার পিতা-মাতার মুখে হাসি ফুটাও, যেমনটি তাদেরকে কাঁদিয়েছ। রাসূলুল্লাহ সা. তার বায়আত গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন।' (মুসনাদে আহমদ, হাদীস-৬৫৩৯)

এটাই হল প্রকৃত ইসলাম। শুধু একদিক লক্ষ্য করলে চলবে না। মুফতী শফী রহ. বলেন, বর্তমান কালের লোকেরা কেমন যেন এক পেশে হয়ে গেছে। কোন আমলের ফযীলত দেখলেই সে দিকে ঝুঁকে পড়ে। এই ঝুকে পড়ার দ্বারা অবশ্য করণীয় কোন আমল ছুটে যাচ্ছে কি না সে দিকে লক্ষ্য করে না। প্রকৃত ইসলাম এমনটি নয়।

ওলীদের সাহচার্য

মনচাহী জীবন-যাপন না করে শরীয়তের বাতলানো পথে তখনই চলা সম্ভব, যখন একজন মানুষ তার জীবনকে প্রকৃত আল্লাহওয়ালা কোন ব্যক্তির হাতে সোপর্দ করে দেবে। কারণ, মাসআলা-মাসায়েল কিতাবে লেখা আছে।

সাধারণ মানুষ পড়তে পারলেও কোনটা সময় সাপেক্ষে করণীয় আর কোনটা বর্জনীয়, তা বুঝতে সক্ষম হবে না। এজন্য কোন আল্লাহওয়ালার পরামর্শে নিজের জীবন পরিচালনা করতে হবে। কারণ, তারা ভাল-মন্দ বোঝেন, প্রেক্ষাপট বুঝে কোনটা কখন করণীয় আর কোনটা বর্জনীয়, তা তারা নির্ধারণ করতে পারেন।

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ.-এর দরবারে অনেক লোক বাইআত গ্রহণ করতে আসত। তিনি অনেককে তার বর্তমান চাকুরী ছেড়ে অন্য কোন চাকুরী করতে বলতেন। তারা তাই করত।

শরীয়ত, সুন্নাত, তরীকত

আশরাফ আলী থানবী রহ.-এর অন্যতম খলীফা হযরত ডাক্তার আবদুল হাই রহ. বলেন, শরীয়ত, সুন্নাত, তরীকত -এ তিনটির সমন্বয়ে আমল পরিপূর্ণতা লাভ করে।

শরীয়ত আল্লাহ পাকের হক এবং বান্দার হকের বর্ণনা দেয়। আর সুন্নাত সেই হক সমূহের নির্ধারিত সীমানা বা হক সমূহ পালন করার পদ্ধতি শিক্ষা দেয়।

আর নির্ধারিত সীমানার মধ্যে হক পালনের যথাযথ স্থান, কাল ও পাত্রের শিক্ষা পাওয়া যায় তরীকতের মধ্যে। কখন কোন আমল করণীয় আর কখন কোনটি বর্জনীয়, তার শিক্ষা আছে তরীকতের মধ্যে।

সাধারণ মানুষ শরীয়ত এবং সুন্নাত পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। তরীকত পযর্ন্ত পৌঁছতে পারে না। একমাত্র প্রকৃত ওলীগণই তরীকত চিনতে পারেন এবং বুঝতে পারেন। এজন্য পরিপূর্ণ ইসলামের আলোকে জীবন পরিচালনা করতে চাইলে প্রকৃত আল্লাহওয়ালার হাতে নিজের জীবনকে সোপর্দ করে দিতে হবে।

তাসাওউফের মূল উদ্দেশ্য হল– মানুষকে ইফরাত-তাফরিত থেকে বাঁচানো এবং মধ্যম পন্থায় উঠানো। সাথে সাথে তাদেরকে দিক নির্দেশনা দেয়া যে, শরীয়তের কখন কোন আদেশ ও কখন কোন নিষেধ।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। পিতা-মাতার খেদমতের মাধ্যমে জান্নাত লাভের পথকে সহজ করে দিন। আমীন ॥

যাকাত আদায়ের সঠিক পদ্ধতি

শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
অনুবাদ : মুহাম্মাদ আল-আমিন

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর– ২০০৬ ঈ.
দ্বিতীয় প্রকাশ : আগষ্ট– ২০০৭ ঈ.

সূচী

যাকাত না দেয়ার ধুমকি-৭৩
ক্রেতা কে পাঠাচ্ছে সম্পদ কোত্থেকে আসছে-৭৫
শিক্ষণীয় একটি ঘটনা-৭৫
সব কাজের বণ্টন আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়-৭৬
কে জমি থেকে উৎপাদন করছে-৭৭
মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করার যোগ্যতা নেই-৭৭
প্রকৃত মালিক আল্লাহ তাআলা-৭৭
শুধু শতকরা আড়াই টাকা দান কর + যাকাতের গুরুত্ব-৭৮
যাকাত হিসাব করে বের করবে-৭৯
যাকাত দেয়ায় পার্থিব উপকার-৭৯
সম্পদে বরকত না হওয়ার ফল-৮০
যাকাতের নেসাব-৮১
সব ধরনের মালের উপর বছর অতিবাহিত হওয়া জরুরী নয়-৮১
নির্দিষ্ট তারিখে যত টাকা থাকবে সব টাকার উপর যাকাত আসবে-৮১
যাকাতের মালসমূহ কী কী-৮২
যাকাতের মালের মধ্যে যুক্তি খাটানো যাবে না-৮২
ইবাদত করা আল্লাহর বিধান-৮৩
ব্যবসার আসবাব-পত্রের মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি-৮৩
কোন কোন সম্পদ ব্যবসাপণ্যের অন্তর্ভূক্ত-৮৪
কোন দিনের মূল্য ধর্তব্য হবে-৮৪
কোম্পানির শেয়ারের যাকাতের বিধান-৮৫
ফ্যাক্টরির কোন জিনিসের উপর যাকাত আসে-৮৬
আদায়যোগ্য ঋণের যাকাত এবং অনাদায়ী ঋণ বাদ দেয়া-৮৬
ঋণ দুই প্রকার + ব্যবসার ঋণ কখন বাদ দেবে-৮৭
প্রকৃত হকদারকে যাকাত দাও
কে প্রকৃত হকদার + যেসব আত্মীয়কে যাকাত দেয়া যাবে-৮৮
ব্যাংক থেকে যাকাত কর্তনের বিধান-৮৯
একাউন্টের টাকা থেকে ঋণ বাদ দেয়ার পদ্ধতি-৯০
কোম্পানির শেয়ারের যাকাত কর্তন-৯০
যাকাত দেয়ার তারিখ ও সময়-৯১
রমযান মাসের তারিখ নির্ধারণ করা যাবে কি-৯১

অনুবাদকের কথা

যাকাত ইসলামের অন্যতম মৌলিক বিধান। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে অসংখ্য জায়গায় এর গুরুত্ব, তাৎপর্য এবং তা আদায় করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা যাকাত আদায় করে না, তাদের সম্পর্কে ভয়াবহ শাস্তি ও করুণ পরিণতির কথাও আল্লাহ তাআলা বারবার উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে, এই গুরুত্বপূর্ণ বিধান থেকে আমরা অনেকেই বিমূখ। অনেকে আদায়ই করি না। আর যারা আদায় করি, তারাও অজ্ঞতা, অবহেলা ও অসচেতনাতার কারণে সঠিক পদ্ধতিতে আদায় করতে পারি না।

যুগশ্রেষ্ঠ আলেম ও গবেষক শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী 'যাকাত আদায়ের সঠিক পদ্ধতি' শীর্ষক আলোচনায় আমাদের এসব ত্রুটি ও বিচ্যুতিগুলো চিহ্নিত করে উত্তোরণের পথ বলে দিয়েছেন। আশা করি এ পুস্তিকা আমাদের অন্তরে যাকাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বুঝতে এবং সঠিক পদ্ধতিতে যাকাত দিতে উৎসাহিত করবে।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইসলামের অন্যতম এ বিধানটি যথাযথ গুরুত্বের সাথে আদায় করার তাওফীক দান করুন। আমীন ॥

মুহাম্মাদ আল-আমিন
শক্তিপুর, শাহ্জাদপুর, সিরাজগঞ্জ
০৯. ০৯. ০৬ ঈ.

'আর যারা সোনা ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। সেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের ললাঁ, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে। (সেদিন বলা হবে) এগুলো যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা রেখেছিলে, সুতরাং এক্ষণে আস্বাদ গ্রহণ কর জমা করে রাখার।'

(সূরা ৯ তাওবা, আয়াত-৩৪, ৩৫)



যাকাত আদায়ের সঠিক পদ্ধতি

যাকাত না দেয়ার ধুমকি

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ –

يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ

هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ –

‘আর যারা সোনা ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। সেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের ললাঁ, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে। (সেদিন বলা হবে) এগুলো যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা রেখেছিলে, সুতরাং এক্ষণে আস্বাদ গ্রহণ কর জমা করে রাখার।’

(সূরা ৯ তাওবা, আয়াত-৩৪, ৩৫)

উল্লেখিত আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তাআলা ঐ সমস্ত মানুষকে কঠোর হুশিয়ারী করেছেন, যারা সম্পদের যাকাত আদায় করে না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ‘যে সব মানুষ নিজের নিকট সোনা-রূপা জমা করে এবং আল্লাহর রাস্ত ায় খরচ করে না, (হে নবী) আপনি তাদেরকে এক ভয়াবহ শাস্তির খবর দিন।’

অর্থাৎ যে সমস্ত মানুষ টাকা-পয়সা, সোনা-রূপা জমা করে রাখে, আল্লাহর পথে খরচ করে না এবং আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে না, তাদেরকে সংবাদ দিন যে, এক ভয়াবহ শাস্তি তাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

ভয়াবহ শাস্তির বিশ্লেষণ করে আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন, ‘এই ভয়াবহ শাস্তি ঐ দিন হবে, যেদিন সোনা-রূপাকে আগুনে গরম করা হবে, অতঃপর তা

দ্বারা ঐ ব্যক্তির ললাটে, পাঁজরে এবং পিষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে এবং তাকে বলা হবে, এগুলো ঐ সমস্ত সম্পদের ভাণ্ডার, যা তোমরা নিজের জন্য জমা করেছিলে, আজ তোমরা সেই জমাকৃত সম্পদের স্বাদ আস্বাদন কর।’

আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মুসলমানকে এমন পরিণতি থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

এগুলো ঐ সমস্ত লোকদের শেষ পরিণতি, যারা টাকা-পয়সা জমা করতে মত্ত, অথচ তাদের প্রতি আল্লাহ তাআলা যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, তা সঠিকভাবে পালন করে না। শুধু এই আয়াতে নয়, অন্যান্য আয়াতেও অনেক ধুমকি এসেছে।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ – الَّذِيْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ –

يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهٗ أَخْلَدَهٗ – كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ – وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ –

نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ – الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ – إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ – فِيْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ –

‘প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারীর দুর্ভোগ, যে অর্থ সঞ্চিত করে ও গণনা করে। সে মনে করে যে, তার অর্থ চিরকাল তার সাথে থাকবে। কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে পিষ্টকারীর মধ্যে। আপনি কি জানেন, পিষ্টকারী কি? এটা আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত অগ্নি। যা হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছবে। এতে তাদেরকে বেঁধে দেয়া হবে। লম্বা লম্বা খুঁটিতে। (সূরা ১০৪ হুমাযাহ, আয়াত-১-৯)

অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির জন্য ভয়ঙ্কর শাস্তি, যে দোষ বাহির করে এবং পরনিন্দা করে, যে সম্পদ জমা করে এবং গণনা করে রাখে। প্রতি দিন গণনা করে দেখে যে, আজ কত টাকা বৃদ্ধি হল। এবং এটা মনে করছে যে, এই সম্পদ আমাকে সুখময় জীবন উপহার দিবে। তা কক্ষনো না। স্মরণ রাখা দরকার, সে সম্পদকে গণনা করে রাখছে এবং তার উপর যে কর্তব্য রয়েছে তা আদায় করছে না। এ কারণে তাকে নিস্পিষ্টকারী আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে। সে আগুন মানুষের জ্বালানো আগুন নয় যে, পানি বা মাটি দিয়ে তা বন্ধ করা যাবে, অথবা ফায়ার সার্ভিস দিয়ে নিভিয়ে দেয়া যাবে। এটা আল্লাহর জ্বালানো আগুন, যা দ্বারা মানুষের অন্তর ও কলিজা পর্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে যাবে। অর্থাৎ মানুষের কলব এবং কলিজা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এ ভয়াবহ আযাব থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

ক্রেতা কে পাঠাচ্ছে সম্পদ কোত্থেকে আসছে

যাকাত আদায় না করার উপর এমন কঠিন ধুমকি দেয়ার কারণ হল, ব্যবসা, চাকুরী বা ক্ষেত-খামার করে যা কিছু অর্জন হয় তা একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসছে। কেউ বাহুবলে এ সম্পদ অর্জন করতে পারবে না। আল্লাহ তাআলার প্রজ্ঞাময় নিয়মই এটা। নির্ধারিত নিয়মে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে রিযিক দিচ্ছেন।

তোমরা এটা মনে কর যে, মাল জমা করে দোকান খুলে বিক্রি করলাম, আর লাভবান হলাম। কিন্তু এ চিন্তা করলে না যে, কে তোমার দোকানে ক্রেতা বা কাস্টমার পাঠালেন?

দোকান খোলার পর কোন ক্রেতা বা কাস্টমার না আসলে তখন বিক্রি হত কি? কোন মুনাফা আসত কি? তাহলে কে তোমাদের নিকট ক্রেতা পাঠাচ্ছেন?

আল্লাহ তাআলা এমন নিয়ম কায়েম করেছেন যে, একে অপরের মুহতাজ হবে এবং একের প্রয়োজন অন্যের দ্বারা পুরা হবে। এক জনের অন্তরে এমন চিন্তা দিয়েছেন যে, তুমি দোকান খুলে বস, অন্যজনের অন্তরে চিন্তা দিয়েছে, তুমি অমুকের দোকান থেকে মাল ক্রয় কর।

শিক্ষণীয় একটি ঘটনা

আমার বড় ভাই জনাব মুহাম্মাদ জকি কাইফি রহ.–এর 'ইদারায়ে ইসলামিয়াত' নামে লাহোরে একটি ধর্মীয় পুস্তকের লাইব্রেরী ছিল। দোকানটি এখনো আছে। তিনি এক সময় বলেন, আমি ব্যবসার মধ্যে আল্লাহ তাআলার রহমত ও কুদরতের আশ্চর্য কারিশমা প্রত্যক্ষ করেছি।

একদিন সকালে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে দেখি মুশলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। বাজারে পানি জমে গেছে। আমি ভাবলাম, আজ বৃষ্টির দিন, রাস্তার উপর পানি জমে আছে, এমন পরিস্থিতিতে লোকজন ঘর থেকেই বের হবে না, ধর্মীয় বই-পুস্তক কিনতে কে আসবে? কারণ, দুনিয়াবী পুস্তক বা পাঠ্যসূচীর কোন বই আমার নিকট ছিল না।

ধর্মীয় বই-পুস্তক সম্পর্কে আমাদের অবস্থাতো এই যে, পার্থিব সব প্রয়োজন পুরা হলে তারপর ধর্মীয় বই-পুস্তক ক্রয় করে পাঠ করি। বই-পুস্তক দ্বারা ক্ষুধা-তৃষ্ণাও নিবারণ হয় না, দুনিয়াবী কোন প্রয়োজনও পুরা হয় না। বর্তমানে তো ধর্মীয় বই-পুস্তক ফালতু মনে করা হয়। যার ফলে আমাদের মানসিকতা এই দাঁড়িয়েছে যে, ফালতু সময় পেলে দ্বীনি বই পড়া যেতে পারে।

যা হোক, আমি ভাবলাম এমন বৃষ্টিতে বই কিনতে কেউ বাজারে আসবে না। অতএব আজ দোকানে যাব না।

তিনি একজন বুযুর্গ ব্যক্তির সোহবতপ্রাপ্ত ছিলেন। তিনি হাকীমুল উম্মাত হযরত থানবী রহ.-এর সান্নিধ্যে ছিলেন। এ জন্য তার চিন্তাও বুযুর্গ লোকদের চিন্তার মত ছিল। তিনি বলেন, এরপর আমি চিন্তা করলাম, কেউ কিতাব কিনতে আসুক বা না আসুক, আমার দোকান খোলা উচিত। কারণ, আল্লাহ তাআলা এ দোকানের মাধ্যমেই আমার রিযিকের ব্যবস্থা করেন। ক্রেতা পাঠান আমার কাজ নয়, এটা আল্লাহর কাজ। অতএব আমার কাজে অলসতা করা উচিত নয়। বৃষ্টি হোক আর প্লাবন হোক, আমাকে আমার দোকান খুলে রাখা উচিত।

এ চিন্তা করে ছাতা নিয়ে বৃষ্টির মধ্যেই বাজারে গিয়ে দোকান খুলে বসলাম। ভাবলাম, আজ তো কোন ক্রেতা আসবে না, তাই একটু বসে কুরআন তেলাওয়াত করি। অতঃপর আমি কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করার জন্য বসা মাত্রই দেখি, লোকজন রেইনকোঁ পড়ে, ছাতা মাথায় দিয়ে কিতাব কিনতে আসছে। এদিকে আমি পেরেশান এই ভেবে যে, মানুষের কী এমন প্রয়োজন হল যে, প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যেও কিতাব ক্রয় করার জন্য আসতে হবে!

যা হোক বিক্রি করলাম এবং হিসাব করে দেখলাম, অন্য দিনের মতই বিক্রি হয়েছে। তখন আমার স্মরণ হল, ক্রেতা তো নিজে আসছে না বরং বাস্তবিকই অন্য কেউ ক্রেতাকে পাঠাচ্ছেন। কারণ, তার মাধ্যমেই আল্লাহ তাআলা আমার রিযিকের ব্যবস্থা করবেন।

সব কাজের বণ্টন আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়

আসলে এটা আল্লাহ তাআলার কুদরতি নিয়ম, তিনি ক্রেতার অন্তরে জিনিস কেনার ইচ্ছা তৈরি করে দেন। দোকানদার দোকান খুলে রাখার ইচ্ছাও আল্লাহর পক্ষ থেকেই পেয়ে থাকে।

আল্লাহ তাআলা কারো অন্তরে কাপড় বিক্রির ইচ্ছা, কারো অন্তরে জুতা বিক্রির, কারো অন্তরে রুটি বিক্রির, আবার কারো অন্তরে গোশত বিক্রির চিন্তা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। যার ফলে প্রয়োজনীয় সব কিছুই পর্যাপ্ত পরিমাণ বাজারে পাওয়া যায়।

অন্যদিকে ক্রেতাদের অন্তরে এটা ঢেলে দিয়েছেন যে, তোমরা প্রয়োজনীয় বস্তু ক্রয় কর এবং তাদের রিযিকের বন্দোবস্ত কর। এটা আল্লাহ তাআলার কুদরতি নিয়ম। তিনি সমস্ত মানুষকে এভাবেই রিযিক দিয়ে থাকেন।

কনফারেন্স করে কেউ সিদ্ধান্ত দেয়নি যে, তুমি কাপড় বিক্রি করবে, আর সে জুতা বিক্রি করবে। তোমরা চাল বিক্রি করবে, আর তারা মাটিরপাত্র বিক্রি করবে। এভাবে মানুষের প্রয়োজনাদি মিটাবে। বরং আল্লাহ তাআলার বিধান মতই সব কিছু সংঘটিত হচ্ছে।

কে জমি থেকে উৎপাদন করছে

ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষেত-খামার বা চাকুরী যে মাধ্যমেই রিযিক আসুক, প্রকৃত রিযিকদাতা তো একমাত্র আল্লাহ তাআলাই।

ক্ষেত-খামারের দিকে লক্ষ্য করুন! মানুষ ক্ষেত-খামার উপযোগী করে বীজ বপন করবে, পানি দেবে। কিন্তু ঐ বীজ থেকে অঙ্কুর বের করা– যা একেবারেই অণুপযোগী, যার সামান্যতম ওজনও নেই, কিন্তু তা সত্যেও ঐ বীজই শক্ত জমির পেট ফুড়ে বের হয় এবং অঙ্কুরে পরিণত হয়। ঐ অঙ্কুরও এত নরম এবং হালকা যে, যদি কোন শিশু আঙ্গুল দ্বারা মটকাইয়া দেয়, তবে অতি সহজেই খতম হয়ে যাবে। অথচ সেই অঙ্কুরই মৌসুমের সব প্রতিকুলতা, ঠাণ্ডা-গরম ও প্রবল বাতাস সহ্য করে। ধীরে ধীরে সেই অঙ্কুর থেকে চারা হয়। তা থেকে ফুল হয়, ফল হয়। এভাবে সেই ফল সারা বিশ্বের মানুষের নিকট পৌঁছে যায়। কোন সত্ত্বা আছেন, যিনি এসব ব্যবস্থা করছেন? একমাত্র আল্লাহ তাআলাই এসব আঞ্জাম দিচ্ছেন।

মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করার যোগ্যতা নেই

আয়-উন্নতির যে কোন মাধ্যম– ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষেত-খামার বা চাকুরী যাই হোক– তা মানুষের আয়ত্বে নয়। মানুষকে সীমিত কিছু কাজের ক্ষমতা দিয়ে দুনিয়াতে পাঠান হয়েছে। তাই মানুষ শুধু ঐ সীমিত কাজটি সম্পাদন করতে পারে। কোন জিনিস সৃষ্টি করার যোগ্যতা সে রাখে না। সৃষ্টিকারী একমাত্র আল্লাহ তাআলাই। যিনি প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদেরকে তা দান করেছেন। অতএব, যা কিছু আমাদের নিকট রয়েছে তা সবকিছু তারই দেয়া বস্তু।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন– 'আসমান-জমিনের মাঝে যা কিছু রয়েছে তা সব তারই মালিকানাধীন'।

প্রকৃত মালিক আল্লাহ তাআলা

আল্লাহ তাআলা এসব জিনিস আমাদেরকে দিয়ে এটাও বলে দিয়েছেন যে, 'যাও! তোমরাই এগুলোর মালিক'। যেমন সূরা ইয়াসিন-এ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ

'তারা কি দেখে না! তাদের জন্য আমি আমার নিজ হাতের তৈরি বস্তু দ্বারা চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তারাই এগুলোর মালিক'।

(সূরা ৩৬ ইয়াসিন, আয়াত-৭১)

প্রকৃত মালিকতো আমিই ছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদের মালিক বানিয়ে দিয়েছি। ঐ সম্পদ যেগুলো তোমাদের হস্তগত হয়েছে, বাস্তবে এগুলোর সব চেয়ে বড় অধিকার আমার। যেহেতু আমার অধিকার, অতএব তা থেকে আমার নির্দেশ অনুযায়ী খরচ কর। তাহলে বাকি যত সম্পদ তোমাদের নিকট আছে, সেটা তোমাদের জন্য হালাল ও উত্তম হবে। আর সে সম্পদ আল্লাহর বরকতপূর্ণ নেয়ামত।

পক্ষান্তরে যতটুকু সম্পদ খরচ করা আল্লাহ তাআলা ফরয করেছেন, তা না করলে ঐ সম্পদই আপনার জন্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হবে এবং কেয়ামতের দিন তা দ্বারা আপনার শরীরে দাগ লাগিয়ে বলা হবে, 'এগুলো তোমাদের সেই সম্পদ যা তোমরা জমা করেছিলে'।

শুধু শতকরা আড়াই টাকা দান কর

যদি আল্লাহ তাআলা বলতেন, 'এ সম্পদ আমি দিয়েছি। অতএব তা থেকে শতকরা আড়াই টাকা তোমরা রাখ এবং বাকি টাকা আল্লাহর পথে দান কর', তবুও অন্যায় হত না। কারণ, সব সম্পদ তাঁরই দেয়া এবং তাঁরই মালিকানাধীন।

কিন্তু আল্লাহ তাআলা বান্দাদের উপর দয়া করে বলে দিয়েছেন, 'আমি জানি, তোমরা দুর্বল ও অসহায়, তোমাদের এ সম্পদের খুবই প্রয়োজন রয়েছে। আমি এও জানি যে, তোমাদের অন্তর এ মালের প্রতি আকৃষ্ট। অতএব শোনো, এ থেকে মাত্র আড়াই ভাগ দান কর আর বাকি সম্পদ তোমার নিজের কাজে ব্যবহার কর।

আড়াই ভাগ আল্লাহর পথে দান করলে অবশিষ্ট সাড়ে সাতানব্বই ভাগ বান্দার জন্য হালাল ও উত্তম হবে এবং বরকতপূর্ণ হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিয়েছেন বেশি, চেয়েছেন অল্প।

যাকাতের গুরুত্ব

শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত প্রদান করতে হবে। যাকাত সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বার বার ইরশাদ করা হয়েছে–

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

'নামায কায়েম কর এবং যাকাত আদায় কর'। (সূরা ২ বাকারা, আয়াত-৪৩)

আল্লাহ তাআলা যেখানেই নামাযের উল্লেখ করেছেন, সেখানে যাকাতের কথাও উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা যাকাতের গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। অন্য দিকে আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতি এত বড় দয়া করেছেন যে, আমাদেরকে সম্পদ দিয়েছেন এবং তার মালিক বানিয়ে তা থেকে শতকরা মাত্র আড়াই টাকা চেয়েছেন।

মুসলমানদের উচিত, আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী শতকরা আড়াই টাকা আদায় করা। তাহলে আর আসমান ভেঙ্গে পড়বে না, কেয়ামতও চলে আসবে না।

যাকাত হিসাব করে বের করবে

অনেকে আছেন, যারা যাকাত থেকে একেবারেই বিমূখ। যাকাত দেয়ই না। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন। তাদের চিন্তা এমন যে, শতকরা আড়াই টাকা কেন দেব? সম্পদ যা জমা হচ্ছে হোক।

আবার অনেকেই আছেন, যারা যাকাত আদায় করে ঠিক, কিন্তু সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করে না। যেহেতু শতকরা আড়াই টাকা ফরয করা হয়েছে, অতএব সঠিক হিসাব করে যাকাত আদায় করা উচিত।

অনেকেই ভাবেন, হিসাব করে কি হবে? তারা অনুমান করে যাকাত দেয়। অথচ অনুমানে ক্রটি হলে যাকাত আদায় হবে না। হ্যাঁ, অনুমানে অতিরিক্ত যাকাত দিলে, আশা করা যায় আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে না। কিন্তু একটি টাকাও যদি কম হয়, তাহলে মনে রাখবেন, ঐ একটি টাকা যা অবৈধভাবে নিজের নিকট রেখে দিলেন, তা সমস্ত সম্পদকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট।

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন– পরিপূর্ণ যাকাত না দিলে ঐ সম্পদ তার জন্য ধ্বংসের কারণ হবে। এজন্য প্রতিটি পয়সার হিসাব করে যাকাত দেয়া উচিত। অন্যথায় যাকাত পরিপূর্ণভাবে আদায় হবে না।

যাকাত দেয়ায় পার্থিব উপকার

যাকাত এই নিয়তে আদায় করবে যে, এটা আল্লাহ প্রদত্ত একটি বিধান, এতে তিনি খুশি হন। উপরন্তু এটা একটা ইবাদত। এর দ্বারা পার্থিব কোন উপকার হোক বা না হোক, একমাত্র আল্লাহর বিধান পালন করাই উদ্দেশ্য হতে

হবে। এটাই যাকাতের আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু আল্লাহর অশেষ দয়া, যখন বান্দা যাকাত দেয়, তখন আল্লাহ তাআলা জাগতিক উপকারও দেন। অর্থাৎ সম্পদের মধ্যে বরকত হয়।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরাশাদ করেন–

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ

'আল্লাহ তাআলা সুদকে নিঃশেষ করে দেন এবং যাকাত ও সাদকাকে বৃদ্ধি করে দেন।' (সূরা ২ বাকারা, আয়াত-২৭৬)

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, যখন কেউ যাকাত দেয়, তখন ফেরেশতাগণ তার জন্য এই দুআ করেন– 'হে আল্লাহ, আপনার রাস্তায় যে ব্যক্তি খরচ করে, তাকে আরো বাড়িয়ে দিন। আর যে ব্যক্তি সম্পদ জমা করে রাখে, যাকাত দেয় না, তার সম্পদ ধ্বংস করে দিন।' তাই বলা হয়, সাদকা করলে সম্পদ কমে না।

অনেক সময় এমন হয় যে, একদিকে মুসলমান ব্যক্তি যাকাত দিচ্ছে, অন্য দিকে আল্লাহ তাআলা আয়-উন্নতির আরেক মাধ্যম সৃষ্টি করে দিচ্ছেন, যা দ্বারা যাকাতের প্রদেয় টাকার চেয়ে বেশি টাকা তার হাতে চলে আসে। অনেক সময় এমন হয় যে, যাকাত দেয়ার দ্বারা গণনায় যদিও কমে যায়; কিন্তু অবশিষ্ট সম্পদের মধ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন বরকত হয় যে, অল্প সম্পদ দ্বারা অনেক উপকার হয়।

সম্পদে বরকত না হওয়ার ফল

বর্তমান দুনিয়া সুদ গণনার দুনিয়া। বরকতের অর্থ মানুষের বুঝে আসে না। বরকত বলা হয় 'অল্প জিনিস দ্বারা বেশি উপকার হওয়া'। অনেক টাকা উপার্জন করে ঘরে গিয়ে দেখেন, সন্তান অসুস্থ। তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেন। তার চিকিৎসাতেই সব টাকা খরচ হয়ে গেল।

অথবা আপনি পয়সা কামাই করে ঘরে যাচ্ছেন, পথিমধ্যে ডাকাত পিস্তল দেখিয়ে সব পয়সা ছিনিয়ে নিয়ে গেল, তাহলে বোঝা যাবে আপনার কামাইকৃত পয়সার মধ্যে বরকত ছিল না।

অথবা পয়সা কামাই করে তা দ্বারা খাবার কিনে খেলেন, অতঃপর বদ হজম হল। তাহলেও বোঝা যাবে, ঐ উপার্জনে বরকত ছিল না। এগুলো বরকত না হওয়ার আলামত।

আপনি টাকা কামাই করলেন, কিন্তু আল্লাহ তাআলা ঐ অল্প টাকা দ্বারা অনেক কাজ করার তাওফীক দিলেন এবং আপনার অনেক কাজ সমাধা হয়ে

গেল, এটাই ‘বরকত’। এই বরকত আল্লাহ তাআলা তাকেই দান করেন, যে আল্লাহর বিধানাবলীর উপর যথাযথভাবে আমল করে।

অতএব আমরা সম্পদের যাকাত এমনভাবে আদায় করব, যেমন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের বলেছেন। যাকাত খুব হিসাব করে আদায় করব, শুধু আন্দাজ বা অনুমান করে যাকাত দেয়া কোন ক্রমেই উচিত নয়।

যাকাতের নেসাব

আল্লাহ তাআলা যাকাতের একটি নেসাব নির্ধারণ করে দিয়েছেন। নেসাবের কম সম্পদ থাকলে তার উপর যাকাত ফরয হয় না। নেসাব পরিমাণ হলে যাকাত আদায় করা ফরয হবে।

নেসাব হল, সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা অথবা সাড়ে সাত তোলা সোনা অথবা তার সমপরিমাণ টাকা-পয়সা বা ব্যবসার জিনিস ইত্যাদি থাকা। এই পরিমাণ সম্পদ যার নিকট থাকবে, তাকে ‘ছাহেবে নেসাব’ বলে। তার উপর যাকাত ফরয।

সব ধরনের মালের উপর বছর অতিবাহিত হওয়া জরুরী নয়

উল্লেখিত নেসাবের উপর এক বছর অতিবাহিত হওয়া জরুরী। অর্থাৎ উল্লেখিত পরিমাণ সম্পদ কারো নিকট পূর্ণ এক বছর থাকলে তার উপর যাকাত ফরয।

অনেকেই মনে করেন, প্রতিটি টাকার উপর পুরা বছর অতিবাহিত হওয়া জরুরী। এমনটি ঠিক নয়। বরং বছরের শুরুতে নেসাবের মালিক হলে এবং শেষ পর্যন্ত মালিক থাকলে মাঝের কোন হিসাব ধর্তব্য হবে না। যেমন, কেউ রমযানের প্রথম দিনে নেসাব পরিমাণ মালের মালিক ছিল, দ্বিতীয় বছর রমযানের প্রথম দিনে তার নেসাব বাকি থাকলে, তার উপর যাকাত ফরয হবে। বছরের মাঝে টাকা-পয়সা কম-বেশি হলে তা ধর্তব্য নয়। দ্বিতীয় রমযানের প্রথম তারিখে তার নিকট যে পরিমাণ টাকা থাকবে, তার উপর যাকাত আসবে। যদিও কিছু টাকা মাত্র একদিন আগে আসে, তবুও সম্পূর্ণ মালের উপর যাকাত আসবে।

নির্দিষ্ট তারিখে যত টাকা থাকবে সব টাকার উপর যাকাত আসবে

চলতি বছর রমযান মাসের প্রথম তারিখে কারো নিকট এক লাখ টাকা ছিল। পরবর্তী বছর রমযানের দুই দিন পূর্বে তার নিকট আরো পঞ্চাশ হাজার

টাকা আসলো। এ বছর পহেলা রমযানে তার নিকট দেড় লাখ টাকা হল। এখন সে দেড় লাখ টাকার যাকাত দেবে। এটা বলা যাবে না যে, ঐ পঞ্চাশ হাজার টাকার উপর তো পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হয়নি, মাত্র দু’দিন অতিবাহিত হয়েছে। এ টাকার যাকাত আসে কীভাবে? এমন বলা যাবে না। বরং বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নেসাব পরিমাণ মাল থাকলে বছরের মাঝে যত টাকা আসবে তা হিসাব করে যাকাত আদায় করতে হবে।

আল্লাহ তাআলা হিসাবের অতিরিক্ত ঝামেলা থেকে মুক্তি দিয়ে সহজ পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে, বছরের মাঝে খরচ হলে সে টাকার যাকাত দেয়া জরুরী নয়। বছরের মাঝের খাওয়া-পড়ার কোন হিসাব করতে হবে না।

এমনিভাবে বছরের মাঝে যা আয় হয়েছে, তার আলাদা হিসাব রাখাও মুশকিল। কোন তারিখে কত টাকা আসলো এবং কোন তারিখে তার উপর বছর পুরা হবে, এ হিসাব রাখা কঠিন, তাই যাকাত আদায়ের তারিখে যে পরিমাণ টাকা হাতে থাকবে, তার যাকাত আদায় করতে হবে। বছর পূর্ণ হওয়ার দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য।

যাকাতের মালসমূহ কী কী

আল্লাহর পক্ষ থেকে বড় দয়া ও অনুগ্রহ, তিনি সকল বস্তুর উপর যাকাত ফরয করেননি। বরং নির্দিষ্ট কিছু জিনিসের উপর যাকাত ফরয করেছেন।

সম্পদ অনেক অনেক ধরনের হয়ে থাকে। যে সমস্ত সম্পদের উপর যাকাত ফরয তা হল– এক. নগদ টাকা-পয়সা। দুই. সোনা-রূপা। অলঙ্কার হোক বা অন্য কিছু।

অনেকেই মনে করেন, মহিলাদের ব্যবহৃত সোনা ও রূপার অলঙ্কারাদীর যাকাত দিতে হবে না। তাদের এ ধারণা ঠিক নয়। এগুলোর যাকাত অবশ্যই দিতে হবে। তবে সোন ও রূপা ছাড়া অন্যান্য ধাতুর তৈরি অলঙ্কারের উপর যাকাত ফরয হবে না। এমনকি প্লাটিনাম (platinam) এর উপরও যাকাত ফরয হবে না। হ্যাঁ, ব্যবসার জন্য হলে, চলতি বাজারের মূল্য হিসেবে যাকাত দিতে হবে।

যাকাতের মালের মধ্যে যুক্তি খাটানো যাবে না

‘যাকাত’ আল্লাহ প্রদত্ত একটি ফরয ইবাদত। আমাদের বুঝে আসুক আর না আসুক আল্লাহর হুকুম পালন করতে হবে। কোন প্রশ্নের অবকাশ নেই যে, এটার উপর কেন যাকাত ফরয হল? আর ওটার উপর কেন ফরয হল না?

কেউ এ কথা বলার অধিকার রাখে না যে, সোনা-রূপার উপর যাকাত ফরয হল, প্লাটিনাম এর উপর হল না কেন? প্রশ্নটি এমন, যেমন কেউ প্রশ্ন করল– সফর অবস্থায় যোহর, আছর ও ইশার নামায 'কছর' অর্থাৎ চার রাকাত না পড়ে দুই রাকাত পড়া হয়, কিন্তু মাগরিবের নামাযে 'কছর' নেই কেন?

অথবা কেউ প্রশ্ন করল, বিমানের ফাস্ট ক্লাসে ভ্রমণ করছে, যার সফরের কোন কষ্টই হচ্ছে না, অথচ তার নামায অর্ধেক হয়ে গেল, আর আমি বাসে সফর করছি, কত কষ্ট, তাহলে আমার নামায অর্ধেক হয় না কেন?

এসব প্রশ্নের উত্তর একটাই– 'এগুলো আল্লাহর ইবাদত। ইবাদতের মধ্যে এ সমস্ত বিধান পালন করা আবশ্যক। অন্যথায় সেটা ইবাদতই হবে না।'

ইবাদত করা আল্লাহর বিধান

আল্লাহর হুকুম পালন করাই ইবাদত। যুক্তি দিয়ে নিজের মন মত করা ইবাদত নয়। যেমন আল্লাহর হুকুম হল– 'জিলহজ্জ মাসের নয় তারিখে হজ্জ এবং আরাফাতের ময়দানে একদিন থাকতে হবে। এখন কেউ যদি বলে, নয় তারিখে হজ্জ করব কেন? আমার তো আঁ তারিখে হজ্জ করলেই ভাল হয়। আর আরাফাতের ময়দানে এক দিন না থেকে তিন দিন থাকব। কেউ মন মত এমনটি করলে তার হজ্জ হবে না। কেননা আল্লাহ তাআলা ইবাদতের যে পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন, সে মোতাবেক হল না।

অথবা কেউ বলল, হজ্জের তিন দিনে পাথর নিক্ষেপ করা খুব কষ্ট, আমি চতুর্থ দিনে একসাথে সব দিনের পাথর নিক্ষেপ করব, তাহলে এরূপ নিক্ষেপ করা শুদ্ধ হবে না। কারণ এটা ইবাদত। আর ইবাদতের মধ্যে যে পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে এবং যেভাবে করতে বলা হয়েছে, সেভাবেই করতে হবে। ব্যতিক্রম হলে শুদ্ধ হবে না।

অতএব খোদায়ী কোন বিধানের উপর প্রশ্ন করা যাবে না। সোনা-রূপার উপর যাকাত ফরয কেন? হিরা-জহরতের উপর ফরয নয় কেন? এমন প্রশ্ন করা ইবাদতের দর্শনের পরিপন্থী।

মোটকথা আল্লাহ তাআলা সোনা-রূপার উপর যাকাত ফরয করেছেন। (যদিও তা ব্যবহারের হোক) আর নগদ অর্থের উপর যাকাত ফরয করেছেন।

ব্যবসার আসবাব-পত্রের মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি

দ্বিতীয় যে বস্তুটির উপর যাকাত ফরয, সেটি হল– 'ব্যবসার আসবাব-পত্র'। যেমন কেউ বিক্রির জন্য কিছু মাল স্টক করল। এই স্টককৃত মালের

উপর যাকাত ফরয হবে। তবে স্টকের মূল্য নির্ধারণ করতে স্টককৃত পুরা মালের মূল্য নির্ধারণ একত্রে করতে পারবে। যেমন পুরা স্টক একসঙ্গে বাজারে বিক্রি করতে চাইলে তার যে মূল্য হবে সে অনুযায়ী যাকাত আদায় করবে।

এখানে লক্ষণীয় যে, স্টকের মূল্য নির্ধারণের তিনটি পদ্ধতি রয়েছে। এক. Ritil price অর্থাৎ খুচরা মূল্য । দুই. Hole sell price অর্থাৎ পাইকারী মূল্য। তিন. পুরা স্টক একত্রে বিক্রি করা।

তৃতীয় পদ্ধতি অনুযায়ী যাকাতের হিসাব করে মূল্য নির্ধারণ করে তা থেকে শতকরা আড়াই টাকা হিসাবে যাকাত প্রদান করবে। তবে Hole sell prise অর্থাৎ খুচরা মূল্য র্নিধারণ করে সে অনুযায়ী যাকাত দেয়াই বেশি ভাল। এজন্য খুচরা মূল্য অনুযায়ী যাকাত দেবে।

কোন কোন সম্পদ ব্যবসাপণ্যের অন্তর্ভূক্ত

বিক্রির উদ্দেশ্যে যে সম্পদ কেনা হবে, তা ব্যবসায়ী পণ্যের অন্তর্ভূক্ত। জমি-প্লট, বাড়ী বা গাড়ী বিক্রির উদ্দেশ্যে কিনলে, তা ব্যবসায়ী মালের মধ্যে গণ্য হবে। তার মূল্যের উপর যাকাত ফরয হবে। মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে প্লট কিনলে, তার মূল্যের উপর যাকাত ফরয হবে। কিন্তু বাড়ী বানানের উদ্দেশ্যে অথবা ভাড়া দেয়ার উদ্দেশ্যে প্লট কিনলে তার উপর যাকাত ফরয হবে না। যদিও সেটা পরবর্তীতে বিক্রি করে দেয়া হোক না কেন। কারণ, তার বিক্রি করার নিয়ত ছিল না। কেনার সময় বেচার নিয়ত থাকলে যাকাত ফরয হত। শতকরা আড়াই টাকা যাকাত দিতে হত।

বসবাসের জন্য বাড়ী বানানোর নিয়তে প্লট কিনে নিয়ত পরিবর্তন করল যে, বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করব। তাহলে শুধু নিয়ত পরিবর্তনের দ্বারা বিধান পরিবর্তন হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত সে ঐ প্লট বিক্রি না করবে এবং মূল্য হস্তগত না হবে, ততক্ষণ তার যাকাত দিতে হবে না।

কোন দিনের মূল্য ধর্তব্য হবে

এ কথাও স্মরণ রাখা দরকার যে, যে দিন যাকাত হিসাব করছেন সেই দিনের মূল্য ধর্তব্য হবে। যেমন আপনি একটি প্লট এক লক্ষ টাকা দিয়ে ক্রয় করেছিলেন। এখন তার মূল্য দশ লক্ষ হয়েছে। তাহলে ঐ দশ লক্ষের উপর শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত দিতে হবে। এক লাখ মূল্যের উপর দিলে চলবে না।

কোম্পানির শেয়ারের যাকাতের বিধান

এমনিভাবে কোম্পানির শেয়ারও ব্যবসায়ী পণ্যের মধ্যে গণ্য। এর দু'টি পদ্ধতি রয়েছে। এক. আপনি কোন কোম্পানির শেয়ার এই উদ্দেশ্যে ক্রয় করলেন যে, তা দ্বারা কোম্পানির মুনাফা অর্জন করবেন। প্রতি বছর কোম্পানি থেকে মুনাফা নেবেন।

দুই. কোন কোম্পানির শেয়ার এই নিয়তে ক্রয় করেছেন যে, যখন বাজারে এর মূল্য বৃদ্ধি হবে, তখন তা বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করবেন।

দ্বিতীয় পদ্ধতিতে শেয়ার কিনলে যেহেতু ক্রয়ের সময়েই বিক্রির নিয়ত থাকে, এজন্য শেয়ারের পুরা মূল্যের উপর যাকাত ফরয হবে। যেমন পঞ্চাশ টাকা করে শেয়ার কিনেছেন। উদ্দেশ্য ছিল, মূল্য বাড়লে বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করবেন। অতঃপর যেদিন আপনি যাকাতের হিসাব করছেন সেদিন শেয়ারের মূল্য ৬০ টাকা হয়ে গেল। তাহলে যাকাত আদায়ের সময় ষাট টাকা হিসাবে ঐ শেয়ারের মূল্য হিসাব করে শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত দিতে হবে।

কিন্তু প্রথম পদ্ধতিতে শেয়ার কেনার সময় বেচার নিয়ত ছিল না, বরং বাৎসরিক মুনাফা অর্জনের নিয়ত ছিল। এজন্য এমতাবস্থায় আপনাকে দেখতে হবে, যেই কোম্পানির শেয়ার, তার কতটি পণ্য বৃদ্ধিলাভ করে না। যেমন বিল্ডিং, মেশিনারী, গাড়ী ইত্যাদি। আর কতটি পণ্য নগদ টাকা-পয়সা ও কাঁচা মালের মত রয়েছে। (এগুলো কোম্পানি থেকে জেনে নিতে হবে) যেমন, কোন কোম্পানির শতকরা ষাট ভাগ সম্পদ নগদ, ব্যবসার পণ্য এবং কাঁচা মাল বা তৈরিমাল হিসেবে রয়েছে এবং চল্লিশ ভাগ সম্পদ বিল্ডিং, মেশিনারী এবং গাড়ী ইত্যাদি হিসেবে রয়েছে। তখন ঐ শেয়ারের বাজারী মূল্য ধরে ষাট ভাগ মূল্যের যাকাত আদায় করতে হবে।

যেমন শেয়ারের বাজার দর ১০০ টাকা। আর কোম্পানির ষাট ভাগ সম্পদ যাকাতের উপযুক্ত এবং চল্লিশ ভাগ সম্পদ যাকাতের অনুপযোগী। এমতাবস্থায় শেয়ারের পুরা মূল্যের অর্থাৎ ১০০ টাকার স্থলে ৬০ টাকার যাকাত দেবে।

হ্যাঁ, কোম্পানির সম্পদ বিস্তারিত বিবরণ জানতে না পারলে, সতকর্তা হিসেবে শেয়ারের বাজারী মূল্য ধরে যাকাত দেবে। শেয়ার ছাড়া যেসব ফাইনান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট আছে, চাই তা প্রাইজবন্ড হোক বা চেক হোক, সেগুলো নগদ টাকা-পয়সার হুকুমে। তার আসল মূল্যের উপর যাকাত ফরয হবে।

ফ্যাক্টরির কোন জিনিসের উপর যাকাত আসে

ফ্যাক্টরি, মেশিনারী, বিল্ডিং, গাড়ী ইত্যাদির উপর যাকাত আসবে না, বরং তা থেকে উৎপাদিত মালের উপর যাকাত আসবে। ঠিক তদ্রুপ যদি কোন ব্যক্তি ব্যবসায় শরীক হওয়ার জন্য টাকা লাগায়, আর ঐ শেয়ারের উল্লেখযোগ্য অংশ তার মালিকানায় থাকে, তাহলে যে অংশ তার মালিকানায় আছে, সেই অংশের উপর বাজারের মূল্য অনুসারে যাকাত ফরয হবে।

মোটকথা, নগদ টাকা-পয়সা ও ব্যবসায়ী পণ্যের উপর যাকাত ফরয। ব্যাংক ব্যালেন্স, ফাইনান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট, কাঁচা মাল, তৈরি মাল ও যে মাল তৈরির পথে, সেগুলো ব্যবসায়ী পণ্যের অন্তর্ভূক্ত। এছাড়াও বিক্রির জন্য ক্রয়কৃত মালও ব্যবসায়ী মাল হিসেবে গণ্য হবে। যাকাত দেয়ার সময় ঐ সব মালের মূল্য নির্ধারণ করে যাকাত আদায় করতে হবে।

আদায়যোগ্য ঋণের যাকাত এবং অনাদায়ী ঋণ বাদ দেয়া

এছাড়াও অনেক টাকা-পয়সা এমন আছে, যা অন্য ব্যক্তির নিকট থেকে অবশ্যই পাওয়া যাবে। যেমন, কাউকে ঋণ দিয়েছে, অথবা বাকিতে বিক্রি করেছে এবং তার মূল্য এখনও উছুল হয়নি। এক্ষেত্রে যাকাতের হিসাব করার সময় উত্তম হল ঋণ ও আদায়যোগ্য বাকি টাকার হিসাব করে যাকাত আদায় করা।

শরীয়তের বিধান হল, যেসব ঋণ এবং বাকি এখনও উছুল হয়নি, তার উপর যাকাত ফরয নয়, তবে উছুল হওয়ার সাথে সাথে পূর্বের বছরগুলোর যাকাত আদায় করতে হবে। যেমন, কাউকে এক লক্ষ টাকা ঋণ দিলেন এবং পাঁচ বছর পর তা ফেরত পেলেন। তাহলে ঐ এক লাখ টাকার উপর গত পাঁচ বছরে যাকাত ফরয না হলেও ঐ এক লাখ টাকা উছুল হওয়ামাত্র, অতীতের পাঁচ বছরের যাকাত দিতে হবে। পাঁচ বছরের যাকাত একসাথে আদায় করা অনেক সময় কঠিন হয়, এজন্য উত্তম হল প্রতি বছর যাকাত আদায় করে দেয়া। অতএব যখন যাকাতের হিসাব করবে, তখন ঐ ঋণ ও বাকি টাকারও হিসাব করে যাকাত আদায় করে দেবে।

অন্যদিকে এটা লক্ষ্য করবে যে, সে অপরের নিকট কত টাকা ঋণী আছে। হিসাব করে তা বাদ দিয়ে বাকি টাকার যাকাত শতকরা আড়াই টাকা হারে আদায় করবে। উত্তম পন্থা হল, যাকাতের টাকা আলাদা রেখে যাকাতের হকদারদের মধ্যে খরচ করবে। এটাই হল যাকাত হিসাব করার পদ্ধতি।

ঋণ দুই প্রকার

ঋণের ব্যাপারে আরো একটি কথা বুঝে নেয়া দরকার যে, ঋণ দুই ধরনের। এক. সাধারণ ঋণ, যা মানুষ নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বা অন্ত রবর্তীকালের জন্য বাধ্য হয়ে নিয়ে থাকে। দুই. ঐ ঋণ, যা বড় বড় পুঁজিবাদীরা উৎপাদনের উদ্দেশ্যে নিয়ে থাকে। যেমন ফ্যাক্টরি বানানোর জন্য, মেশিনারী খরীদ করার জন্য, মাল ইমর্পোর্ট করার জন্য অথবা নতুন ফ্যাক্টরি বানানোর জন্য ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে থাকে।

দ্বিতীয় প্রকার ঋণ গ্রহণকারী যদি তার ঋণ বাদ দিয়ে হিসাব করে, তাহলে দেখা যাবে তার উপর এক পয়সাও যাকাত আসবে না। উল্টো সেই যাকাত গ্রহণের হকদার হয়ে যাবে। কারণ, তার নিকট যা আছে, তা থেকে বেশি টাকা সে ব্যাংক থেকে নিয়ে রেখেছে। এ দিকে লক্ষ্য করলে প্রত্যক্ষভাবে তাকে ফকির মনে হবে। এজন্য শরীয়ত এসমস্ত ঋণ বাদ দেয়ার ভিন্নপন্থা রেখেছে।

ব্যবসার ঋণ কখন বাদ দেবে

প্রথম প্রকারের ঋণ পুরাাঁই বাদ দিয়ে যাকাত আদায় করবে। যেমন কেউ ঋণ করে নিজের সাধারণ প্রয়োজন মিটালো, তাহলে তা বাদ দিয়ে যাকাতের হিসাব করতে হবে।

আর দ্বিতীয় প্রকার ঋণের ক্ষেত্রে নির্দেশ হল, ব্যবসার উদ্দেশ্যে ঋণ নিয়ে এমন জিনিস খরিদ করল, যার উপর যাকাত আসে, যেমন কাঁচা মাল অথবা ব্যবসায়ী মাল খরিদ করেছে, তাহলে ঐ ঋণ বাদ দেবে। কিন্তু যদি তা দ্বারা এমন জিনিস খরিদ করে, যা যাকাতের অনুপযোগী, তাহলে ঐ ঋণ পুরা মাল থেকে বাদ দেয়া যাবে না। যেমন কেউ ব্যাংক থেকে এক কোটি টাকা ঋণ নিয়ে বিদেশ থেকে মেশিনারী ইর্ম্পোর্ট করল। মেশিনারী যেহেতু যাকাতের উপযোগী নয়, এজন্য এ ঋণ বাদ যাবে না।

মোটকথা, সাধারণ ঋণ পুরাাঁই বাদ যাবে। আর উৎপাদনমুখী কারবারের উদ্দেশ্যে যে ঋণ নেয়া হবে, তার মধ্যে ব্যাখ্যা এই যে, যদি তা দ্বারা যাকাত উপযোগী জিনিস ক্রয় করে, তাহলে সে ঋণ বাদ যাবে, আর যাকাতের অনুপযোগী জিনিস ক্রয় করলে বাদ যাবে না। এটা যাকাত বের করা সম্পর্কে বিধান।

প্রকৃত হকদারকে যাকাত দাও

যাকাত আদায় করার ব্যাপারেও শরীয়ত বিধান বলে দিয়েছে। আমার আব্বা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. বলতেন, আল্লাহ তাআলা

শুধু এটা বলেনি যে, 'যাকাত বের কর'। এটাও বলেনি যে, 'যাকাত নিক্ষেপ কর'। বরং বলেছেন– 'যাকাত আদায় কর'। অর্থাৎ যথাস্থানে যেন যাকাত পৌঁছে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখ।

কিছু কিছু মানুষ যাকাত দেয় ঠিক, কিন্তু সঠিক স্থানে খরচ হচ্ছে কি না, সেদিকে খেয়াল করে না। হিসাব করে যাকাত বের করে একজনকে দিয়ে দেয়। এটা দেখে না যে, সে সঠিক স্থানে খরচ করছে কি না।

বর্তমান যুগে অনেক প্রতিষ্ঠান এমন আছে, যারা খেয়ালই করে না যে, যাকাতের টাকা সঠিক স্থানে খরচ করা হচ্ছে কি না। এজন্যই বলা হয়েছে যে, যাকাত আদায় কর অর্থাৎ, যে ব্যক্তি যাকাতের হকদার, কেবল তাকেই যাকাত দেও।

কে প্রকৃত হকদার

শরীয়ত একটি নীতিমালা নির্ধারণ করে দিয়েছে যে, যাকাত শুধু তাদেরকে দেয়া যাবে, যারা নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক নয়। অতএব প্রয়োজনের অতিরিক্ত আসবাব-পত্র ও টাকা-পয়সা যদি সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা অথবা সাড়ে সাত তোলা সোনার মূল্যের পরিমাণ কেউ মালিক হয়, তাহলে সে যাকাতের হকদার হবে না। পক্ষান্তরে যার নিকট এ পরিমাণ সম্পদ থাকবে না, সে যাকাতের হকদার হবে।

শরীয়ত এটাও নির্দেশ দিয়েছে যে, যাকাতের প্রকৃত হকদারকে মালিক বানিয়ে দাও। অর্থাৎ সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে। একারণেই বিল্ডিং বানানোর শর্তে কাউকে যাকাত দেয়া যাবে না। কোন প্রতিষ্ঠানের চাকুরীজীবির বেতন-ভাতা দেয়ার জন্য যাকাত দেয়া যাবে না।

যাকাতের টাকা সাধারণ দানের মত হলে, তা দ্বারা বিল্ডিং, ইত্যাদি বানিয়ে, বেতন-ভাতা দিয়ে শেষ করে ফেলবে। বিল্ডিং করতে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়, বেতন-ভাতাও কম না। এজন্য শরীয়তের আদেশ হল, নেসাব পরিমাণ মালের মালিক নয় এমন ব্যক্তিকে মালিক বানিয়ে যাকাত আদায় কর।

যাকাত অনাথ, গরীব-মিসকিন ও অসহায়দের প্রাপ্য। এমন ব্যক্তিকে শর্তহীনভাবে যাকাতের অর্থ দিয়ে মালিক বানালে তবেই যাকাত আদায় হবে, অন্যথায় আদায় হবে না।

যেসব আত্মীয়কে যাকাত দেয়া যাবে

যাকাত আদায় করার বিধান প্রকৃত হকদার খোঁজার মানসিকতা সৃষ্টি করে দেয়। কারণ, যাকাতের টাকা-পয়সা তো সঠিক জায়গায় খরচ করতে হবে।

এজন্য হকদার তালাশ করা হয় যে, কাকে যাকাত দেয়া যায়। এভাবে একটি তালিকা করে যাকাত দেয়া হয়।

মানুষ হিসেবে একটি দায়িত্ব এই যে, নিজ এলাকায় যাদের সাথে চলা-ফেরা করা হয়, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের মধ্যে যারা যাকাতের হকদার, তাদেরকে যাকাত দেবে। এতে সাওয়াবও দ্বিগুণ পাওয়া যায়। এক. যাকাত আদায় করার সাওয়াব, দুই. আত্মীয়তার সর্ম্পক বজায় রাখার সাওয়াব। তবে দুই ধরনের আত্মীয়কে যাকাত দেয়া যাবে না। এক. জন্মের সম্পর্ক। যেমন, পিতা সন্তানকে যাকাত দিতে পারবে না এবং সন্তান পিতাকে যাকাত দিতে পারবে না। দুই. বিবাহের সম্পর্ক। যেমন, স্বামী স্ত্রীকে যাকাত দিতে পারবে না এবং স্ত্রী স্বামীকে যাকাত দিতে পারবে না।

এছাড়া অন্য সব আত্মীয়কে যাকাত দেয়া যাবে। যেমন ভাই-বোন, চাচা-খালা, ফুফু-মামা ইত্যাদি সকলকে যাকাত দেয়া যাবে। তবে এটা অবশ্যই দেখতে হবে যে, সে যাকাতের হকদার কি না। সে নেসাবের মালিক কি না।

বিধবা ও এতিমকে যাকাত দেয়ার বিধান

অনেকেই মনে করেন, বিধবাকে অবশ্যই যাকাত দেয়া উচিত। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখতে হবে যে, সে প্রকৃত হকদার কি না। যদি বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা মহিলা যাকাতের হকদার না হয়, তাহলে তাকে যাকাত দেয়া যাবে না, হকদার হলে দেয়া যাবে। শুধু বিধবা হওয়ার কারণেই সে যাকাত গ্রহণের হকদার হবে না, তাই যাকাতও প্রদান করা যাবে না।

এতিমকে যাকাত দেয়ার ব্যাপারেও একই কথা। হকদার হলে দেয়া যাবে, অন্যথায় দেয়া যাবে না। শুধু এতিম হওয়ার কারণে যাকাত পাবে না। এসব বিধানাবলীর দিকে লক্ষ্য রেখে যাকাত দেয়া উচিত।

ব্যাংক থেকে যাকাত কর্তনের বিধান

সাম্প্রতিককালে আমাদের দেশে সরকারীভাবে যাকাত উছুল করার নিয়ম চালু হয়েছে। একারণে অনেক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে যাকাত উছুল করা হয়। কোম্পানিগুলে যাকাত কেটে সরকারকে প্রদান করে। এ ব্যাপারে অল্প কিছু আলোচনা করার প্রয়াস পাব।

ব্যাংক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো যাকাত কেটে রাখলে যাকাত আদায় হয়ে যায়। দ্বিতীয়বার যাকাত আদায় করার প্রয়োজন নেই। অবশ্য সতর্কতা স্বরূপ রমযান আসার পূর্বেই মনে মনে এই নিয়ত করবে যে, আমার টাকা থেকে যে পরিমাণ যাকাত কাটা হবে, তা আমি আদায় করছি। এতে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। দ্বিতীয়বার যাকাত দেয়ার প্রয়োজন নেই।

অনেকেই ভাবেন যে, আমাদের পুরা টাকা-পয়সার উপর তো এক বছর অতিবাহিত হয়নি, অথচ যাকাত কাটা হল? এ ব্যাপারে প্রথমে বলেছি যে, সব টাকার উপর পূর্ণ বছর অতিবাহিত হওয়া জরুরী নয়। বরং নেসাবের মালিক হলে, বছর পূর্ণ হওয়ার একদিন পূর্বেও যে টাকা আসবে, তার উপরও যাকাত ফরয হবে। অতএব যাকাত কর্তন করা জায়েয আছে।

একাউন্টের টাকা থেকে ঋণ বাদ দেয়ার পদ্ধতি

যদি কারো সব আসবাব-পত্র ও টাকা-পয়সা নিজের কাছে না থাকে, ব্যাংকে থাকে, অন্যদিকে সে অপরের নিকট ঋণী। যেহেতু ব্যাংক যাকাত কাটার সময় তার ঋণের পরিমাণ বাদ দেবে না, এজন্য ব্যাংকে রাখা টাকা-পয়সার যাকাত না কাটার দু'টি পন্থা অবলম্বন করতে পারবে।

এক. যাকাতের তারিখ আসার পূর্বেই নিজের টাকা-পয়সা ব্যাংক থেকে তুলে নেবে অথবা কারেন্ট একাউন্টে রাখবে। কারণ, কারেন্ট একাউন্টে যাকাত কাটা হয় না। এবার সে তার ঋণের পরিমাণ বাদ দিয়ে যাকাত আদায় করবে। সেভিং একাউন্টে টাকা-পয়সা না রাখা উচিত। কারণ, সেভিং একাউন্ট তো সুদী একাউন্ট। কারেন্ট একাউন্টে রাখাই উত্তম। কারণ, কারেন্ট একাউন্টে সুদ নেই, আবার যাকাতও কাটবে না।

দুই. ব্যাংকে লিখিত দেবে যে, আমি নেসাবের মালিক নই। আমার উপর যাকাত ফরয নয়। ব্যাংকিং নীতি অনুযায়ী লিখিত প্রদান করলে যাকাত কাটা হয় না।

কোম্পানির শেয়ারের যাকাত কর্তন

এক বছর পর কোম্পানির শেয়ারের মুনাফা বন্টনের সময় কোম্পানির পক্ষ থেকে যাকাত কেটে রাখে। তবে কোম্পানি যখন শেয়ারের যাকাত কর্তন করে, তখন ঐ শেয়ারের নির্ধারিত (Facevalue) মূল্যের উপর যাকাত কর্তন করে। অথচ শরীয়ত অনুযায়ী ঐ শেয়ারের বর্তমান মার্কেট মূল্যের উপর যাকাত ফরয। অতএব নির্ধারিত মূল্যের উপর যে যাকাত কাটা হল সেটাতো আদায় হয়ে গেল, কিন্তু নির্ধারিত মূল্য এবং বাজারী মূল্যের মাঝে যেই ব্যবধান আছে, তা নিজে হিসাব করে আদায় করতে হবে। শেয়ারের যাকাতের আলোচনার মধ্যে এ ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

যেমন কোন শেয়ারের নির্ধারিত মূল্য পঞ্চাশ টাকা ছিল এবং তার মার্কেট মূল্য ষাট টাকা। এখন কোম্পানি যেহেতু পঞ্চাশ টাকার যাকাত আদায় করে দিয়েছে, সেহেতু দশ টাকার যাকাত আপনাকে আলাদাভাবে আদায় করতে হবে।

কোম্পানির শেয়ার এবং এন, আই, টি, ইউনিট- দুটোর একই পদ্ধতি। অতএব যেখানেই নির্ধারিত মূল্যের উপর যাকাত কাটা হয়, সেখানেই মার্কেট মূল্যের হিসাব করে দু'টির মাঝে যে ব্যবধান রয়েছে তার যাকাত আদায় করা জরুরী।

যাকাত দেয়ার তারিখ ও সময়

এ কথাঁও জেনে রাখা প্রয়োজন যে, যাকাতের জন্য শরীয়তে কোন তারিখ ও সময় নির্দিষ্ট নেই যে, ঐ সময়ে বা ঐ তারিখে যাকাত আদায় করতে হবে। বরং প্রত্যেক ব্যক্তির যাকাতের তারিখ ভিন্ন ভিন্ন।

শরীয়তের দৃষ্টিতে যাকাতের আসল তারিখ হল, 'যেদিন সে প্রথমবার নেসাবের মালিক হয়'। যেমন কেউ মুহাররম মাসের প্রথম তারিখে জীবনের প্রথম নেসাবের মালিক হয়েছে, তাহলে মুহাররমের এক তারিখই তার যাকাতের তারিখ নির্ধারিত হবে এবং আগামীতে প্রতি বছর মুহাররমের এক তারিখে যাকাত হিসাব করতে হবে।

কিন্তু অধিকাংশ সময় স্মরণই থাকে না যে, সে কোন তারিখে প্রথমবার নেসাবের মালিক হয়েছিল। এ অপারগতার কারণে যাকাতের হিসাবের জন্য এমন তারিখ নির্দিষ্ট করে নেবে, যে তারিখে যাকাতের হিসাব করা সহজ হয়। এর পর প্রতি বছর ঐ তারিখেই যাকাত আদায় করবে। অবশ্য সতর্কতা স্বরূপ কিছু বেশি আদায় করে দেবে।

রমযান মাসের তারিখ নির্ধারণ করা যাবে কি

সাধারণত মানুষেরা রমযান মাসেই যাকাতের হিসাব করে যাকাত দিয়ে থাকে। এর কারণ এই যে, হাদীস শরীফে বর্ণিদ আছে, রমযান মাসে একটি ফরযের সাওয়াব সত্তর গুণ বৃদ্ধি হয়ে যায়। আর যাকাতও যেহেতু একটি ফরয, তাই রমযান মাসে সেটা আদায় করলে তার সাওয়াবও সত্তর গুণ বেশি পাওয়া যাবে।

যুক্তি হিসেবে কথা ঠিক আছে, আর এমন আগ্রহ থাকাটাও ভাল। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তির নেসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়ার তারিখ জানা থাকে, তাহলে শুধু সাওয়াবের আশায় রমযানের তারিখ নির্দিষ্ট করা যাবে না। অতএব তার উচিত সেই তারিখেই যাকাতের হিসাব করা, যে তারিখে সে নেসাবের মালিক হয়েছে। তবে যাকাত আদায় করতে সে এ পন্থা অবলম্বন করতে পারে যে, যাকাতের হিসাব করে টাকা বের করে রাখবে আর আদায় করবে রমযান মাসে। তাহলে তারিখও ঠিক থাকল, সাওয়াবও পাওয়া গেল।

হ্যাঁ, যদি তারিখ স্মরণ না থাকে, তাহলে রমযান মাসের কোন তারিখ নির্দিষ্ট করে নেবে। তবে সতর্কতা স্বরূপ কিছু বেশি আদায় করবে, যেন তারিখের আগে-পরে হওয়ার দ্বারা যেই পার্থক্য হয়েছে সেটা পূরণ হয়ে যায়।

একবার তারিখ নির্দিষ্ট করার পর প্রতি বছর ঐ তারিখেই যাকাতের হিসাব করবে এবং এটা দেখবে যে, এই তারিখে আমার নিকট কী কী আসবাব-পত্র আছে, নগদ টাকা-পয়সা কত রয়েছে। যদি সোনা-রূপা থাকে, তাহলে ঐ তারিখের মূল্য ধরতে হবে। যদি শেয়ার থাকে, তাহলে ঐ তারিখের শেয়ারের বাজার মূল্য ধরতে হবে। স্টককৃত মালের মূল্য নির্ধারণ করতে হলে ঐ তারিখের স্টকের বাজার মূল্য ধরতে হবে। এভাবে প্রতি বছর ঐ তারিখেই যাকাতের হিসাব করে আদায় করা উচিত। ঐ দিনের আগে পিছে না করা উচিত।

যাহোক যাকাত সম্পর্কে অল্প কিছু আলোচনা করা হল। এছাড়াও কিছু জানার থাকলে বিজ্ঞ আলেমগণের নিকট থেকে জেনে নিন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এসব বিধানাবলীর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

অনাবিল সুখের ঠিকানা

শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
অনুবাদ : মুহাম্মাদ ফজলুল করীম সিরাজী

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর– ২০০৬ ঈ.
দ্বিতীয় প্রকাশ : আগষ্ট– ২০০৭ ঈ.

সূচী

আখেরাতের অবস্থা জানার মাধ্যম-৯৭
একজন বুযুর্গের বিস্ময়কর ঘটনা-৯৭
একজন নিম্ন পর্যায়ের জান্নাতীর অবস্থা-৯৮
অনুরূপ একটি ঘটনা-৯৯
হাদীসে মুসালসাল বিযযিহক-১০১
পরকালের উদাহরণ-১০১
কে পাবে জান্নাত-১০১
হযরত আবু হুরায়রা রাযি.–এর আখেরাতের ধ্যান-১০২
জান্নাতের বাজার
জান্নাতে আল্লাহর দরবার-১০২
মেশক ও জাফরানের বৃষ্টি-১০৩
জান্নাতে সবচেয়ে বড় নেয়ামত ‘আল্লাহর দিদার’-১০৩
রূপ-সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে-১০৪
জান্নাতের নেয়ামত কল্পনার উর্ধ্বের বিষয়-১০৪
জান্নাত পেরেশান ও আতঙ্ক থেকে মুক্ত-১০৫
পৃথিবীতে জান্নাতী নিয়ামতের ঝলক-১০৫
জান্নাত খোদাভীরুদের জন্য-১০৬
জান্নাত কাঁটা তারে বেষ্টিত, জাহান্নাম কু-প্রবৃত্তি দ্বারা বেষ্টিত-১০৭
কাঁটা ফুলবাগান হয়ে যাবে-১০৮
একজন সাহাবীর জীবন দান-১০৮
লোকে যা বলে বলুক-১০৯
দ্বীনের উপর চললে সম্মান বৃদ্ধি পায়-১০৯
ইবাদতের মজা ও গুনাহ ছাড়ার কষ্ট-১১০
মা সন্তানকে কষ্ট করে লালন করে কেন-১১০
জান্নাত ও মুত্যু পরবর্তী জীবনের মুরাকাবা করুন-১১১

অনুবাদকের কথা

সবাই সুখ চায়, শান্তি চায়, ভাবনাহীন অনাবিল সুখের নির্মল জীবন চায়। কিন্তু বাস্তব সত্য হল, পৃথিবীতে এমন জীবন লাভ করা আদৌ সম্ভব নয়। পার্থিব জীবনে সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা সবই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। স্বপ্নময় এমন জীবন লাভ কেবল জান্নাতেই সম্ভব।

একমাত্র 'জান্নাত'ই হতে পারে নির্মল শান্তি ও অনাবিল সুখের ঠিকানা। বক্ষমান পুস্তিকায় সেই নেয়ামতরাজী সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা হয়েছে। এটি বর্তমান পৃথিবীর বরেণ্য ব্যক্তি শাইখুল ইসলাম মুফতী তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম–এর সাড়া জাগানো কিতাব 'ইসলাহী খুতুবাত' এর 'জান্নাত কে মানাযের' নামক বয়ানের সরল অনুবাদ।

এ পুস্তিকা পাঠ করে আমাদের অন্তরে যদি জান্নাত লাভের আশা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের তামান্না অর্জিত হয়, তবেই আমাদের এ প্রচেষ্টা সার্থক হবে।
আল্লাহ তাআলা দয়াপরবশ হয়ে আমাদের অন্তরে এ শুদ্ধ চেতনা দান করুন এবং অনাবিল সুখের ঠিকানা 'বেহেশত' নসীব করুন। আমীন ॥

মুহাম্মাদ ফজলুল কারীম সিরাজী
বাঐতারা, সাতিয়ানতলী, সিরাজগঞ্জ
১০. ১০. ০৬ ঈ.

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ

وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ

'আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন কিছু নেয়ামত প্রস্তুত করে রেখেছি, যা আজ পর্যন্ত কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কান তা শ্রবন করেনি এবং কোন মানব অন্তর তা কখনো কল্পনাও করতে পারেনি।'
(বুখারী শরীফ, হাদীস-৩০০৫)



অনাবিল সুখের ঠিকানা

আখেরাতের অবস্থা জানার মাধ্যম

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন−

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ - لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ

'এইযে জান্নাতের উত্তরাধিকারী তোমরা হয়েছ, এটা তোমাদের কর্মের ফল। সেখানে তোমাদের জন্যে রয়েছে প্রচুর ফল-মূল, তা থেকে তোমরা আহার করবে। (সূরা ৪৩ যুখরুফ, আয়াত-৭২, ৭৩)

মৃত্যুর পর কী অবস্থা হয়, তা জানার কোন উপায় মানুষের নেই। এমন কোন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শাস্ত্রও নেই, যা মানুষকে এ বিষয়ে অবগতি করাতে পারে। কেবল সে ব্যক্তিই পরকালের অবস্থা জানতে পারে, যে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে পরপারে চলে যায়। কিন্তু এরপর তার সাথে আর আমাদের কোন সম্পর্ক থাকে না। যোগাযোগ থাকে না।

একজন বুযুর্গের বিস্ময়কর ঘটনা

আমার আব্বা হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. এক বুযুর্গের ঘটনা শুনাতেন। তাঁর অনেক ভক্ত ছিল। এক ব্যক্তি তাঁকে প্রশ্ন করল, 'হুজুর! যে ব্যক্তি এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়, সে আর এ পৃথিবীর কোন খবরই নেয় না। সে কোথায় গেল, কি হল আর কি বা অবস্থার সম্মুখীন হল, তাও জানা যায় না। সুতরাং আপনি এমন একটি উপায় বলে দিন, যার মাধ্যমে আমরা মৃত্যু পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে অবগত হতে পারি।'

বুযুর্গ তাঁর ঐ মুরিদকে বললেন, 'তোমরা একটি কাজ করতে পার, আমার ইন্তেকালের পর দাফন করার সময় এক টুকরা কাগজ ও একটি কলম ভিতরে

দিয়ে দেবে। সুযোগ হলে মৃত্যু পরবর্তী জীবনের অবস্থা তোমাদেরকে জানাবো। এ কথা শুনে সবাই খুশি হয়।

কিছুদিন পর সেই বুযুর্গ ইন্তেকাল করেন। মুরিদরা তাঁর ওছিয়ত অনুযায়ী দাফনের সময় কবরের মধ্যে এক টুকরা কাগজ ও একটি কলম রেখে দেয়। দ্বিতীয় দিন তাঁর ওছিয়ত অনুযায়ী কাগজের টুকরা আনার জন্য কবরে গিয়ে দেখল, সত্যিই কাগজে কি যেন লেখা রয়েছে। কাগজটি দেখে সবাই খুশি হল এবং ভাবল, আজ আমরা মৃত্যু পরবর্তী অবস্থা জানতে পারব। কিন্তু কাগজটি উঠিয়ে দেখা গেল তাতে লেখা আছে, 'এখানের অবস্থা দেখার মত অনেক মানুষ আছে, কিন্তু বলার মত কেউ নেই।'

উল্লেখিত ঘটনাটি সত্যও হতে পারে আবার মনগড়াও হতে পারে। তবে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলার নিকট কোন কিছুই অসাধ্য নয়। কিন্তু বাস্তব সত্য হল, পরকালের অবস্থা বলার মত নয়, এটি দেখার বিষয়। মৃত্যু পরবর্তী জীবনের অবস্থা আল্লাহ তাআলা সবার থেকে এমনভাবে গোপন করে রেখেছেন যে, সামান্য পরিমাণও কেউ জানতে পারে না। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত বিষয়গুলো ছাড়া অতিরিক্ত কিছু জানার কোন পথও নেই। এখানে সে বিষয়ে কিছু বর্ণনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

একজন নিম্ন পর্যায়ের জান্নাতীর অবস্থা

হযরত মুগীরা বিন শু'বা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন− 'একদা হযরত মূসা আ. আল্লাহহ তাআলাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহ! সবচেয়ে ছোট জান্নাত ও তার অধিবাসীর অবস্থা কেমন হবে?'

আল্লাহ তাআলা উত্তরে বললেন−'হে মূসা! সকল জান্নাতী জান্নাতে প্রবেশ করার পর এবং সকল জাহান্নামী জাহান্নামে যাওয়ার পর এক ব্যক্তি জান্নাতের পাশে অবস্থান করতে থাকবে। তখন আল্লাহ তাআলা তাকে বলবেন, 'পৃথিবীতে তুমি অনেক রাজা-বাদশাহর নাম শুনেছ। সেসব বাদশাহদের মধ্য হতে চারজন বড় বাদশাহর নাম বল এবং তোমার সাধ্যমত তাদের রাজ্যের বর্ণনা দাও।'

সে ব্যক্তি বলবে, 'হে আল্লাহ! আমি পৃথিবীতে অমুক অমুক বাদশাহর নাম শুনেছি। তাদের রাজত্ব অনেক বড় ছিল। তারা অফুরান্ত নেয়ামতে নিমজ্জিত ছিল। আমার মনও তাদের মত রাজত্ব পেতে চায়।'

এরপর সে চারজন বাদশাহর নাম ও তাদের রাজত্বের বর্ণনা দেবে। তখন আল্লাহ তাআলা তাকে বলবেন, ঠিক আছে, এখন ঐসব বাদশাহরা পৃথিবীতে

যেসব আরাম-আয়েশ ভোগ করেছে, সে সম্পর্কে কিছু বর্ণনা দাও। তখন সে তার জানা অনুযায়ী তাদের আরাম-আয়েশের বিবরণ আল্লাহ তাআলাকে জানাবে।

তখন আল্লাহ তাআলা তাকে বলবেন, এসব বাদশাহদের মত রাজত্ব এবং আরাম-আয়েশ পেলে কি তুমি খুশি হবে? তখন সে আল্লাহ তাআলাকে বলবে, হে আল্লাহ! এর চেয়ে বড় নেয়ামত আর কি হতে পারে? আমি এতেই খুশি হব। পরিশেষে আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি পৃথিবীর যেসব বাদশাহদের জীবনের বিবরণ দিলে তার চেয়ে দশগুণ বেশি তোমাকে দান করলাম। অতঃপর হযরত মূসা আ. কে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'উল্লেখিত ব্যক্তি হল জান্নাতের সর্বনিম্ন পর্যায়ের জান্নাতী'।

হযরত মূসা আ. আল্লাহকে বলেন, 'হে আল্লাহ! একজন নিম্নস্তরের জান্নাতীর অবস্থা এমন হলে যারা আপনার প্রিয়, যারা জান্নাতে সর্বোচ্চ পর্যায়ের, তাদের অবস্থা কেমন হবে?' উত্তরে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে মুসা! যারা আমার প্রিয় বান্দা হবে, তাদের জন্য আমি নিজ কুদরতি হাতে জান্নাত সাজিয়ে সংরক্ষিত করে রেখেছি।'

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন– 'জান্নাতের নেয়ামতরাজী এমন, যা আজ পর্যন্ত কোন চোখ দেখেনি, কোন কান তার আলোচনা শোনেনি এবং কোন মানব অন্তর কখনো তার কল্পনাও করেনি।' এমন নেয়ামত আল্লাহ তাআলা তৈরি করে রেখেছেন।

অনুরূপ একটি ঘটনা

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সর্বশেষে জান্নাতে প্রবেশ করবে, তার অবস্থা হবে ঐ ব্যক্তির মত, যাকে তার বদ আমলের কারণে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে। সে জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে থাকবে এবং আল্লাহকে বলতে থাকবে, 'হে আল্লাহ! আমার আমল খারাপ হওয়ার কারণে জাহান্নামের এই প্রজ্জ্বলিত আগুনে শরীর একেবারে ঝলসে যাচ্ছে, আপনি দয়া করে কিছুক্ষণের জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করে দিন।'

আল্লাহ তাআলা তাকে বলবেন, 'তোমাকে এতটুকু সুযোগ দিলে তুমি আরো অতিরিক্ত সুযোগ তালাশ করবে।' তখন সে আল্লাহর নিকট এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেবে যে, 'এখান থেকে বের করে দিলে আর কিছুই আবদার করব

না।' অতঃপর আল্লাহ তাআলা তার আবেদন কবুল করবেন এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে একটু দূরে জায়গা করে দেবেন।

সেখানে কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর সে আবার বলবে, 'হে আল্লাহ! এখানেও মাঝে মাঝে আগুনের তাপ আসে। দয়া করে আরো একটু দূরে জায়গা করে দিন, যেখানে জাহান্নামের আগুনের তাপ একদম লাগবে না।' তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, 'ইতোপূর্বে তুমি ওয়াদা করেছিলে, তুমি আর কিছুই আবদার করবে না। আর এখন তার উল্টা বলছ।'

এর পরেও সে আবদারের সুরে বলবে, 'হে আল্লাহ! অল্প একটু এগিয়ে দিন, আর কিছুই আবদার করব না।' আল্লাহ তাআলা তার দাবি কবুল করে তাকে জাহান্নাম থেকে সরিয়ে জান্নাতের কাছাকাছি জায়গা দেবেন।

উক্ত ব্যক্তি সেখানে বসবাস করতে থাকবে এবং জান্নাতের নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখতে থাকবে। এক পর্যায়ে সে আল্লাহ তাআলাকে বলবে, 'হে দয়াময় আল্লাহ! আপনি আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন, ঐ যে জান্নাত দেখা যাচ্ছে, একটু অনুমতি দিন নিকটে গিয়ে জান্নাতের মনোরম দৃশ্য দেখে আসি।'

আল্লাহ তাআলা তাকে বলবেন, 'তুমি আবার ওয়াদা ভঙ্গ করলে?' উত্তরে সে বলবে, 'হে আল্লাহ! আপনি আমার প্রতি অনেক অনুগ্রহ করেছেন, আর একটি সুযোগ দিন যেন জান্নাতটা একটু দেখে নিতে পারি।' আল্লাহ তাআলা তাকে বলবেন, 'জান্নাত দেখার পর তো আবার ভিতরে প্রবেশের আবদার করবে না?' উত্তরে সে বলবে, ' আল্লাহ, এমনটি করব না। এক নজর জান্নাত দেখার সুযোগ দিলে আর কিছুই আবদার করব না।'

আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাত দেখার সুযোগ করে দেবেন। কিন্তু সে পূর্বের সব ওয়াদা ভুলে গিয়ে আল্লাহ তাআলাকে বলবে, 'হে দয়াময় আল্লাহ! আপনি জান্নাতের দরজা পর্যন্ত পৌঁছার সুযোগ দিয়েছেন, আমাকে এখন ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দিয়ে আরো বেশি অনুগ্রহ করুন।'

আল্লাহ তাআলা তাকে বলবেন, 'তুমি তো আবার ওয়াদা ভঙ্গ করলে? আচ্ছা ঠিক আছে, আমার অনুগ্রহ দ্বারা এতদূর পর্যন্ত এসেছে যখন, পরিশেষে তোমাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতিও দিলাম এবং পৃথিবীতে যেই পরিমাণ জায়গা আছে ঐ পরিমাণ জায়গা তোমাকে দান করলাম।'

তখন সে বলবে–

يَا رَبِّ أَتَسْتَهْزِئُ مِنِّي

'হে আল্লাহ! আপনি কি আমার সাথে ঠাট্টা করছেন? কোথায় আমি আর কোথায় এত বড় জান্নাত!' আল্লাহ তাআলা তাকে বলবেন, 'আমি ঠাট্টা করছি

না তোমার সাথে, সত্যি সত্যি তোমাকে এত বড় জান্নাত ও মর্যাদা দান করছি।' (মুসলিম শরীফ, হাদীস-২৭৪)

হাদীসে মুসালসাল বিযযিহক

উল্লেখিত হাদীসটি রাসূল সা. হাসিমুখে বর্ণনা করেছেন। সাহাবগণও উক্ত হাদীসটি বর্ণনার সময় হেসেছেন। এভাবে পর্যায়ক্রমে চলে আসছে। এমনকি রাসূল সা. থেকে আজ পর্যন্ত যখনই হাদীসটি বর্ণনা করা হয়, তখনই বর্ণনাকারী ও শ্রোতা সকলেই হাসে। একারণে এই হাদীসটিকে 'মুসালসাল বিয যেহক' বলা হয়। অর্থাৎ, প্রত্যেক উস্তাদ তার ছাত্রদেরকে হাদীসটি হাসিমুখে বর্ণনা করেছেন।

একটু ভেবে দেখুন, সর্বশেষে জান্নাতে প্রবেশকারীর এমন অবস্থা হলে অধিক মর্যদাসম্পন্ন জান্নাতীদের অবস্থা কেমন হবে? পৃথিবীর চার দেয়ালের মধ্যে থেকে পরকালের অবস্থা জানা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। এজন্য আমরা আশ্চর্যান্বিত হই যে, এক ব্যক্তি পুরা পৃথিবীর সমান জায়গা কীভাবে পাবে? আর পেয়েও সে কী করবে?

পরকালের উদাহরণ

পরকালের তুলনায় আমাদের এ জীবনের দৃষ্টান্ত হল মায়ের পেটের তুলনায় এ দুনিয়ার জীবনের মত। অর্থাৎ মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় যেমন পৃথিবীর জীবন সম্পর্কে অবগত হওয়া অসম্ভব, তেমনি এ পৃথিবী থেকে পরকালের পরিপূর্ণ ধারণা লাভ করাও অসম্ভব। শিশু ভূমিষ্ট হয়ে পৃথিবীতে আসার পর এর আসল পরিসর বুঝতে পারে। অনুরূপ এ পার্থিব জীবন ত্যাগ না করা পর্যন্ত আখেরাত কী তা কখনো বুঝে আসবে না।

কে পাবে জান্নাত

হযরত থানবী রহ.−এর খলীফা ডাক্তার আবদুল হাই রহ. বলতেন, 'আলহামদুলিল্লাহ! মুমিন বান্দাগণের জন্য জান্নাত সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহর উপর ঈমান থাকলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রাখতে পার যে, জান্নাত তোমাদের জন্যই। তবে জান্নাতে পৌঁছার দূর্গম রাস্তা বাধা-বিপত্তি ছাড়া অতিক্রম করতে চাইলে কিছু আমল করতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সঠিক মত আমল করার তাওফীক দান করুন এবং দয়া ও অনুগ্রহ করে জান্নাত দান করুন। আমীন।

হযরত আবু হুরায়রা রাযি.−এর আখেরাতের ধ্যান

হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়িব রহ. থেকে বর্ণিত, (তিনি বিখ্যাত একজন তাবেয়ী ও হযরত আবু হুরায়রা রাযি.-এর খাছ শাগরিদ ছিলেন) তিনি বলেন, আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ হযরত আবু হুরায়রা রাযি.−এর সাথে একদা জুমার দিন বাজারে যাচ্ছিলাম। ফেরার পথে তিনি বললেন, 'হে সাঈদ! দুআ করি আল্লাহ তাআলা যেন জান্নাতে তোমাকে ও আমাকে এক সঙ্গে বাজার করার তাওফীক দান করেন।

প্রিয় পাঠক! সাহাবায়েকেরাম দুনিয়ার কাজ করতে গিয়েও আখেরাতের চিন্তা তাজা করতেন, যেন দুনিয়ার ব্যস্ততা আখেরাতকে ভুলিয়ে না দেয়।

জান্নাতের বাজার

হযরত আবু হুরায়রা রাযি.−এর খাছ শাগরিদ সাঈদ রহ. তাঁর সম্মানিত উস্তাদকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'জান্নাতেও কি বাজার থাকবে? কারণ, আমরা তো জানি সেখানে সব কিছু বিনা মূল্যে আল্লাহ তাআলা দান করবেন।' আবু হুরায়রা রাযি. বললেন, 'জান্নাতেও বাজার থাকবে। আমি নবী কারীম সা. থেকে শুনেছি, প্রতি জুমাবার জান্নাতে বাজার বসবে।'

এর ব্যাখ্যায় রাসূল সা. বলেন, 'জান্নাতীগণ জান্নাতে যাওয়ার পর সবাই নিজ নিজ আসন গ্রহণ করে অনাবিল সুখে জীবন-যাপন করতে থাকবে। সেখানে তাদেরকে এত বেশি নেয়ামত দেয়া হবে যে, সেখান থেকে কোথাও যাওয়ার চিন্তাই আসবে না।

ইত্যবসরে হঠাৎ ঘোষণা হবে, হে জান্নাতবাসী! তোমরা সবাই আপন স্থান ত্যাগ করে জান্নাতের বাজারে চল। তখন সবাই জান্নাতের বাজারে যাবে। সেখানে গিয়ে এমন এমন জিনিস দেখবে, যা তাদের নজর কেড়ে নেবে। দোকানগুলো খাদ্যদ্রব্য ও প্রসাধনী দ্বারা এমনভাবে সাজানো থাকবে যে, তারা এ কথা বলতে বাধ্য হবে, ইতিপূর্বে এমনটি কখনো দেখিনি। বাজারটি হবে একদম ব্যতিক্রম। সেখানে পৃথিবীর মত কোন বেচা-কেনা হবে না। বরং ঘোষণা হবে, যার যা মন চায় সে তা নিয়ে নেও। এরপর তারা বাজার ঘুরে ঘুরে পছন্দ মত জিনিসপত্র নিবে।

জান্নাতে আল্লাহর দরবার

ইচ্ছামত সব কিছু নেয়া শেষ হলে আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা হবে, সবাই এখন আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হও। তাদেরকে বলা হবে, আজ

জুমাবার। এ দিনে পৃথিবীতে তোমরা একত্র হতে। আজ আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হওয়ার আহ্বান জানানো হচ্ছে। সবাই তখন সেখানে উপস্থিত হবে।

পূর্ব থেকে সকলের জন্য আসন তৈরি থাকবে। কারো আসন হবে স্বর্ণখচিত, কারো থাকবে রূপা দ্বারা নির্মিত। প্রত্যেকের মর্যাদা অনুযায়ী আসন হবে। তবে কেউ কারো আসনের প্রতি লোভনীয় দৃষ্টিতে তাকাবে না, বরং প্রত্যেকেই নিজ নিজ আসন নিয়ে সন্তুষ্ট ও প্রফুল্য থাকবে। জান্নাতে কোন আফসোস, আক্ষেপ ও লোভ থাকবে না।

সর্বনিম্ন স্তরের জান্নাতীর চেয়ারের চার পাশে মেশক-আম্বরের টিলা থাকবে। তার উপর তাকে বসানো হবে। এরপর আল্লাহ্ তাআলার দরবার শুরু হবে। হযরত ইসরাফিল আ. আল্লাহর কালাম এমন সুলোলিত ও সুমিষ্ট কণ্ঠে পাঠ করে শুনাবেন, যা পৃথিবীর সকল সুরকে তুচ্ছ করে দেবে।

মেশক ও জাফরানের বৃষ্টি

এরপর আসমানে মেঘ ছেঁয়ে যাবে। মনে হবে এখনই বৃষ্টি হবে। সবাই তা স্পষ্টভাবে দেখতে পাবে। হঠাৎ মেশক ও জাফরানের বৃষ্টি হবে। পুরা মজলিশ সুগন্ধিতে ভরে যাবে। মোহিত হবে চারিপাশ। এমন সুগন্ধি কেউ কখনো কল্পনাও করেনি।

অতঃপর আল্লাহর আদেশে একটি বাতাস প্রবাহিত হবে। সবাই এত বেশি আনন্দিত ও মোহিত হবে যে, মাথা থেকে পা পর্যন্ত তাদের সৌন্দর্য অনেক গুণে বৃদ্ধি পাবে। এরপর আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে শরবত পান করানো হবে, যা পৃথিবীর কোন শরবতের সাথে তুলনাই করা যায় না।

জান্নাতে সবচেয়ে বড় নেয়ামত 'আল্লাহর দিদার'

অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলবেন, 'হে জান্নাতবাসী! তোমাদের নেক আমল এবং ঈমানের বদৌলতে যেসব নেয়ামত আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল, তা কি তোমরা পেয়েছ? না কি কিছু বাকি আছে? তখন সকল জান্নাতী এক বাক্যে বলবে, 'হে আল্লাহ! আপনি যা দান করেছেন এর চেয়ে বেশি আর কী হতে পারে? সকল আমলের বদলা পেয়ে গেছি। আর কোন কিছু চাওয়ার নেই আমাদের।'

বর্ণিত আছে, তখন মানুষ ওলামায়ে কেরামকে তালাশ করে জিজ্ঞাসা করবে, এমন কি নেয়ামত বাকি আছে যা আমরা এখনো লাভ করিনি? তখন ওলামায়েকেরাম বলবেন, হ্যাঁ, একটি নেয়ামত বাকি রয়েছে যা আমরা এখনো পাইনি। সেটা হল 'আল্লাহর দিদার'।

অতঃপর সকল জান্নাতী এক বাক্যে আরয করবে, হে আল্লাহ! একটি মহান নেয়ামততো এখনো বাকি আছে। সেটি হল 'আপনার দিদার লাভ'। আল্লাহ্ তাআলা তখন বলবেন, হ্যাঁ, এ নেয়ামতটি এখনো বাকি আছে। এখন তা দান করা হবে। পরিশেষে 'আল্লাহর দিদার' লাভ হবে। দিদারে এলাহীতে মহান সত্ত্বার নূরের জ্যোতি যখন প্রস্ফুটিত হবে, তখন জান্নাতবাসীর নিকট পূর্বের সকল নেয়ামত তুচ্ছ মনে হবে। এরপর মজলিশ শেষ হবে এবং সবাই আপন ঠিকানায় চলে যাবে।

রূপ-সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে

জান্নাতবাসী আপন আপন স্থানে পৌঁছার পর তাদের স্ত্রী ও হুরগণ তাদের রূপ-লাবণ্য ও সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকবে এবং বিস্ময়ের সাথে বলবে–

لَقَدْ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا

'কি ব্যাপার! পূর্বে তো এমনটি ছিলে না। এমন মনমুগ্ধকর সৌন্দর্য কোত্থেকে অর্জন করলে?'

তারা উত্তরে বলবে–

وَأَنْتُمْ وَاللهِ لَقَدْ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا

'তোমাদেরকে যে অবস্থায় রেখে গিয়েছিলাম, তোমরাওতো তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি সুন্দর হয়েছ!' (মুসলিম শরীফ, হাদীস-৫০৬১)

পবিত্র হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, দিদারে এলাহীর মুহূর্তে আল্লাহর আদেশে এক মনোরম হাওয়া প্রবাহিত হওয়ার বদৌলতে নারী-পুরুষ সকলের সৌন্দর্য অনেকগুণ বৃদ্ধি পাবে।

মোটকথা, এ ছিল জান্নাতে জুমাবারে আল্লাহ তাআলার দরবারের সামান্য এক চিত্র, যেখানে আল্লাহ তাআলা আপন রহমতে তাঁর নেক বান্দাগণকে এ নিয়ামতে ভূষিত করবেন। হে আল্লাহ! এ মহান নেয়ামত আমাদেরকেও দান করুন। আমীন।

জান্নাতের নেয়ামত কল্পনার উর্ধ্বের বিষয়

পৃথিবীর কোন সাহিত্যিক, কোন ভাষাবিদ, কোন শিল্পী জান্নাতের প্রকৃত চিত্র চিত্রায়িত করতে পারবে না।

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ

'আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন কিছু নেয়ামত প্রস্তুত করে রেখেছি, যা আজ পর্যন্ত কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কান তা শ্রবন করেনি এবং কোন মানব অন্তর তা কখনো কল্পনাও করতে পারেনি।'

(বুখারী শরীফ, হাদীস-৩০০৫)

এজন্য ওলামায়ে কেরাম বলেন, জান্নাতের নাজ-নিয়ামতের নাম পৃথিবীর নামের মত হলেও তার বাস্তবতা আমরা অনুধাবন করতে পারব না যে, খেজুরগুলো কেমন হবে, আঙ্গুরের স্বাদ কেমন হবে ইত্যাদি। মোটকথা, পার্থিব জগত থেকে পরকালের ধারণা অর্জন করা কখনোই সম্ভব নয়।

জান্নাত পেরেশান ও আতঙ্ক থেকে মুক্ত

জান্নাতের নেয়ামতরাজীর মধ্যে সবচেয়ে বড় নেয়ামত যা পৃথিবীতে কল্পনাও করা যায় না, তা হল সেখানে চিন্তা-ভাবনা, ভয়-ভীতি ইত্যাদি কিছুই থাকবে না। যা এ পার্থিব জগতে সর্বদাই লেগে আছে। সেখানে অতীত নিয়ে কোন চিন্তা থাকবে না, ভবিষ্যত নিয়েও কোন শঙ্কা থাকবে না।

মোটকথা, এটি এমন একটি নেয়ামত যা দুনিয়াতে মানুষের ভাগ্যে কখনো জোটে না। পৃথিবীকে আল্লাহ তাআলা এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, এখানে কোন খুশি পরিপূর্ণ নয়, কোন স্বাদ স্থায়ী নয়। স্বাদের সাথে বিস্বাদ জড়িত, আনন্দের সাথে বেদনা জড়িত। শুধু সুখ ও শান্তির জায়গা হল জান্নাত।

উদাহরণতঃ কেউ অত্যধিক উন্নত খাবার খাচ্ছে। খানা খুব মজাও হয়েছে। কিন্তু অধিক খেলে বদ হজম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এভাবে প্রতিটি সুখ, প্রতিটি আনন্দের সাথে কিছু সমস্যা আছেই আছে। পৃথিবীর বাস্তবতা এমনই।

কিন্তু আল্লাহ তাআলা জান্নাতকে সকল চিন্তা-ভাবনা, পেরেশানী এবং আতঙ্ক থেকে মুক্ত রেখেছেন। সেখানে সকলের সকল চাহিদা পূর্ণ করা হবে।

পৃথিবীতে জান্নাতী নিয়ামতের ঝলক

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, জান্নাতীদের সকল চাহিদা পূর্ণ করা হবে। উদাহরণ স্বরূপ কারো আনারের জুস খেতে ইচ্ছে হল, তখন তাকে আনার এনে রস করে জুস বানানোর প্রয়োজন হবে না। বরং ইচ্ছা করা মাত্র আনারের জুস তার সামনে এসে উপস্থিত হবে।

জান্নাতের কিছু নিদর্শন আল্লাহ তাআলা এই পৃথিবীতেও রেখেছেন। এক সময় মানুষ জান্নাতের আলোচনা শুনলে বিস্ময়বোধ করত, অবিশ্বাস্য ভাবত। কথার তেলেসমাতি মনে করত। কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বর্তমান যুগে মানুষের বুঝে এসেছে যে, এটা অসম্ভব কিছু নয়।

বর্তমান পৃথিবীতে মানুষ তার সীমিত জ্ঞান-বুদ্ধির দ্বারা এমন কিছু অসাধ্য সাধন করেছে, যা আজ থেকে একশত বছর পূর্বে বললে মানুষ তাকে পাগল বলত। একশত বছর দূরের কথা, বিশ বছর পূর্বেও যদি কেউ বলত, এমন মেশিন আবিস্কার হচ্ছে, যা এক মিনিটেই তোমার চিঠি এখান থেকে আমেরিকা পৌঁছে দেবে, তাহলে এ জাতীয় মন্তব্যকারীকে সকলেই পাগল বলত। কারণ, কোথায় আমাদের দেশ আর কোথায় সুদূর আমেরিকা। যেখানে বিমান যোগে পৌঁছতেও বিশ থেকে বাইশ ঘণ্টা সময় লেগে যায়, সেখানে এক মিনিটেই চিঠি পৌঁছবে কি করে?

কিন্তু আল্লাহ তাআলা মানুষকে এই সীমিত জ্ঞান-বুদ্ধির দ্বারা ফ্যাক্স, ইন্টারনেট ইত্যাদি অত্যাধুনিক যোগাযোগ মাধ্যম আবিস্কার করার তাওফীক দান করেছেন, যা মিনিটের মধ্যেই চিঠি পৌঁছে দিচ্ছে আমেরিকায়। এখানে বসে বসে আমেরিকার বসবাসকারীদের সাথে সরাসরি কথা বলা যাচ্ছে।

প্রিয় পাঠক! সীমিত জ্ঞানের অধিকারী মানুষ যদি মুহূর্তের মধ্যে তাদের জরুরী বার্তাকে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পৌঁছাতে পারে, তাহলে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহ তাআলা কি এমন সরঞ্জাম প্রস্তুত করে রাখতে পারেন না, যার দ্বারা বান্দার অন্তরের চাওয়া তাৎক্ষণিকভাবে পুরা করা সম্ভব হয়? অবশ্যই আল্লাহ তাআলা সক্ষম, কারণ তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

জান্নাত খোদাভীরুদের জন্য

সাধারণ মানুষ কোন জিনিসের বাস্তবতা জানা ছাড়া তা বিশ্বাস করে না। চাই তা যত উঁচু মানেরই হোক না কেন। কিন্তু আম্বিয়ায়ে কেরামকে আল্লাহ তাআলা এমন জ্ঞান দান করেছেন, যা পৃথিবীতে অন্য কাউকে দান করেননি। তাঁরা আমাদেরকে জান্নাত ও জান্নাতের নেয়ামতসমূহের খবর সঠিকভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। এর চেয়ে নিশ্চিত খবর আর কি হতে পারে? তাঁদের সকল খবর সত্য, জান্নাত সত্য, জান্নাতের নেয়ামতও সত্য।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَسَارِعُوْا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ

'তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে ছুটে যাও, যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও জমিনের বরাবর। এ জান্নাত মুত্তাকী, খোদাভীরু ও পরহেযগারদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। যারা আল্লাহর হুকুম-আহকাম সঠিকভাবে পালন করে।' (সূরা ৩ আলে ইমরান, আয়াত-১৩৩)

জান্নাত কাঁটা তারে বেষ্টিত, জাহান্নাম কু-প্রবৃত্তি দ্বারা বেষ্টিত

জান্নাতের নেয়ামতরাজি অফুরান্ত। এ সম্পর্কে একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন–

حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ

'নিশ্চয় জান্নাত এমন কিছু বস্তু দ্বারা বেষ্টিত, যা মানুষের জন্য বাহ্যিক দৃষ্টিতে কষ্টকর।' (মুসলিম শরীফ, হাদীস-৫০৪৯)

যেমন একটি আলিশান মহল। তার চারপাশে কাঁটা তারের বেড়া। বাড়ীতে প্রবেশ করে মহলের আরাম আয়েশ ভোগ করতে চাইলে কাঁটা তারের বেড়া অতিক্রম করতেই হবে। অন্যথায় সে আরাম আয়েশ ও সুখের উপকরণ ভোগ করা সম্ভব নয়।

এমনিভাবে আল্লাহ তাআলা জান্নাতের চারপাশে কষ্টের কাঁটা তার দিয়ে বেড়া দিয়েছেন, যা মানুষ করতে কষ্টকর মনে করে। যেমন আল্লাহ তাআলা ফরয-ওয়াজিব ইত্যাদি ইবাদত জরুরী করে দিয়েছেন। মুয়াজ্জিন আযান দিলে সব কাজ ফেলে রেখে মসজিদে যেতে সাময়িক কষ্ট মনে হয়। আবার কিছু কিছু কাজ করতে মন চায়, কিন্তু শরীয়তের দৃষ্টিতে সেগুলো হারাম ও গুনাহের কাজ হওয়ার কারণে তা থেকে বিরত থাকতে হয়। যেমন, অপাত্রে দৃষ্টি দেয়া, বেগানা মহিলাকে দেখা, টিভি সিনেমা ইত্যাদি দেখা। কিন্তু বাহ্যতঃ তা থেকে বিরত থাকা কষ্টকর। কারণ, মন এগুলো করতে চায়। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এগুলো করতে নিষেধ করেছেন। বন্ধু মহলে কারো আলোচনা উঠলে তার গীবত করতে মন চায়। কিন্তু যবান সংযত করতে বলা হয়েছে এবং গীবত ইত্যাদি গুনাহ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। এগুলোই কাঁটা তারের বেড়া, যা জান্নাতের চার পাশে দেয়া রয়েছে। জান্নাতে প্রবেশ করতে হলে এগুলো পারি দিতে হবে। এছাড়া জান্নাত অর্জন করা সম্ভব নয়।

হাদীস শরীফে একটি বাক্যে বলা হয়েছে–

حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ

'দোযখকে কুপ্রবৃত্তি দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে।'

অর্থাৎ দোযখকে এমন আলোকসজ্জা ও চাকচিক্য বস্তু দ্বারা ঘিরে দেয়া হয়েছে, যেসব কাজ করতে মন আগ্রহী। কিন্তু তার অন্তরালে রয়েছে ভয়াবহ আগুন আর আগুন।

কাঁটা ফুলবাগান হয়ে যাবে

জান্নাতের চার পাশে কাঁটার বেড়া থাকলেও আল্লাহ তাআলা এই কাঁটাকে এমন করে বানিয়েছেন যে, যদি কেউ দৃঢ়তার সাথে হিম্মত করে তা অতিক্রম করা শুরু করে, তাহলে আল্লাহ তাআলা সে কাঁটাকে ফুলে রূপান্তরিত করে দেবেন। দূর থেকে দেখতে কাঁটা মনে হলেও হিম্মতের সাথে কাছে গেলে দেখা যাবে, বিশাল ফুলের বাগান কাঁটা তারের আড়ালে ঢাকা ছিল। তখন সে চিন্তা করবে, আমাকে এ কাঁটা তার পাড়ি দিয়ে ফুল বাগানে প্রবেশ করতেই হবে। তার এই মনোবল ও হিম্মতের কারণে আল্লাহ তাআলা কাঁটাগুলো ফুলে রূপান্তর করে দেন।

একজন সাহাবীর জীবন দান

জনৈক সাহাবী জিহাদে শরীক হয়ে দেখলেন, শত্রুবাহিনী মুসলমানদের উপর এমন মারাত্মকভাবে আক্রমণ চালাচ্ছে যে, তা থেকে রক্ষার কোন পথ নেই। হঠাৎ তার মুখ উচ্চারিত হল, 'আর কাল ক্ষেপণ নয়, এখন প্রেমাস্পদ ও বন্ধুদের সাথে মিলনের সময় এসেছে।' অর্থাৎ এখন নিজের জীবনকে আল্লাহর পথে উৎসর্গ করলে প্রিয় নবী সা. ও সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরকালে সাক্ষাত লাভ হবে।

যুদ্ধে আগুন ও রক্তের খেলা চলছিল। আহতরা ছটফট করছিল। এ সব নিজ চোখে দেখে জান দেয়ার কথা ভাবা কম কথা নয়। এরপরও তিনি হাসিমুখে তা গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

হাদীসে এসেছে, 'আল্লাহর রাস্তায় কেউ শহীদ হলে তার এতটুকুও কষ্ট হয় না, যতটুকু কষ্ট পিপিলিকা কামড় দিলে হয়।'

এই জীবন দান মূলতঃ জান্নাতে পৌঁছার মাঝে কাঁটা তারের একটি বেড়া ছিল। যা পারি দেয়া কঠিন ছিল। কিন্তু যখন দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল যে, আল্লাহর দেয়া এ জান আল্লাহর পথেই বিলিয়ে দেয়া উচিত, তখন আল্লাহ তাআলা তার পথের কাঁটাকে ফুলে রূপান্তরিত করে দিয়েছেন। একারণে তার জন্য মৃত্যু একেবারেই সহজ হয়ে গেছে। বিছানায় মৃত্যুবরণ করলে না জানি কত কষ্ট হত।

লোকে যা বলে বলুক

দূর থেকে হীনমন্যতা নিয়ে দেখলে কাঁটা কাঁটাই থেকে যায়। পক্ষান্তরে কেউ সাহস নিয়ে অগ্রসর হলে কাঁটা ফুলে রূপান্তর হয়ে যায়। উল্লেখিত ঘটনাটি তার উজ্জ্বল প্রমাণ।

কেউ কেউ মনে করে যে, শরীয়তের অমুক হুকুম পালন করলে অথবা অমুক গুনাহ থেকে বিরত থাকলে তা কষ্টকর হবে এবং মানুষ আমাকে মন্দ বলবে, তিরস্কার করবে? লোকে বলবে, হুজুর হয়ে গেছে, সামাজিকতা বলতে তার মধ্যে কিছুই নেই। ধর্মান্ধ। আধুনিকতা বলতে কিছুই বোঝে না। এ জাতীয় অনেক ভৎসনার ভয় হয়। তাদের এ ভৎসনা মেনে নিয়ে তাদেরকে বলুন যে, আমরা হুজুর হয়ে গেছি, সামাজিকতা ও আধুনিকতা বলতে তেমন কিছু জানি না, আমরা এমন বেক ডেটেড যা রাসূলুল্লাহ সা.–এর সুন্নাতের দিকে পথ প্রদর্শন করে।

মনে রাখা দরকার যে, এসবই কাঁটা। জান্নাতে পৌঁছার রাস্তায় যেসব কাঁটা আছে এগুলোও তার অন্তর্ভূক্ত। হ্যাঁ, হাসিমুখে এসব কাঁটা একবার মেনে নিতে পারলে, ধীরে ধীরে এ সব কাঁটা ফুলে পরিণত হবে।

দ্বীনের উপর চললে সম্মান বৃদ্ধি পায়

আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছেন, যারা মানুষকে ভৎসনা করে এবং দ্বীনের উপর চলার কারণে বাঁকা চোখে দেখে, পরিণামে তাদের জীবন সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং এক পর্যায়ে তাদের জবান স্তব্ধ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যারা দ্বীনের উপর চলে, আল্লাহর হুকুমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়, রাসূল সা.–এর সুন্নাত অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে, ইজ্জত-সম্মান তাদের পদচুম্বন করে।

মুনাফিকরা মুসলমানদেরকে তাচ্ছিল্যভরে বলত, আমরাই ইজ্জতের হকদার। আর তোমরা লাঞ্ছিত। মদীনায় গেলে তোমাদেরকে তাড়িয়ে দেয়া হবে। তাদের এ ভৎসনার জবাবে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

'সম্মান তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনদের জন্যই। কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।' (সূরা ৬৩ মুনাফিকুন, আয়াত-৮)

ইবাদতের মজা ও গুনাহ ছাড়ার কষ্ট

জান্নাতের চারপাশে যেসব কাঁটা রয়েছে তা পরীক্ষার জন্য। নিকটে গেলে দেখা যাবে তা ফুলে পরিণত হয়েছে। অতঃপর ইবাদত করতে বাহ্যিক দৃষ্টিতে কষ্টকর মনে হলেও তাতে এত বেশি স্বাদ ও মজা পাওয়া যাবে, যা অন্য কোন কিছুতেই পাওয়া যাবে না।

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, 'নামায আমার চোখের শীতলতা।' অর্থাৎ, নামায ইবাদত হলেও আল্লাহ তাআলা এর মাধ্যমে আমাকে এত বেশি স্বাদ ও আনন্দ লাভ করার তাওফীক দিয়েছেন যে, পৃথিবীর অন্য কিছুতে এমন স্বাদ ও আনন্দ অনুভূত হয়নি।

গুনাহ পরিহার করতে অবশ্যই কষ্ট হয়, অন্তরে চোঁ লাগে। তবে এটা সাময়িক কষ্ট। এ কষ্ট মেনে নিয়ে কেউ যদি আল্লাহকে রাজি-খুশি করার জন্য এ ত্যাগ স্বীকার করে এবং গুনাহ পরিহার করে– প্রথম পর্যায়ে কষ্ট হলেও– পরিশেষে সে অনাবিল সুখ লাভ করবে। তবে শর্ত হল, এ চেষ্টা ও সাধনা শুধুমাত্র আল্লাহকে পাওয়ার জন্যই হতে হবে।

মা সন্তানকে কষ্ট করে লালন করে কেন

দেখুন একজন দরদী মা প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও আরামের বিছানা ছেড়ে সন্তানের পেশাব-পায়খানা পরিস্কার করে। ঠাণ্ডা পানি দিয়ে তার বিছানা ধৌত করে। লক্ষণীয় বিষয় হল, গভীর রাতে ঘুমের মুহূর্তে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে এসব করা কত কষ্টকর। এরপরও একজন দরদী মা এসব করে এবং তাতে কষ্টও হয়। কিন্তু সে যখনভাবে যে, আমার বাচ্চার জন্যই এসব করছি। তখন সে এই কষ্টের মাঝেও সুখ অনুভব করে। পরম প্রশান্তি লাভ করে। যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

এমতাবস্থায় কেউ যদি ঐ শিশুর মাকে বলে, সন্তান নিয়ে তোমাকে অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়। কোন উপায়ে সন্তান তোমার হাতছাড়া হয়ে গেলে তুমি বেঁচে যেতে, কষ্ট-ক্লেশ থেকে নিঃস্কৃতি পেতে। উত্তরে দরদী মা অবশ্যই বলবে, এর চেয়ে আরো বেশি কষ্ট করতে রাজি আছি, তবুও সন্তান হাতছাড়া করতে পারব না।

মায়ের এ দৃঢ়চেতা মন্তব্যের কারণ হল, সন্তানের প্রতি তার অগাধ মুহাব্বত। এ মুহাব্বত ও ভালবাসার কারণেই একজন মা শত কষ্টের মধ্যেও শান্তি পায়। অনুরূপভাবে কারো অন্তরে আল্লাহর ভালবাসা থাকলে, তার প্রতি মুহাব্বত থাকলে, সেই ভালবাসা ও মুহাব্বতের কারণে নফসের বিরোধিতা

করে যে শান্তি লাভ করে, তা নফসের কামনা-বাসনা পূরণের মধ্যে কক্ষনো হাসেল হয় না।

জান্নাত ও মুত্যু পরবর্তী জীবনের মুরাকাবা করুন

কুরআন ও হাদীস জান্নাতের নেয়ামতরাজী ও আরাম-আয়েশের আলোচনায় ভরপুর। এর একমাত্র কারণ হল, মানুষ যেন সেসব নেয়ামত অর্জন করার জন্য চেষ্টা করে এবং সব ধরনের কষ্টকে স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকে।

বুযুর্গানে দ্বীন জান্নাত লাভের পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে, মাঝে মাঝে জান্নাতের নেয়ামতরাজীর কথা স্মরণ করবে। যেন অন্তরে তা অর্জন করার ইচ্ছা জাগ্রত হয় এবং তার জন্য সব কষ্ট হাসিমুখে স্বীকার করা সহজ হয়।

হাকীমুল উম্মাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. 'মাওয়ায়েজে আশরাফিয়া' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, প্রতিটি মুসলমানের উচিত প্রতি দিন কিছু সময় বসে জান্নাত, জান্নাতের নেয়ামত এবং আখেরাতের ধ্যানে মগ্ন থাকা। এভাবে মুরাকাবা করবে যে, আমি পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আমাকে অন্ধকার কবরে রাখা হচ্ছে। আমাকে কবরে রেখে আত্মীয়-স্বজন সবাই চলে যাচ্ছে। অতঃপর আখেরাতে উপস্থিত হচ্ছি। হিসাব-নিকাশ শুরু হচ্ছে। 'মিজান' তথা ইনসাফের দাঁড়িপাল্লা প্রতিষ্ঠিত। পুলছিরাত আপন স্থানে অবস্থিত। একদিকে জান্নাত। অপরদিকে জাহান্নাম। জান্নাতে অমুক অমুক নেয়ামত রয়েছে। আর দোযখে অমুক অমুক যন্ত্রণাদায়ক আযাব ও শাস্তি রয়েছে।

এভাবে প্রতি দিন কিছু সময় নির্জনে বসে ধ্যানে মগ্ন থাকবে। কারণ, আমরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দুনিয়াবী কাজে লিপ্ত থাকায় আখেরাত থেকে সম্পূর্ণ গাফেল হয়ে গেছি। আলহামদুলিল্লাহ! আমাদের অন্তত এ বিশ্বাস ও আকীদা আছে যে, পৃথিবী থেকে এক দিন যেতে হবে। আখেরাত আমাদের সম্মুখে। কিন্তু শুধু বিশ্বাস ও আকীদা যথেষ্ট নয়। বরং তা সার্বক্ষণিক মনে প্রাণে স্মরণ রাখতে হবে। ধ্যান ও মুরাকাবা করতে হবে। কারণ, আখেরাত, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদির ধ্যান ও মুরাকাবা মানুষকে আল্লাহর হুকুমের প্রতি আনুগত্যশীল বানায় এবং গুনাহ থেকে বিরত থাকতে সহায়তা করে। আর জান্নাতের নেয়ামতসমূহ বর্ণনা করার উদ্দেশ্যও কেবল এটাই যে, আল্লাহর

বান্দারা যেন তাঁর হুকুম পালন করে এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে। নির্মাণ করে পাপ মুক্ত নির্মল জীবন।

হে আল্লাহ! আপনি নিজ দয়া ও রহমতে আমাদের সকলকে জান্নাত, জান্নাতের নেয়ামত দান করুন। দোযখ, দোযখের ভয়াবহ শাস্তি এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের ধ্যান ও মুরাকাবা করার তাওফীক দান করুন। পরিশেষে আমাদেরকে 'অনাবিল সুখের ঠিকানা' জান্নাত দান করুন। আমীন ॥

প্রিয়জনের অধিকার

শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
অনুবাদ : আবু যুবায়ের মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ
প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর– ২০০৬ ঈ.

সূচী

আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার গুরুত্ব-১১৭
'হক' আদায় করার নাম 'শরীয়ত'-১১৯
মানবজাতি পরস্পরের আত্মীয়-১১৯
পরস্পরের হক আদায়ের মধ্যে প্রশান্তি নিহিত-১১৯
আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য উত্তম আচরণ কর-১২০
মূলনীতি-১২০
কৃতজ্ঞতা ও প্রতিদানের অপেক্ষা করিও না-১২১
আত্মীয়তা রক্ষাকারী কে-১২১
কুসংস্কার আমাদেরকে ঘিরে ধরেছে-১২২
উৎসব-অনুষ্ঠানে 'নিওতা' দেয়া হারাম-১২২
হাদিয়া কোন উদ্দেশ্যে দেবে-১২৩
হাদিয়া কোন উদ্দেশ্যে দিয়েছে তা বোঝার পদ্ধতি-১২৩
হাদিয়া উত্তম ও বৈধ সম্পদ-১২৪
হাদিয়ার আশা করলে তা বরকতপূর্ণ হয় না-১২৪
একজন বুযুর্গের ঘটনা-১২৫
হাদিয়া দাও মুহাব্বত বৃদ্ধি কর-১২৬
জিনিস দেখ না আবেগ দেখ-১২৬
এক বুযুর্গের হালাল উপার্জন দ্বারা দাওয়াত-১২৭
হাদিয়া হিসেবে সমাজের রুসমি জিনিস না দেয়া-১২৭
এক বুযুর্গের আশ্চর্য হাদিয়া-১২৮
হাদিয়া দেয়ার জন্য জ্ঞান প্রয়োজন-১২৮
সব কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কর-১২৯
আত্মীয়-স্বজন বিচ্ছুর মত-১২৯
আত্মীয়-স্বজনের সাথে রাসূল সা.-এর আচরণ-১৩০
মাখলুক থেকে সদাচরণের আশা ছেড়ে দাও-১৩০
পৃথিবী শুধু কষ্টই দেয়-১৩১
আল্লাহওয়ালাগণের অবস্থা-১৩১
জনৈক বুযুর্গের ঘটনা-১৩১
আল্লাহওয়ালাগণের প্রশান্তি-১৩২

অনুবাদকের কথা

মারা-মারি, হানা-হানি, ঝগড়া-বিবাদ ও আত্মকলহে আমাদের জীবন সাক্ষাত অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়েছে। হিংসা-বিদ্বেষ ও গীবত-পরনিন্দায় অতিষ্ট জীবন। ভ্রাতৃত্ব ও প্রীতি-সৌহার্দের পরিবর্তে বেড়েই চলছে দূরত্ব ও প্রান্তিকতা। যে সব কারণে আজ আমরা এ জ্বলন্ত অগ্নিতে জ্বলছি, তার অন্যতম কারণ হল আমাদের পরস্পরের অধিকারের প্রতি অবহেলা। আজ আমরা সবাই নিজের অধিকারের ক্ষেত্রে তৎপর হলেও আমার নিকট অন্যের অধিকার রয়েছে– সে বিষয়ে আমাদের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই, মাথা ব্যথা নেই। যার ফলে অনাকাঙ্খিত হলেও– অনিবার্য পরিণতি ভোগ করতে হচ্ছে আমাদেরকে।

'প্রিয়জনের অধিকার' আমাদেরকে সুখময় জীবনের নতুন এক দিগন্ত উন্মোচিত করুক এ প্রত্যাশা।

আল্লাহ তাআলা আমাদের এ খেদমতটুকু কবুল করুন। আমীন।

আবু যুবায়ের মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ
একডালা, নাটোর
১১.১১.০৬ ঈ.

'তুমি কি আমার এই ঘোষণার উপর রাজি নও যে, আমি মানব জাতিকে এ কথা জানিয়ে দেব, 'যারা তোমার হক নষ্ট করবে, তাদেরকে আমি শাস্তি দেব এবং তাদের হকও আমি আদায় করব না।' উত্তরে 'আত্মীয়তা' বলল, 'হে প্রভু! আমি এই ঘোষণার উপর রাজি।' আল্লাহ তাআলা বললেন, 'আমি তোমাকে সম্মান ও মর্যাদা দান করলাম এবং মানব জাতির মধ্যে ঘোষণা করছি যে, যারা আত্মীয়তা ঠিক রাখবে এবং আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করবে, তাদের সঙ্গেও আমি উত্তম আচরণ করব। আর যারা আত্মীয়তার হক নষ্ট করবে এবং অধিকার খর্ব করবে, তাদের হক ও অধিকারের ব্যাপারেও আমি লক্ষ্য রাখব না।'



প্রিয়জনের অধিকার

আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার গুরুত্ব

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ –

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ

'ক্ষমতা লাভ করলে সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। এদের প্রতিই আল্লাহ তাআলা অভিসম্পাত করেন, অতঃপর তাদেরকে বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন করেন।'

(সূরা ৪৭ মুহাম্মাদ, আয়াত-২২-২৩)

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, হুজুর সা. ইরশাদ করেন–

خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحِمُ فَأَخَذَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمٰنِ

'আল্লাহ তাআলা মানব জাতিকে সৃষ্টি করার পর আত্মীয়তা ও পারস্পরিক সম্পর্ক আল্লাহ তাআলার আরশের খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে যায়।'

(বুখারী শরীফ, হাদীস-৪৪৫৫)

প্রশ্ন হল– 'আত্মীয়তা ও পারস্পরিক সম্পর্ক' দাঁড়ালো কীভাবে? উত্তর এই যে, এটা এমন একটি বিষয়, যা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই শুধু জানেন। আমরা তার প্রকৃত অবস্থা বলতে পারব না। কারণ, 'আত্মীয়তা' শরীর বিশিষ্ট কোন বস্তু নয়। কিন্তু মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলার পক্ষে শরীরবিহীন বস্তুকে শরীর দান করা মোটেই কঠিন কিছু নয়। আখেরাতে আল্লাহ তাআলা এমনটি করবেন।

মোটকথা 'আত্মীয়তা' আল্লাহর আরশের খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে আরয করল, 'হে আল্লাহ! আমি নিজের হক নষ্ট হওয়া থেকে আশ্রয় চাইতেছি।' অর্থাৎ মানুষ

পৃথিবীতে আমার হক ও অধিকার নষ্ট করবে তা থেকে আমি আশ্রয় চাইতেছি, যেন কেউ আমার হক নষ্ট না করে।

উত্তরে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তুমি কি আমার এই ঘোষণার উপর রাজি নও যে, আমি মানব জাতিকে এ কথা জানিয়ে দেব, 'যারা তোমার হক নষ্ট করবে, তাদেরকে আমি শাস্তি দেব এবং তাদের হকও আমি আদায় করব না।' উত্তরে 'আত্মীয়তা' বলল, 'হে প্রভু! আমি এই ঘোষণার উপর রাজি।' আল্লাহ তাআলা বললেন, 'আমি তোমাকে সম্মান ও মর্যাদা দান করলাম এবং মানব জাতির মধ্যে ঘোষণা করছি যে, যারা আত্মীয়তা ঠিক রাখবে এবং আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করবে, তাদের সঙ্গেও আমি উত্তম আচরণ করব। আর যারা আত্মীয়তার হক নষ্ট করবে এবং অধিকার খর্ব করবে, তাদের হক ও অধিকারের ব্যাপারেও আমি লক্ষ্য রাখব না।'

হুজুর সা. হাদীসটি বর্ণনা করে বললেন, হে আমার উম্মাত! তোমরা চাইলে পবিত্র কুরআনের এই আয়াতটি পড়ে নাও, যেই আয়াতে আল্লাহ তাআলা মানব জাতিকে সম্বোধন করে বলেন– 'ক্ষমতা লাভ করলে সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। এদের প্রতিই আল্লাহ তাআলা অভিশম্পাত করেন, অতঃপর তাদেরকে বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন করেন।' (সূরা ২৭ মুহাম্মাদ, আয়াত-২২-২৩)

উল্লেখিত হাদীসটি বাস্তবে ঐ সমস্ত আয়াতের তাফসীর, যে সমস্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা বারবার আত্মীয়তার হক সম্পর্কে লক্ষ্য রাখার নির্দেশ দিয়েছেন যে, 'আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সদাচরণ কর।'

বিয়ের খুতবায় রাসূল সা. কুরআনের এই আয়াত তেলাওয়াত করতেন–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

'হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক নফস থেকে। আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের কাছে চাও। আর ভয় কর রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক।'

(সূরা ৪ নিসা, আয়াত-১)

সুতরাং যখন কোন ব্যক্তি অন্যের থেকে তার অধিকার চায়, তখন আল্লাহর উছিলা দিয়ে তা চায় যে, আল্লাহর ওয়াস্তে আমার অধিকার আমাকে দাও।

আত্মীয়-স্বজনের হক নষ্ট হলে আখেরাতে রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। পবিত্র কুরআন ও রাসূলুল্লাহ সা.-এর অসংখ্য হাদীসে আত্মীয়-স্বজনদের হক সঠিকভাবে আদায় করার বর্ণনা এবং তার গুরুত্বের আলোচনা দ্বারা ভরপুর।

‘হক’ আদায় করার নাম ‘শরীয়ত’

‘হক’ আদায় করার অপর নাম ‘শরীয়ত’। শরীয়তে হক দুই প্রকার। ১. ‘হক্কুল্লাহ’। আল্লাহর হক। ২. ‘হক্কুল ইবাদ’। বান্দার হক। বিভিন্ন বান্দার হক বিভিন্ন রকমের। পিতা-মাতার হক, বিবির হক, স্বামীর হক, সন্তানের হক, আত্মীয়-স্বজনদের হক, প্রতিবেশিদের হক, সফর সঙ্গীদের হক ইত্যাদি হক দ্বারা শরীয়ত ভরপুর।

উল্লেখিত হকসমূহ থেকে কারো হক আদায়ে বিঘ্ন ঘটলে শরীয়তের আমল অসম্পূর্ণ এবং দ্বীন অসম্পুর্ণ থাকবে। যদি কেউ আল্লাহর হক আদায় করল, কিন্তু আল্লাহর বান্দার হক আদায় করল না, তাহলে তাহার দ্বীন পরিপূর্ণ হল না এবং দ্বীনের উপর আমল সম্পূর্ণ হল না। হক্কুল ইবাদ তথা বান্দার হকের মধ্যে আত্মীয়-স্বজনদের হকও অন্তর্ভূক্ত।

মানবজাতি পরস্পরের আত্মীয়

আদম সন্তান তথা মানবজাতি পরস্পরের আত্মীয়। হাদীস শরীফেও রাসূল সা. থেকে এ ব্যাপারে বর্ণনা রয়েছে। কারণ, মানব জাতির পিতা একজন। আদম আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সমস্ত মানুষ তাঁর থেকে জন্মগ্রহণ করেছে। শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হয়েছে। গোত্র ভাগ হয়েছে। কেউবা অন্যত্র গিয়ে বসতি স্থাপন করেছে। এভাবে আত্মীয়তার মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। যার কারণে পরস্পরে একে অপরকে আত্মীয় মনে করে না। নচেত বাস্তবে সমস্ত মানবজাতি একে অপরের আত্মীয়। তবে কেউ সম্পর্কে নিকটতম আর কেউ বা দূরবর্তী। তবে পরস্পরে সবাই আত্মীয়।

পরস্পরের হক আদায়ের মধ্যে প্রশান্তি নিহিত

যারা নিকটতম আত্মীয়, সামাজিকভাবে যাদেরকে আত্মীয় মনে করা হয়, যেমন, ভাই-বোন, চাচা-ফুফা, স্বামী-স্ত্রী, খালা-খালু, মামা-মামী, পিতা-মাতা। আল্লাহ তাআলা এদের কিছু বিশেষ হক ও অধিকার নির্ধারণ করেছেন। হক নির্ধারণ করার কিছু কারণও রয়েছে। এদের হকসমূহ পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় করলে সমাজ-সংসারে শান্তি, আনন্দ, নিরাপত্তা এবং পরস্পর ভালবাসা প্রতিষ্ঠিত হবে। পক্ষান্তরে প্রাপ্ত হকদারের হক সঠিকভাবে আদায় না করলে

পরস্পরে ঝগড়া-বিবাদ, মারা-মারি, হানা-হানি ও শত্রুতা সৃষ্টি হবে। দূরত্ব ও অশান্তি বৃদ্ধি পাবে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বিশেষভাবে ইরশাদ করেন, ‘তোমরা তাদের হক ও অধিকার আদায় করলে তোমাদের জীবনে শান্তি আসবে।’

‘বংশ’ সমাজের ভিত্তি। যদি কোন বংশের মধ্যে একতা না থাকে এবং বংশীয় পরিবার-পরিজনদের মধ্যে মিল-মুহাব্বত ও পরস্পরের মধ্যে সুসম্পর্ক না থাকে, তাহলে এর ফলে পুরা সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যায় এবং সমাজের মধ্যে এর অনিষ্ঠতা ও অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে। যার ফলে পুরা গোত্র বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যায়। এজন্য আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রাসূল সা. আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয়জনদের হক আদায় করা এবং তাদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করার জন্য বিশেষভাবে আদেশ দিয়েছেন।

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য উত্তম আচরণ কর

প্রত্যেক ধর্ম আত্মীয়-স্বজনের হক ও অধিকারের ব্যাপারে অনুগ্রহের শিক্ষা দিয়েছে। সকল ধর্মাবলম্বিরা বলে, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে ভাল ব্যবহার কর। কিন্তু আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সা. তাদের ‘হক’ সম্পর্কে এমন এক ‘মূলনীতি’ বর্ণনা করেছেন, যা অন্য সকল ধর্ম থেকে অনন্য। ঐ মূলনীতিগুলো আমাদের অন্তরে স্থান পেলে আত্মীয়-স্বজনের হক পরিপন্থী কখনই কোন কাজ হবে না। তাদের সাথে কখনই অসদাচরণ ও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটবে না।

মূলনীতি

আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে ভাল ব্যবহার ও সুন্দর কথা-বার্তা শুধু তাদেরকে খুশি করার উদ্দেশ্যে নয় বরং আল্লাহকে খুশি করার উদ্দেশ্যে করবে। অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করার সময় এ কথা ভাববে যে, এটা আল্লাহর আদেশ। এ কাজ আমি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য করছি। বিনিময়ে প্রতিদানের আশা করবে না। বরং তার চিন্তায় শুধু এটা থাকবে যে, আমি আল্লাহকে খুশি করার জন্য তার সঙ্গে উত্তম আচরণ করছি। খুশি হয়ে তারাও যদি উত্তম আচরণ করে, শুকরিয়া আদায় করে অথবা কোন প্রতিদান দেয়, তবে সেটা আলাদা বিষয়। নেয়ামত ভেবে তা গ্রহণ করবে। আর যদি সে খুশি না হয়, প্রতিদানও না দেয়, তবুও তাদের সঙ্গে সদাচরণ করতে থাকবে এবং এ কথা ভাববে– আমার প্রভু আমার উপর যে দায়িত্ব অর্পন করেছেন, তা পালন করা আমার কর্তব্য।

কৃতজ্ঞতা ও প্রতিদানের অপেক্ষা করিও না

‘আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করা উত্তম কাজ, এ সমস্ত হক আদায় করা একান্ত প্রয়োজন।’ এ কথা আমরা সবাই বলি। কিন্তু আমরা তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করে কৃতজ্ঞতা ও প্রতিদানের অপেক্ষা করি। তারা আমার সুনাম ও প্রশংসা করুক এ আশা করি। আর এ ধরনের মানসিকতা থেকে ঝগড়া-ঝাটিসহ নানা রকম অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটে থাকে।

সে শুকরিয়া আদায় করল না। প্রতিদানও দিল না। অন্তরে তখন বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় যে, আমি তার সঙ্গে প্রশংসনীয় আচরণ করলাম, কিন্তু সে ঘুরে জিজ্ঞাসাও করল না। তার মুখে কৃতজ্ঞতার শব্দটুকুও নেই। সে তো কখনো প্রতিদানও দেয়নি। এ মানসিকতা লালন করার কারণে তার সঙ্গে উত্তম আচরণ করে যে পুণ্য অর্জন হয়েছিল, তা নষ্ট হয়ে গেল। তার ব্যাপারে আপনার অন্তরে কুধারণা সৃষ্টি হল। ভবিষ্যতে উত্তম আচরণ করার সুযোগ আসলেও ভাববেন- তার সঙ্গে উত্তম আচরণ করে লাভ কি? এ কথা ভেবে তার সাথে সদাচরণ করা থেকে বিরত থাকবেন। আর পূর্বে যে পুণ্য অর্জন হয়েছিল তা তো নষ্টই হয়ে গেছে। এজন্য রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, কারো সাথে সদাচরণ করলে, শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কর। এ আশা কর না যে, সেও আমার সঙ্গে সদাচরণ করবে, আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, আমার প্রশংসা করবে।

আত্মীয়তা রক্ষাকারী কে

এক হাদীসে রাসূল সা. ইরশাদ করেন–

لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلٰكِنِ الْوَاصِلُ الَّذِيْ إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا

‘প্রতিদানে সম্পর্ক স্থাপনকারী আত্মীয়তা রক্ষাকারী নয়। বরং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী সেই, যে সম্পর্ক নষ্টকারী আত্মীয়র সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে।’ (বুখারী শরীফ, হাদীস-৫৫৩২)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের কোন আত্মীয়ের সঙ্গে আত্মীয়তা রক্ষা করার প্রতিদান দেয় যে, অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন আমার সঙ্গে যতটুকু সদাচরণ করবে, আমিও তাদের সাথে ততটুকু সদাচরণ করব। তারা ভাল ব্যবহার করলে, আমিও ভাল ব্যবহার করব। তারা ভাল ব্যবহার না করলে আমিও করব না। এমন ব্যক্তি আত্মীয়তা রক্ষাকারী নয়। সে ব্যক্তি তার সদাচরণের বিনিময়ে প্রতিদান ও পূণ্য পাবে না। প্রকৃতপক্ষে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী সেই ব্যক্তি, যে তার হক নষ্টকারী ও তার সঙ্গে সম্পর্ক নষ্টকারী আত্মীয়ের সঙ্গেও শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সদাচরণ করে। ভাল ব্যবহার করে। এই ব্যক্তিই হল প্রকৃত পক্ষে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী এবং সাওয়াবের হকদার।

কুসংস্কার আমাদেরকে ঘিরে ধরেছে

‘আত্মীয়-স্বজনের হক ও অধিকার কি?’ কাউকে এ প্রশ্ন করলে সে উত্তর দেবে, ‘আত্মীয়-স্বজনের অনেক হক রয়েছে।’ কিন্তু সেই হকসমূহ ‘কে কোন পর্যায়ে কীভাবে আদায় করছে’ এর জরিপ করলে দেখা যাবে, আমরা সামাজিকতা রক্ষার জন্য তাদের কিছু হক পালন করে থাকি। এটা একটি রুসম ও সামাজিকতায় পরিণত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে অন্তরে কোন সম্পর্ক নেই কেউ বিয়ে-শাদী ইত্যাদিতে দাওয়াত দিল, কিন্তু তাকে কোন উপহার দিতে মন চাচ্ছে না অথবা আর্থিক সামর্থ নেই। তখন সে চিন্তা করে, দাওয়াতী মেহমান হিসেবে খালি হাতে গেলে খুব খারাপ দেখায়। সুতরাং মন না চাওয়া সত্ত্বেও এ ধারণা করে উপহার দেয়া হয় যে, না দিলে মান-ইজ্জত নষ্ট হবে এবং সমাজের লোকজন কি বলবে? বাড়ীওয়ালা বলবে, আমি তার বিয়েতে এই উপহার দিয়েছিলাম, কিন্তু সে কিছুই দিল না। ইত্যাদি ভেবে অপারগতা সত্ত্বেও ইচ্ছার বিপরীত উপহার দেয়। যাতে আন্তরিকতার কোন ছোটয়া থাকে না। বরং শুধু সামাজিকতা রক্ষার জন্য এবং নাম ফুটানোর জন্য দেয়া হয়। যার ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, উক্ত উপহার দিয়ে সাওয়াব তো পাবেই না, বরং নাম ফুটানোর জন্য উল্টা গুনাহগার হবে।

উৎসব-অনুষ্ঠানে ‘নিওতা’ দেয়া হারাম

আমাদের সমাজে ‘নিওতা’র কুসংস্কার আছে। কোথাও কম আর কোথাও বেশি। বিবাহ-শাদী ইত্যাদি উৎসব-অনুষ্ঠানে লেনদেনের কুসংস্কারকে ‘নিওতা’ বলে।

কেউ কারো অনুষ্ঠানে কিছু দেয়ার সময় খেয়াল করে যে, সে আমাদের অনুষ্ঠানে কত টাকা দিয়েছিল, আর আমি তার অনুষ্ঠানে কত টাকা দিচ্ছি। কোন কোন এলাকাতে অনুষ্ঠানাদির সময় সামাজিক নিয়ম অনুসারে ‘নামের তালিকা’ তৈরি করা হয়। কে কত টাকা দিয়েছে তা লিখে সংরক্ষণ করা হয়। পরবর্তীতে কেউ তাকে দাওয়াত দিলে ‘নামের তালিকা’ বের করে তার দেয়ার পরিমাণ অনুযায়ী টাকা দেয়া কর্তব্য ও জরুরী মনে করে। চাই সেটা ঋণ করে দিক বা নিজে না খেয়ে দিক অথবা চুরি-ডাকাতি করে দিক। কিন্তু দেয়া আবশ্যক মনে করে। না দিলে তাকে সমাজের অপরাধকারী মনে করা হয়।

দেখুন এসব অনুষ্ঠানে টাকা-পয়সা ও দান এ নিয়াতে দেয়া হয় যে, তার বাড়ীতে অনুষ্ঠানের সময় সেও দেবে। অর্থাৎ সে প্রতিদানের টাকা দেয়, যা স্পষ্ট হারাম। পবিত্র কুরআনে এর জন্য ‘রিবা’ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

'যা কিছু তোমরা (দুনিয়ার উদ্দেশ্যে ব্যয় করবে, যেমন কাউকে কোন কিছু) এই আশায় দেবে যে, তা মানুষের ধন-সম্পদে (শামিল হয়ে অর্থাৎ তাদের মালিকানায় ও অধিকারে) পৌঁছে তোমাদের জন্য বেশি (হয়ে) আসবে, (যেমন বিবাহ ইত্যাদি অনুষ্ঠনাদিতে প্রায়ই এই উদ্দেশ্যে ধন-সম্পদ দেয়া হয় যে, আমাদের অনুষ্ঠানের সময় আরও কিছু বেশি শামিল করে আমাদেরকে দেবে।) আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি পায় না। (কেননা, আল্লাহর কাছে কেবলমাত্র সেই ধন-সম্পদই পৌঁছে ও বৃদ্ধি পায়, যা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করা হয়। হাদীসেও বলা হয়েছে, একটি মকবুল খেজুর উহুদ পাহাড়ের চাইতেও বেশি বেড়ে যায়। যেহেতু উপরোক্ত ধন-সম্পদে আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়াত থাকে না, কাজেই কবুলও হয় না, বাড়েও না) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় তোমাদের মধ্যে যারা যাকাত (ইত্যাদি) দিয়ে থাকে, তারাই আল্লাহর কাছে (তাদের প্রদত্ত ধন) বৃদ্ধি করতে থাকবে।' (সূরা ৩০ রূম, আয়াত-৩৯)

হাদিয়া কোন উদ্দেশ্যে দেবে

এ কারণে কারো অন্তরে যদি এ খেয়াল হয় যে, আজ আমার প্রিয়জনের আনন্দের দিন। তার এ আনন্দের দিনে কোন উপহার দিয়ে তার আনন্দের শরীক হই। যার একমাত্র উদ্দেশ্য প্রিয়জনের অধিকার পূরণ ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন– তবে এটা অবশ্যই সাওয়াবের বিষয়। পক্ষান্তরে কেউ যদি সামাজিকতা ও লৌকিকতার উদ্দেশ্যে এগুলো দেয়, তবে তা অবশ্যই গুনাহ ও আযাবের কারণ হবে। সুতরাং এ ধরনের কোন অনুষ্ঠানে কোন কিছু উপহার দিলে অবশ্যই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দেবে।

হাদিয়া কোন উদ্দেশ্যে দিয়েছে তা বোঝার পদ্ধতি

কে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হাদিয়া দিচ্ছে আর কে প্রতিদানের উদ্দেশ্যে দিচ্ছে– তা বোঝার উপায় হল, যদি কেউ হাদিয়া দেয়ার পর কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের অপেক্ষা করে, অথবা পরবর্তীতে তার কোন অনুষ্ঠানে উপহার-উপঢৌকন পাওয়ার আশা করে এবং না দিলে মন ছোট করে, অথবা সে কী পরিমাণ দিয়েছে– তার সাথে তুলনা করে, তাহলে বোঝা যাবে, সে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দেয়নি বরং প্রতিদানের আশায় দিয়েছে। যে ব্যক্তি এ আশায় উপহার দিল, সে তার উপহার বরবাদ করল। সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হল।

পক্ষান্তরে কেউ যদি এ নিয়তে না দেয়, বরং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও প্রিয়জনের অধিকার পূরণের উদ্দেশ্যে দেয়– তবে এমন হাদিয়া প্রদানকারী ও গ্রহণকারী উভয়ের জন্য মোবারকবাদ।

হাদিয়া উত্তম ও বৈধ সম্পদ

আমার আব্বা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. বলতেন, কোন মুসলমান যদি লৌকিকতা পরিহার করে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে দেয়, তবে সেই হাদিয়া পৃথিবীর সব চেয়ে বেশি হালাল এবং উত্তম সম্পদ। কারণ, যে টাকা নিজ কর্মের মাধ্যমে অর্জন করেছে তার মধ্যে ত্রুটি থাকার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু একজন মুসলমান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ইখলাছ ও মুহাব্বতের সাথে হাদিয়া দিলে, নিঃসন্দেহে তা হালাল হওয়ার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই।

আমার আব্বা হাদিয়ার জিনিসকে খুব মূল্যবান মনে করতেন। হযরত থানবী রহ.-এর নিকট হাদিয়া দেয়ার নিয়ম নির্ধারণ ছিল। তিনি হাদিয়াকে খুব মূল্যবান মনে করতেন। প্রাপ্ত হাদিয়া নিয়ম অনুসারে গুরুত্ব সহকারে কোন নির্দিষ্ট স্থানে খরচ করতে চেষ্টা করতেন। কারণ, এ সম্পদ মুসলমানের হালাল সম্পদ যা সে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দিয়েছে। এজন্য হাদিয়া অত্যন্ত বরকতপূর্ণ।

মোটকথা, হাদিয়া আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দিলে তা প্রদানকারী ও গ্রহণকারী উভয়ের জন্য মোবারক। পক্ষান্তরে লোভ-লালসা এবং লোক দেখানোর উদ্দেশ্য হাদিয়া দিলে তা না দেয়া এবং গ্রহণ না করা অধিক বরকতপূর্ণ।

হাদিয়ার আশা করলে তা বরকতপূর্ণ হয় না

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যদি এ আশা থাকে যে, অমুক ব্যক্তি আমার সাক্ষাতের জন্য আসবে, আমাকে হাদিয়া দেবে। এমতাবস্থায় সে এসে হাদিয়া দিল, তাহলে ঐ হাদিয়ার মধ্যে কোন বরকত হবে না। আর চাওয়া ও অপেক্ষা করা ছাড়া কেউ হাদিয়া দিলে মনে করতে হবে যে, আল্লাহ হাদিয়া প্রদানকারীর অন্তরে এই খেয়াল পয়দা করে দিয়েছেন যে, অমুক ব্যক্তিকে হাদিয়া দাও। অতঃপর সে হাদিয়া দেয়। এমন হাদিয়া বরকতপূর্ণ। যে হাদিয়ার জন্য অপেক্ষা করা হয় তার মধ্যে কমতি আসে। কারণ, হাদিয়া আসার পুর্বেই তার মধ্যে নফসের গোলামী এসে যায়। এজন্য এর মধ্যে বরকত থাকে না।

একজন বুযুর্গের ঘটনা

একজন বুযুর্গের ঘটনা বর্ণিত আছে। তিনি আল্লাহর প্রিয় ব্যক্তিত্ব ও অনেক বড় দরবেশ ছিলেন। আল্লাহওয়ালাগণ সাধারণতঃ কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। একবার তিনি কয়েক দিন ধরে ক্ষুধার্ত ছিলেন। মুরিদ ও ভক্তদের মজলিসে ওয়াজ-নছিহত করছিলেন। আওয়াজ দূর্বল ছিল, আস্তে আস্তে এবং ক্ষীণ আওয়াজে বয়ান করছিলেন।

অবস্থা দেখে একজন মুরিদ বুঝল যে, ক্ষুধার কারণে এমন দূর্বল হয়েছে। সুতরাং সে মজলিস থেকে উঠে তার শায়েখের জন্য খানার ব্যবস্থা করতে গেল। কিছুক্ষণ পর খানাসহ উপস্থিত হল। খানা দেখে শায়েখ কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, আমি ইহা গ্রহণ করতে পারছি না, ইহা নিয়ে যাও।

সুতরাং মুরিদ খানা নিয়ে ফিরে গেল। বর্তমান যুগের মুরিদ হলে পীড়াপিড়ি করত যে, হুজুর খানা খেতে হবে। কিন্তু সে মুরিদ জানত যে, তিনি একজন পরিপূর্ণ বুযুর্গ। আর এমন ব্যক্তির কথা নির্দ্বিধায় মেনে নেয়া জরুরী। আর শায়েখ এমনিতেই তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করছেন না, বরং কোন কারণ অবশ্যই আছে। অতঃপর সে খানা নিয়ে ফিরে গেল।

কিছুক্ষণ পর খানা নিয়ে মুরিদ আবার ফিরে আসল এবং তার খেদমতে উপস্থিত করে বলল যে, হযরত এখন গ্রহণ করেন। শায়েখ বললেন, হ্যাঁ এখন গ্রহণ করছি।

মুরিদ পরবর্তীতে বর্ণনা করেন, প্রথমবার খানা নিয়ে উপস্থিত হলে হুজুর তা খেতে অস্বীকার করলেন। তখন আমার মনে হল যে, শায়েখ খানা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এ কারণে যে, যখন আমি মজলিস থেকে উঠে গেলাম, তখন সম্ভবত তাঁর অন্তরে এ খেয়াল হয়েছিল যে, 'সে আমার দুর্বলতা দেখে বুঝতে পেরেছে এবং আমার জন্য খানা আনতে গেছে।' যার কারণে অন্তরে খানার অপেক্ষা এসে যায়। এ কারণে যখন আমি খানা নিয়ে আসলাম তখন তাঁর অপেক্ষা ও চাহিদা মত হওয়ার কারণে সম্ভবত তাঁর এ হাদীসটি স্মরণে এসে যায় যে, 'যেসব হাদিয়া অপেক্ষা এবং মনোবাসনার পরে আসে, তাতে কোন প্রকার বরকত হয় না।' এজন্য তিনি খানা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। সুতরাং আমি সে খানা নিয়ে ফিরে গেলাম, যেন খানার অপেক্ষা এবং মনোবাসনার খেয়াল অন্তর থেকে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর উক্ত খানা নিয়ে আবার উপস্থিত হই। এখন হাদিয়া গ্রহণ করতে বাধা না থাকার কারণে শায়েখ তা গ্রহণ করেন।

মোটকথা, যদি হাদিয়া পাওয়ার অপেক্ষা এসে যায়, অথবা হাদিয়া দিয়ে নাম প্রচারের উদ্দেশ্য হয়, অথবা প্রতিদানে লোভ-লালসা সৃষ্টি হয়, তাহলে হাদিয়ার নূর ও বরকত চলে যায়।

হাদিয়া দাও মুহাব্বত বৃদ্ধি কর

পবিত্র হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন–

تَهَادَوْا تَحَابُّوا

'একে অপরকে হাদিয়া দাও, তাহলে তোমাদের পরস্পরে মুহাব্বত সৃষ্টি হবে।' (মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেক, হাদীস-১৪১৩)

কিন্তু এ মুহাব্বত ঐ সময় সৃষ্টি হবে, যখন হাদিয়া আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আত্মীয়তার হক আদায়ের নিয়তে এবং নিজের আখেরাত সুন্দর করার ইচ্ছায় দেয়া হয়।

কিন্তু আমরা সাধারণতঃ এ উদ্দেশ্যে হাদিয়া দেই না। বিবাহ-শাদী ইত্যাদি অনুষ্ঠানে শুধু সমাজের রীতিনীতি পালনার্থে হাদিয়া দিয়ে থাকি। এ ছাড়া আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্য কোন আত্মীয়-স্বজনকে হাদিয়া দেয়ার তাওফীক হয় না।

অনেক সময় স্বামীর অন্তরে আত্মীয়-স্বজনকে হাদিয়া দেয়ার খেয়াল হয়। কিন্তু অধিকাংশ স্ত্রীরা এ কথা বলে বাধা দেয় যে, এখন হাদিয়া দেয়ার দ্বারা লাভ কি? তার বাড়ীতে অমুক অনুষ্ঠান হবে, সে সময় হাদিয়া দিলে আমাদের নামও হবে এবং মাথা থেকে বোঝাও নেমে যাবে। অথচ লৌকিকতা ও মিথ্যাচারিতা ছাড়া শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আত্মীয় ও বন্ধু-বন্ধবকে খুশি করার জন্য হাদিয়া দেয়ার আকাঙ্খা সৃষ্টি হলে, তখনই হাদিয়া দেয়ার আসল সময়। আর এমন হাদিয়া বেশি উপকারী ও বরকতময়।

জিনিস দেখ না আবেগ দেখ

হুজুর সা. বলেন, হাদিয়া কি দিয়েছে তা দেখ না, বরং কোন আবেগ নিয়ে দিয়েছে তা দেখ। যদি আন্তরিকতার সাথে ছোট জিনিসও দেয়, তবুও তা এমন দামি জিনিস থেকে হাজারগুণে উত্তম, যা শুধু লৌকিকতা এবং সুনামের জন্য দেয়া হয়। এ কারণে হুজুর সা. ইরশাদ করেন– 'কোন প্রতিবেশি বকরীর একটি পা হাদিয়া পাঠালেও তা ছোট মনে কর না।' জিনিস না দেখে আবেগ দেখতে হবে যে, কেমন আবেগ নিয়ে সে হাদিয়া দিচ্ছে। আবেগটা আন্তরিকতাপূর্ণ হলে তা মুল্যবান ভেবে গ্রহণ কর। এ হাদিয়া তোমার জন্য বরকতপূর্ণ হবে।

পক্ষান্তরে লোক দেখানোর জন্য মুল্যবান কোন বস্তু দিলেও তাতে বরকত হবে না। এ কারণে আল্লাহর কোন বান্দা যদি হাদিয়া স্বরূপ কোন ছোট জিনিসও দেয়, তবুও তা মুল্যবান ভেবে গ্রহণ করে নাও। সাধারণত ছোট জিনিস ছোট হওয়ার কারণে হাদিয়া দেয়ার মধ্যে লৌকিকতা থাকে না। পক্ষান্তরে দামি ও বড় কোন জিনিস হাদিয়া দিলে লৌকিকতার একটি ছাপ তাতে প্রতিফলিত হয়। এজন্য ছোট জিনিস হাদিয়া পেলে তা খুব মুল্যবান মনে করা উচিত।

এক বুযুর্গের হালাল উপার্জন দ্বারা দাওয়াত

আমার আব্বা মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. একটি ঘটনা শুনাতেন। দেওবন্দে এক বুযুর্গ ব্যক্তি ঘাস কেটে তা বিক্রি করে নিজের জীবিকা নির্বাহ করতেন। দৈনিক তার আয় হত 'ছয় পয়সা'। তা তিনি এভাবে বণ্টন করে খরচ করতেন, 'দুই পয়সা নিজের ব্যবহারের জন্য রাখতেন। দুই পয়সা দান করতেন। বাকি দুই পয়সা জমা করতেন এই নিয়তে যে, দারুল উলুম দেওবন্দের বড় বড় আলেমগণকে দাওয়াত করে খাওয়াবেন। পর্যাপ্ত পরিমাণ পয়সা জমা হলে তাঁদেরকে দাওয়াত দিতেন।

দাওয়াতী মেহমান ছিলেন– শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান রহ., হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. প্রমুখ। তাঁরা বলেন, আমরা সারা মাস এই বুযুর্গের দাওয়াতের অপেক্ষা করতাম। বড় বড় ধনাঢ্য ব্যক্তি ও নেতারা দাওয়াত করলেও তাদের অপেক্ষায় থাকতাম না। কারণ, আল্লাহর একজন প্রিয় বান্দা আল্লাহর মুহাব্বতের খাতিরে দাওয়াত দিতেন। হালাল উপার্জন দ্বারা আপ্যায়ন করতেন। তার খানার মধ্যে যে নূর পেতাম, তা অন্য কোন খানায় পেতাম না। তাঁরা আরো বলেন, আল্লাহর কোন নেক বান্দার দাওয়াত খেলে কয়েক দিন পর্যন্ত তার নূর অন্তরে অনুভূত হত। ইবাদত, যিকির-আযকার ইত্যাদি ভাল কাজে লিপ্ত থাকতে মনে চাইত।

মোটকথা, বড় জিনিসের চেয়ে ছোট জিনিসের মধ্যে ইখলাছের পরিমাণ বেশি থাকে। এজন্য ছোট হাদিয়কে মূল্যবান মনে করা উচিত।

হাদিয়া হিসেবে সমাজের রুসমি জিনিস না দেয়া

হাদিয়া দেয়ার ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখা উচিত যে, হাদিয়ার উদ্দেশ্য শান্তি পৌঁছান এবং তাকে খুশি করা। যে সমস্ত হাদিয়া রুসম হিসেবে দেয়া হয়, তার মধ্যে শান্তি এবং খুশি করার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়না। এ কারণে এ সমস্ত হাদিয়ায় শুধু রুসমি জিনিস দেয়া হয়। যেমন, মিষ্টি, কাপড় ইত্যাদি। এ ছাড়া অন্য কোন

জিনিস হাদিয়া দিলে তা সামাজিকতার পরিপন্থি হবে এবং তা হাদিয়া দিতে লজ্জা পাবে। মনে করবে যে, এটা কি কোন হাদিয়া হল?

পক্ষান্তরে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং ইখলাছের সাথে হাদিয়া দিলে অবশ্যই এদিকে লক্ষ্য রাখবে যে, উক্ত ব্যক্তির বেশি প্রয়োজন কোন জিনিসের। যে জিনিস হাদিয়া দিলে তার উপকার বেশি হবে তা দেয়া বাঞ্ছনীয়।

এক বুযুর্গের আশ্চর্য হাদিয়া

হযরত শাহ আবদুল আজিজ রহ. নামে একজন বিখ্যাত বুযুর্গ ছিলেন। তিনি তাবলীগ জামাতের প্রসিদ্ধ একজন মুরুব্বী ছিলেন। তিনি আমার আব্বাকে খুব মুহাব্বত করতেন এবং মাঝে মাঝেই সাক্ষাতের জন্য আসতেন। আমার স্মরণ আছে, যখন এই বুর্যগ আমার আব্বার সঙ্গে দেখা করতে দারুল উলুম দেওবন্দে আসতেন, তখন এমন আশ্চর্য ধরনের জিনিস হাদিয়া আনতেন, যা হাদিয়া হিসেবে অন্য কাউকে দিতে দেখিনি।

যেমন, কখনো তিনি কাগজ নিয়ে আসতেন এবং পিতার খেদমতে হাজির করতেন। অথচ আমাদের সমাজে কেউ কাগজ হাদিয়া দেয় না। কিন্তু আল্লাহর ঐ বান্দা জানতেন যে, হযরত মুফতী সাহেব সব সময় লেখার কাজে ব্যস্ত থাকেন। কাগজ তাঁর কাজে আসবে। লেখা লেখির যে সমস্ত নেক কাজ করবে তার মধ্যে আমারও অংশ থাকবে এবং আমিও সাওয়াব পেতে থাকব। আবার কখনো কালির দোয়াত নিয়ে খেদমতে উপস্থিত হতেন।

প্রিয় পাঠক! লৌকিকতা উদ্দেশ্য হলে কেউ কি কালির দোয়াত হাদিয়া দিতে পারবে? হাদিয়ার মাধ্যমে আল্লাহকে রাজি করা উদ্দেশ্য হলে অবশ্যই লক্ষ্য করবে যে, তার উপকার কোন বস্তু দ্বারা বেশি হবে। আর যদি উক্ত বুযুর্গ মিষ্টিদ্রব্য হাদিয়া দিতেন, তাহলে আমার আব্বা নিজে মিষ্টি খেতেন না, বরং অন্য ব্যক্তি খেত।

হাদিয়া দেয়ার জন্য জ্ঞান প্রয়োজন

মোটকথা, হাদিয়া দিতেও জ্ঞানের প্রয়োজন আছে। আর এই জ্ঞানও আল্লাহর তাওফীক, তাঁর সন্তুষ্টি ও ইখলাছের মাধ্যমে অর্জিত হয়। কিন্তু যেখানে হাদিয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হয় লৌকিকতা এবং সুখ্যাতি অর্জন, সেখানে এ জ্ঞান কাজে আসবে না। কারণ, সেখানে মানুষ সামাজিক রীতি-নীতিকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। সে চিন্তা করবে, আমি যদি কালির দোয়াত হাদিয়া হিসেবে নিয়ে যাই, তাহলে এটা লজ্জার বিষয়। আর যদি মিষ্টি নিয়ে যাই, তাহলে দেখতে ভাল মনে হবে। আজ আমাদের পুরা সমাজকে সামাজিক কু-প্রথা ঘিরে

নিয়েছে। এমনকি আত্মীয়দের সঙ্গে আত্মীয়তার যে আচরণগুলো করা হয়, সেগুলোকেও সামাজিক কু-প্রথা ধ্বংস করে দিয়েছে।

সুতরাং যে হাদিয়া উত্তম ছিল এবং নবী কারীম সা.-এর শিক্ষা ছিল, আমরা সামাজিক কুসংস্কারের গোলক ধাঁধাঁয় পড়ে তার পূণ্য ও প্রাপ্তিকে ধ্বংস করেছি। ধ্বংস করেছি তার নূর ও বরকতকে। বিপরীতে অর্জন করছি গুনাহ। ভালভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে, এ সমস্ত 'নিওতা' ইত্যাদি স্পষ্ট হারাম। হ্যাঁ, যদি কোন ব্যক্তি খালেছ নিয়তে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হাদিয়া দেয়, ইনশাআল্লাহ সে ব্যক্তি হাদিয়ার অবশ্যই সাওয়াব লাভ করবে।

সব কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কর

এ ছিল হাদিয়ার বিষয়। এ ছাড়াও নিকটতম আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয়জনদের আরো অনেক হক এবং অধিকার রয়েছে। যেমন, কারো দুঃখে দুঃখিত হওয়া এবং সুখে আনন্দিত হওয়া। প্রয়োজনে কারো কাজ করে দেয়া ইত্যাদি। এ ব্যাপারেও নবী কারীম সা. আমাদেরকে এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, যখন কোন আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয়জনের কাজ করে দাও তখন শুধু আল্লাহর জন্য কর। এ নিয়ত যেন না থাকে যে, সে ব্যক্তি আমার প্রশংসা করবে, আমার কৃতজ্ঞাতা প্রকাশ করবে এবং তার বদলা দেবে। এমন নিয়ত থাকলে তার কাজ করে দুনিয়াতেও কোন প্রকার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে না এবং সাওয়াবও লাভ হবে না।

আত্মীয়-স্বজন বিচ্ছুর মত

আমাদের সমাজে ভুল চিন্তাধারার কারণে আরবী ভাষায় একটি প্রবাদ বাক্য প্রসিদ্ধ আছে যার অর্থ– 'আত্মীয়-স্বজন বিচ্ছুর মত।' সর্বদা দংশন করার চিন্তায় থাকে। তারা কখনো সন্তুষ্ট হয় না। প্রবাদ বাক্যটি এজন্য প্রসিদ্ধ যে, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে উত্তম আচরণ এই আশায় করা হয় যে, তার পক্ষ থেকে উত্তর পাওয়া যাবে। অর্থাৎ প্রতিদান পাওয়া যাবে। কিন্তু আশা অনুযায়ী উত্তর ও প্রতিদান না পাওয়ার ফলে সে বিচ্ছু হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে উত্তম আচরণ যদি এই নিয়তে করে যে, আমার প্রভু আমাকে উত্তম আচরণের আদেশ দিয়েছেন এবং এটা রাসূল সা.-এর সুন্নাত, তখন মানুষ এ চিন্তা করবে যে, আত্মীয়-স্বজন প্রতিদান দিক বা না দিক, প্রতিদানের প্রকৃত মালিক অবশ্যই প্রতিদান দেবেন।

আনন্দ ও মজার বিষয় হত তখন, যখন আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে উত্তম আচরণ করা হল, অথচ তার পক্ষ থেকে প্রতিদানতো এলোই না, বরং উল্টা খারাপ ব্যবহার করল। অর্থাৎ উত্তম আচরণ করার প্রতিউত্তরে খারাপ আচরণ করল, কিন্তু তবুও তার সঙ্গে এ নিয়তে উত্তম আচরণ করতে হবে যে, এই উত্তম আচরণ আমার প্রভুর সন্তুষ্টির জন্যে করছি।

এ জন্য নবী কারীম সা. ইরশাদ করেন, ভাল ব্যবহার করে প্রতিদানের অপেক্ষাকারী আত্মীয়তা রক্ষাকারী নয়। বরং আত্মীয়তা রক্ষাকারী ঐ ব্যক্তি, যার সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করার পরেও সে তার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখে।

আত্মীয়-স্বজনের সাথে রাসূল সা.-এর আচরণ

সীমিত সংখ্যক আত্মীয় ছাড়া অধিকাংশ আত্মীয়-স্বজন রাসূলুল্লাহ সা.-এর জানের দুশমন ও রক্ত পিপাসু ছিল। এমন কোন কষ্ট বাকি ছিল না, যা তারা তাঁকে দেয়নি। কিন্তু তবুও রাসূল সা. আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে প্রবাদতুল্য উত্তম আচরণ করেছেন। রাসূল সা. তাদের হক আদায় করতে কোন ত্রুটি করেননি। মক্কা বিজয় হল। প্রতিশোধ নেওয়ার সময় এল। তখন নবী কারীম সা. সবাইকে ক্ষমা করে দিলেন। ঘোষণা করে দিলেন, যারা হেরেম শরীফে প্রবেশ করবে, তারা নিরাপদ। যারা আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে, তারাও নিরাপদ। রাসূল সা. কারো থেকে প্রতিশোধ নেননি। এ আশা কারো নিকট করেননি যে, তারা আমার সদাচারণের প্রতিদান দেবে। এ কারণে আত্মীয়-স্বজন খারাপ ব্যবহার করলেও তাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা এবং ভাল প্রতিদান দেয়া রাসূলুল্লাহ সা.-এর সুন্নাত।

মাখলুক থেকে সদাচরণের আশা ছেড়ে দাও

এ কারণে হাকীমুল উম্মাত হযরত আশরাফ আলী থানবী রহ. তাঁর 'মাওয়ায়েয'র মধ্যে খুব মুল্যবান ও জ্ঞানগর্ভ কথা বলেছেন। তিনি বলেন, পৃথিবীতে সুখে থাকার একমাত্র পন্থা– 'মাখলুক থেকে ভাল কিছুর আশা ছেড়ে দাও।' এ আশা ছেড়ে দাও যে, অমুক ব্যক্তি আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে। অমুক ব্যক্তি আমার কাজে আসবে। সে আমার সুখ-দুঃখে সাথী হবে। এ সব আশা ছেড়ে শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকট আশা রাখ।

মাখলুক থেকে আশা করা ছাড়া তার পক্ষ থেকে কোন ভাল ব্যবহার পেলে তাতে অধিক আনন্দ ও সুখ অনুভূত হবে। কেননা চাওয়া ছাড়াই পেয়েছে। আর কারো পক্ষ থেকে কোন প্রকার কষ্ট পেলে তাতে বেশি দুঃখ হবে না।

কারণ, ভালর আশা তো ছিল না, কষ্টের আশাই ছিল। সে কষ্ট আশা অনুযায়ী পেয়েছে। এ জন্য আশা করা ছাড়া যে উত্তম আচরণ পাওয়া যায়, সেটাই উত্তম।

পৃথিবী শুধু কষ্টই দেয়

পৃথিবীর বাস্তবতা এই যে, সে মানুষকে শুধু কষ্টই দেয়। কখনো আনন্দ ও উপকার পেলে মনে করবে তা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ। আর কষ্ট পেলে মনে করবে, এটাই স্বাভাবিক। এর জন্য দুঃখ করার কিছু নেই।

এ কথা একেবারে শতভাগ সত্য যে, আমরা এই কথাগুলো মানলে এবং এর উপর আমল করলে সমস্ত অভিযোগ দূর হয়ে যাবে। কারণ, আশা করে না পেলেই এমন অভিযোগ ও দুঃখ পেতে হয়। অতএব, যা কিছু আশা করবে আল্লাহর কাছে করবে, মানুষের কাছে করবে না। তাহলে শান্তি পাবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহওয়ালাগণের অবস্থা

আমাদের পূর্ববর্তী আল্লাহওয়ালাগণ এভাবে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। আমিও এভাবেই দিক নির্দেশনা দিচ্ছি। আপনারা শুনেছেন। কিন্তু শুধু বলা ও শোনার দ্বারা লাভ হবে না। বরং এ কথাগুলো বারবার আলোচনা করে অন্তরে বসাতে হবে। মাঝে মাঝে জরিপ করতে হবে যে, আমি অন্যের থেকে কোন কোন বস্তু পাওয়ার জন্য আশার আঁচল পেতেছি এবং কেন পেতেছি? আল্লাহর নিকট কেন আশার আঁচল বিছাইনি?

আল্লাহওয়ালাগণ সর্বদা হাসি-খুশি থাকেন। তাঁদেরকে কোন পেরেশানি স্পর্শ করে অস্থির ও ব্যাকুল করতে পারে না। কারণ, তাঁরা নিজ প্রভুর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে রেখেছেন। মাখলুকের প্রতি তাদের দৃষ্টি নেই। তারা কোন মানুষ থেকে কিছু আশা করেন না। মানুষ থেকে কিছু চান না। যা কিছু চাওয়ার আল্লাহ তাআলার নিকট চান। যার ফলে তাঁরা সর্বদা শান্তিতে থাকেন।

জনৈক বুযুর্গের ঘটনা

হাকীমুল উম্মাত হযরত থানবী রহ. এক বুযুর্গের ঘটনা লিখেছেন। কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'হযরত আপনি কেমন আছেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'আলহামদুলিল্লাহ! খুব ভাল আছি।' তিনি নিজেকে দেখিয়ে বললেন, 'এই ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে কী আর জিজ্ঞাসা করছ, যার ইচ্ছার বিপরীত পৃথিবীতে

কোন কাজই হয় না।' অর্থাৎ আমি এমন একজন ব্যক্তি, পৃথিবীতে কোন কাজ আমার সন্তুষ্টি ছাড়া হয় না। প্রতিটি কাজ আমার সন্তুষ্টি অনুযায়ী হয়। আর পৃথিবীর সব কাজ যার সন্তুষ্টি অনুযায়ী হয়, তার চেয়ে বেশি আনন্দে এবং বেশি শান্তিতে কে থাকতে পারে?

প্রশ্নকারী আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, 'এমন অবস্থাতো নবীগণেরও ছিল না যে, দুনিয়ার সমস্ত কাজ তাদের সন্তুষ্টি অনুযায়ী হয়েছে। বরং অনেক কাজ তাদেরও সন্তুষ্টির পরিপন্থী হত। আর আপনার প্রত্যেক কাজই আপনার সন্তুষ্টি অনুযায়ী হয় কেমন করে?'

বুযুর্গ উত্তর দিলেন যে, আমি আমার সন্তুষ্টিকে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির অধীন করে দিয়েছি। সুতরাং যা আল্লাহর ইচ্ছা, তা আমারও ইচ্ছা। আর পৃথিবীর সব কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ইচ্ছাতেই হয়। আমি আমার সত্ত্বাকে বিলীন করে দিয়েছি। এ জন্য আমার কাজ আমার মর্জি ও ইচ্ছা অনুযায়ী হচ্ছে। কেননা তা আল্লাহর সন্তুষ্টিতে হচ্ছে। এজন্য আমি খুব শান্তিতে এবং আনন্দে আছি।

আল্লাহওয়ালাগণের প্রশান্তি

মোটকথা, আল্লাহওয়ালাগণ সর্বদা প্রশান্তিতে থাকেন। এ সম্পর্কে হযরত সুফিয়ান সাওরী রহ. বলেন, 'পৃথিবীর কোন বাদশাহ আমাদের সুস্থতা, প্রশান্তি ও স্তিতিশিলতা সম্পর্কে জানলে, তারা আমাদের সুখ-শান্তি ছিনিয়ে নেয়ার জন্য যুদ্ধ করত।'

এই সুখ-শান্তি ও সুন্দর জীবন কেবল মাখলুক থেকে দৃষ্টি ও আশা-ভরসা শেষ করার দ্বারা অর্জিত হয়। কিন্তু এগুলো শুধু বলা ও শোনার দ্বারা অর্জিত হয় না। বরং আল্লাহওয়ালাগণের 'সোহবত' তথা সংশ্রবের মাধ্যমে এ বিষয়গুলো আস্তে আস্তে পরিবর্তন হয় এবং মানব জাতির দুনিয়া ও আখেরাত সুখময় হয়।

মোটকথা আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয়জনদের হক আদায় করা এবং তাদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে হওয়া আবশ্যক। শুধু লোক দেখানো এবং সমাজের রীতিনীতি পালনার্থে হওয়া কাম্য নয়।

আল্লাহ তাআলা আপন অনুগ্রহে আমাদেরকে আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয়জনের অধিকার বোঝার এবং আদায় করার তাওফীক দান করুন। আমীন॥

বিয়ে

শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
অনুবাদ : মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদুদ
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি- ২০০৭

সূচী

এক নফস থেকে সৃষ্টি করেছেন-১৩৭
নবী সা.-এর যুগে বিয়ের সময় উপদেশ-১৩৮
বিয়ের সময় খুতবা + বিয়ে একটি ইবাদত-১৩৮
বিয়ের খুতবার তিন আয়াত-১৩৮
প্রথম আয়াত + দ্বিতীয় আয়াত-১৩৯
তৃতীয় আয়াত + আয়াতত্রয়ে তাকওয়ার আলোচনা-১৪০
বিয়ে জৈবিক চাহিদা পূরণের সহজ পথ-১৪১
বিয়ের জন্য খুতবা শর্ত না-১৪১
বরকতপূর্ণ বিয়ে + বিয়েকে আমরা বিপদ বানিয়েছি-১৪২
অনাড়ম্বর বিয়ের একটি ঘটনা-১৪২
এ অনাড়ম্বরতা আপনিও গ্রহণ করুন-১৪৩
হযরত জাবেরকে পুরস্কৃত করার ঘটনা-১৪৩
অনাড়ম্বর বিয়ের দ্বিতীয় ঘটনা + অন্যকে ডাকার গুরুত্ব-১৪৫
বর্তমান আমরা হালালকে কষ্টকর বানিয়েছি-১৪৬
তিন ক্ষেত্রে বিলম্ব না করা-১৪৬
অনার্থক প্রথা পরিহার করুন-১৪৭
ঘোষণা দিয়ে বিয়ে করুন + বিয়ের পর মসজিদে হৈ চৈ-১৪৮
ইবাদতে গুনাহর মিশ্রণ-১৪৮
বিয়ের অনুষ্ঠান গুনাহ মুক্ত হোক-১৪৯
সুখী দম্পতির জন্য তাকওয়া প্রয়োজন-১৪৯
একমাত্র খোদাভীতিই হক আদায় করতে পারে-১৫০
হিংস্র প্রাণীর গুণ-১৫০
আজ পর্যন্ত স্বর পরিবর্তন করে কথা বলিনি-১৫১
স্ত্রীর হাত কে ঠেকাতে পারে-১৫১
প্রত্যেক কাজের শুদ্ধতা একমাত্র তাকওয়ায়-১৫১
বিয়ে করা সুন্নাত-১৫২
বিয়ের মাধ্যমে দুই বংশের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন হয়-১৫২
সৎ স্ত্রী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বস্তু সম্পদ-১৫৩
পৃথিবীর জান্নাত-১৫৩
সৌভাগ্যের তিন আলামত-১৫৩
বরকতপূর্ণ বিয়ে-১৫৪

অনুবাদকের কথা

বিয়ে নিছক সামাজিক বন্ধন বা জৈবিক চাহিদা মিটানোর মাধ্যম নয়, বরং এটি একটি ইবাদত। আম্বিয়ায়ে কেরামের সুন্নাত। যারা বিয়ে করে এবং তাকওয়া অর্জন করে, নিঃসন্দেহে তাদের জীবন নির্মল, সুন্দর ও সুখময়। দুনিয়াই তাদের জন্য জান্নাত। কিন্তু অনাকাঙ্খিত হলেও বাস্তব সত্য হল, আল্লাহ তাআলা সুন্দর ও নির্মল জীবন বির্নিমানের জন্য আমাদেরকে যে সহজতর পথ দান করে ছিলেন, আজ আমরা তা 'লৌকিকতা ও সামাজিকতা'র দোহায় দিয়ে ততটাই জটিল ও কঠিন করে ফেলেছি। ফলশ্রুতিতে আমাদের সমাজ জীবন যেমন অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, নোংরামি ও অশান্তির দাবানলে জ্বলছে, ঘটছে অহরহ অনাকাঙ্খিত ঘটনা, তেমনিভাবে ব্যক্তি জীবনও হয়ে উঠেছে দুর্বিসহ।

আশা করি বর্তমান ক্রান্তিকাল অতিক্রম করতে মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম–এর এ পুস্তিকাটি আমাদেরকে সহায়তা করবে, অনুপ্রাণিত করবে, উন্মোচিত করবে মুক্তির নতুন দিগন্ত। এ প্রত্যাশা ও স্বপ্ন রইল।

আল্লাহ তাআলা আমাদের এ খেদমতটুকু কবুল করুন ।আমীন।

মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদুদ
বেজগাতী, ফুলকোচা, সিরাজগঞ্জ
০১.০১.০৭ ঈ.

দুনিয়ার যে সমস্ত কাজকে আমরা দুনিয়াবী মনে করি, যদি একটু নিয়ত পরিবর্তন করি, দৃষ্টিভঙ্গি একটু পাল্টে ফেলি এবং তার কর্মপদ্ধতি যদি পরিবর্তন করে নেই, তাহলেই সেটা দ্বীন হয়ে যাবে। বিবাহও দ্বীন। বেচা-কেনা, ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষেত-খামার, চাকুরী-বাকুরী, স্ত্রী সন্তানের সাথে হাসি-আনন্দ করাও দ্বীন। তবে শর্ত হল, এ কাজগুলোতে আপনার নিয়ত থাকতে হবে আল্লাহকে রাজি করা, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা। তাহলে খাওয়া-দাওয়া, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প সব দ্বীনে পরিণত হবে।



বিয়ে

এক নফস থেকে সৃষ্টি করেছেন

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

'হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক নফস থেকে। আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের কাছে চাও। আর ভয় কর রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক।'

(সূরা ৪ নিসা, আয়াত-১)

আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের এক প্রিয় বন্ধু জনাব হানিফ কামাল-এর বিয়ের অনুষ্ঠানে আমরা সবাই অংশগ্রহণের সুযোগ হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তার বিয়েকে বরকতপূর্ণ করুন। আমীন।

এ বিয়ের খুতবা পড়ার সময় মনে হল, আজ এ বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ততা ও সমাজের প্রতি লক্ষ্য করে বিয়ের খুতবা সম্পর্কে আলোচনা করব। কারণ, প্রত্যেক বিয়ের সময়ে যে খুতবাটি পড়া হয় তার বিশেষ এক উদ্দেশ্য রয়েছে। কিন্তু আমরা সে উদ্দেশ্যকে বেমালুম ভুলে গেছি। শুধু তাই না, বরং বিয়ের খুতবা পড়াঁকে এখন আমরা রুসম-রেওয়াজে পরিণত করেছি। বিয়ের সময় একজন কাজীকে ডাকা হয়। সে বিয়ের খুতবা পড়ে এবং সবাই তা শোনে।

কিন্তু এ খুতবা এবং এর মধ্যে যে সব আয়াত পাঠ করা হয়, তার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে। যাতে আমাদের জন্য বিবাহ সম্পর্কিত এবং সাধারণ জীবনের জন্য অনেক মূল্যবান শিক্ষা ও পয়গাম দেয়া হয়েছে।

নবী সা.-এর যুগে বিয়ের সময় উপদেশ

নবী সা.-এর যুগে নিয়ম ছিল নবী সা. বিয়ের খুতবা দেয়ার সময় উপদেশমূলক আলোচনাও করতেন। উপদেশের সেই নিয়ম আর নেই। খুতবার মসনূন আয়াত তেলাওয়াত করার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। সুতরাং বিয়ের খুতবার রূহ বোঝার প্রয়োজন রয়েছে।

বিয়ের সময় খুতবা

বিয়ে দু'জনের মধ্যে একটি সামাজিক চুক্তি, এতে উভয়ের ইজাব কবুল (প্রস্তাবনা ও গ্রহণ) থাকে। যেমন বিয়ে পড়ানেওয়ালা যিনি কনের উকিল ও দূত হন, তিনি বরকে বলেন- আমি অমুক মেয়েকে তোমার সাথে বিয়ে দিলাম। বর বলে, আমি কবুল করলাম। বেচা কেনার চুক্তিতে যেমন ইজাব কবুল হয়, বিয়েতেও তেমনি ইজাব কবুল হয়। তবে বেচা কেনার ইজাব কবুলের সময় খুতবা পড়া ও সাক্ষীর প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সাক্ষী ছাড়া বিয়ে হয় না। আর বিয়ের জন্য খুতবা পড়াকে নবী সা. সুন্নাত করে দিয়েছেন। অবশ্য খুতবা ছাড়াও বিয়ে হয়ে যায়।

বিয়ে একটি ইবাদত

আল্লাহ তাআলা বিয়ের মধ্যে দু'টি দিক রেখেছেন। একটা সামাজিক চুক্তি, আরেকটা ইবাদত। কারণ স্বয়ং বিয়েই একটা ইবাদত। ইমাম আবু হানীফা রহ. বলতেন– 'বিয়েতে মুআমালার থেকে ইবাদতের শান গালেব বা প্রবল।'

মোটকথা, আল্লাহ তাআলা বিয়েকে একটি ইবাদত হিসেবে রূপ দিয়েছেন। আর ইবাদত হওয়ার কারণে নবী সা. এতে খুতবা পড়াকে সুন্নাত বলেছেন।

বিয়ের খুতবার তিন আয়াত

বিয়ের খুতবায় তিনটি আয়াত পড়া সুন্নাত। কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যায় যে এ আয়াতগুলোতে সরাসরি বিয়ের আলোচনা নেই। অথচ পবিত্র কুরআনে বিবাহের আলোচনা সমৃদ্ধ অনেক আয়াত রয়েছে এবং নিকাহ (বিয়ে) শব্দও উল্লেখ রয়েছে। আমার আব্বা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ

বলতেন– চিন্তার বিষয় হল, নবী সা. অন্যান্য আয়াত রেখে এই তিন আয়াতকে বিশেষভাবে কেন নির্বাচন করলেন। এটা বোঝার জন্য সর্বপ্রথম আয়াতের অর্থ দেখা বাঞ্ছনীয়।

প্রথম আয়াত

বিয়ের খুতবা প্রথম যে আয়াতটি তেলাওয়াত করা হয়, সেটি সূরা নিসার প্রথম আয়াত-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

'হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্ট করেছেন।' এক ব্যক্তি দ্বারা হযরত আদম আ. উদ্দেশ্য। 'এবং যিনি তা থেকে তার সঙ্গিনী হযরত হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন। আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী।' এরপর বলেন, 'আর আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট কিছু চাও।' কেউ অন্যের থেকে তার হক চাইতে হলে বলে– আল্লাহর ওয়াস্তে আমার হক আমাকে দেও। এজন্য বলা হয়েছে, যে আল্লাহর দোহাই দিয়ে তোমরা তোমাদের হক চাও, তাকে ভয় কর। যেন ঐ সমস্ত হক আদায়ে তার হুকুমের খেলাফ কোন কাজ প্রকাশ না পায়। এরপর বলেন, এবং আত্মীয়-স্বজনদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। যেন তাদের হক পদদলিত না হয়। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন এবং তোমাদের প্রতিটি আচরণ লক্ষ্য করছেন।

দ্বিতীয় আয়াত

দ্বিতীয় আয়াতটি সূরা আল ইমরানের–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাক এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ কর না।'

(সূরা ৩ আলে ইমরান, আয়াত-১০২)

আল্লাহর ফরমাবরদার ও তাঁর অনুগত হও। অর্থাৎ সারাাা জীবন তাঁর ইবাদত-বন্দেগীত ব্যয় কর। যেন মৃত্যুর সময় তুমি আল্লাহর নিকট ফরমাবরদার ও অনুগত হও।

তৃতীয় আয়াত

তৃতীয় আয়াত সূরা আহযারের–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا – يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ

وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। এমন করলে আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য তোমাদের আমলকে সংশোধন করে দিবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।'

(সূরা ৩৩ আহযাব, আয়াত-৭০, ৭১)

নবী সা. বিয়ের খুতবায় এ তিন আয়াত পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এখন চিন্তার বিষয় হল, বিয়ে সংক্রান্ত অনেক আয়াত থাকা সত্ত্বেও বিয়ের সময় এ তিন আয়াতকে কেন নির্বাচন করলেন। অথচ এ আয়াতত্রয়ের কোথাও বিয়ের আলোচনা নেই।

আয়াতত্রয়ে তাকওয়ার আলোচনা

কিন্তু এ তিন আয়াত নিয়ে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, আয়াতত্রয়ে তাকওয়ার আলোচনা রয়েছে এবং তিনটি আয়াতই তাকওয়ার আলোচনা দ্বারা শুরু করা হয়েছে।

বিয়ের সময় বিশেষভাবে তাকওয়ার গুরুত্ব এজন্য দেয়া হয়েছে যে, মানুষ সাধারণত বিয়ের বিষয়টিকে দ্বীন বহির্ভূত মনে করে। এতদসংক্রান্ত শরীয়তের বিধানাবলীকে পিছনে নিক্ষেপ করে। বিয়ের আগে, বিয়ের সময় ও বিয়ের পরেও এ বিধানাবলীর প্রতি লক্ষ্য করা হয় না। এ কারণেই বিয়ের সময় বিশেষভাবে এ বিষয়ে তাকিদ করা হচ্ছে যে, 'তাকওয়া অবলম্বন কর'। কারণ চিন্তা করলে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, মূলতঃ বৈবাহিক সম্পর্ক ততক্ষণ পর্যন্ত সঠিক অর্থে আনন্দময় হয় না, যথক্ষণ পর্যন্ত অন্তরে তাকওয়া তথা খোদভীতি বিদ্যমান না থাকে। তাকওয়া ছাড়া পরস্পরের হক সঠিকভাবে আদায় হতেই পারে না।

দাম্পত্য জীবনের তিনটি সময়। ১. বিয়ের পূর্বে। ২. বিয়ের সময়। ৩. বিয়ের পর। এ তিন সময় আমরা দ্বীনকে পিছনে নিক্ষেপ করি। ব্যাস, এতটুকু প্রয়োজন মনে করি যে, বিয়ের সময় কোন মৌলবীকে ডেকে, তাকে দিয়ে আয়াত পড়ায়ে, খুতবা পড়ায়ে বিয়ে সম্পন্ন করি। কিন্তু বিয়ের পূর্বে কি কাজ

করেছে, ঠিক বিয়ের সময় কি কাজ করছে? এবং বিয়ের পর কি করবে? সে বিষয়ে আল্লাহ ও তার সাথে কোন সম্পর্ক নেই। অথচ বিবাহ একটি ইবাদত। একটি পূণ্যের কাজ।

বিয়ে জৈবিক চাহিদা পূরণের সহজ পথ

আল্লাহ তাআলা ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বিবাহকে এত সহজ করে দিয়েছেন যে, এর থেকে সহজতর আর কোন কাজ হতে পারে না। কারণ আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যে দ্বীন প্রদান করেছেন, তাতে আমাদের 'নাফসিয়্যাতের' প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

বিষয়টি একদম স্পষ্ট যে, আল্লাহ তাআলা নারী পুরুষের অন্তরে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ রেখেছেন। এ আকর্ষণের ফলে মানুষের ফিতরাতের দাবি হল, নারী পুরুষ উভয়ের জীবন এক সাথে অতিবাহিত করা।

কিছু কিছু ধর্মের বক্তব্য হল, এ আকর্ষণ শয়তানী চাহিদা। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত এ শয়তানী চাহিদা না মেটানো হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর নৈকট্য অর্জিত হবে না। যাহোক ঐ ধর্মগুলো রুহবানিয়ত তথা সন্নাসীকে গ্রহণ করেছে। এবং বলে দিয়েছে বিয়ে না করে একা একা জীবন কাটিয়ে দিতে। কিন্তু ফিতরাতের দ্বীন 'ইসলাম' জানত যে, এ আকর্ষণ ফিতরাতের অন্তর্ভূক্ত। ফিতরাতের সাথে বিদ্রোহ করলে গলদ, না জায়েয ও হারামের পথ ধরবে।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে– 'হে নবী! আপনার পূর্বেও নবী প্রেরণ করেছিলাম। আমি তাদেরকে স্ত্রী সন্তানও দান করেছিলাম। সুতরাং জীবনযাপন স্ত্রী সন্তানাদী ছেড়ে নয়, বরং তাদেরকে নিয়েই জীবনযাপন করতে হবে। কারণ এটা সৃষ্টিগত দাবি। এজন্যই আল্লাহ তাআলা এই জন্মগত দাবি পূরণের বৈধ পথ এত সহজ করে দিয়েছেন যে, এতে কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা নেই।

বিয়ের জন্য খুতবা শর্ত না

এমনকি বিয়ের সময় খুতবা পড়াও আবশ্যক নয়। ওয়াজিব ফরযও না। তবে সুন্নাত। দু'জন পুরুষ অথবা দু'জন মহিলা ও একজন পুরুষের উপস্থিতিতে যদি কোন ছেলে মেয়ে ইজাব কবুল করে, তাহলেই বিয়ে হয়ে যাবে, তারা পরস্পরের জন্য হালাল হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা বিয়েকে এত সহজ এজন্য করে দিয়েছেন, যেন মানুষের জৈবিক চাহিদা বৈধ পথে খুব সহজে পূর্ণ হয়। কোন রকম জটিলতা না থাকে। বিয়ের জন্য বাগধান, মেহেদীও শর্ত না। পর্ব অনুষ্ঠানও শর্ত না। কাউকে ডাকাও শর্ত না।

বরকতপূর্ণ বিয়ে

রাসূলুল্লাহ সা. এক হাদীসে ইরশাদ করেন–

إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً

'যে বিয়ে যত সহজ, যত অল্প খরচ যে বিয়েতে হয়, সে বিয়ে তত বেশি বরকতপূর্ণ।' (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস-২৩৩৮৮)

বিয়ে কখনোই কষ্টকর করা ঠিক না বরং অনাড়ম্বর ও অকৃত্রিমভাবে বিয়ে করা উচিত। এ ধরনের বিয়েতে আল্লাহ তাআলা বেশি বরকত দান করেন।

বিয়েকে আমরা বিপদ বানিয়েছি

কিন্তু কি আশ্চর্য, শরীয়ত বিয়েকে যত সহজ বানিয়েছিল আমরা ততটুকুই জটিল বানিয়েছি। বর্তমান বিয়ে করা একটা আযাব। মাস বছর পূর্ব থেকে প্রস্তুতি না নিলে, লক্ষ টাকা ব্যয় না করলে বিয়েই হয় না। দেখুন নবী সা.-এর সময়ে কত সহজে বিয়ে হয়ে যেত।

অনাড়ম্বর বিয়ের একটি ঘটনা

মশহুর সাহাবী হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ রাযি., যার সম্পর্কে নবী সা. স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন– আবদুর রহমান বিন আউফ জান্নাতী। প্রত্যেক সাহাবীর সাথে নবী সা.-এর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক থাকলেও আশারায়ে মুবাশশারা (জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ সাহাবী) সাহাবীগণ ছিলেন সবচেয়ে বেশি কাছের ও অন্তরঙ্গ। হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ তাঁদেরই একজন।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, একবার তিনি নবী সা.-এর দরবারে হাজির হলে নবী সা. তার জামায় হলদে দাগ দেখতে পান। নবী সা. তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন তোমার কাপড়ে এ দাগ কিসের! উত্তরে তিনি বললেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি বিয়ে করেছি। বিয়ের সময় খোশবু লাগিয়েছিলাম, এটা তারই দাগ। নবী সা. তার জন্য দুআ করে বললেন–

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ

'আল্লাহ তাআলা তোমাকে বরকত দিন।'

এরপর রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করলেন–

أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

'অলিমা খাওয়াবে, যদিও এক বকরী দিয়ে হোক।'

(বুখারী শরীফ, হাদীস-৪৭৫৮)

এ অনাড়ম্বরতা আপনিও গ্রহণ করুন

এখন আপনারাই ভাবুন, হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ রাযি. ছিলেন মুহাজির সাহাবী। রাসূলুল্লাহ সা.-এর দূরবর্তী আত্মীয় এবং জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সা.কেও দাওয়াত দেননি। বরং বিয়ের পর রাসূলুল্লাহ সা. তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছেন যে, আমি বিয়ে করেছি। আর নবী সা.ও অভিযোগ করে বলেননি যে, তুমি একা একা বিয়ে করলে, আমাদেরকে জানালেও না! বরং বরকতের দুআ করেছেন– 'আল্লাহ তাআলা তোমাকে বরকত দিন।'

তবে একটি বকরী দিয়ে হলেও অলিমা করতে বলেছেন। আপনারাই দেখুন, বিয়ের অনুষ্ঠানে নবী সা.কে পর্যন্ত দাওয়াত দেয়া প্রয়োজন মনে করেননি। এত অনাড়ম্বরভাবে বিয়ে করেছেন।

বর্তমান কেউ যদি তার ঘনিষ্ট ব্যক্তিদেরকে না জানিয়ে বিয়ে করে, তাহলে কত রকমের অভিযোগই না ওঠে। 'অমুক একা একাই বিয়ে করল, আমাদের জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করল না?' কিন্তু নবী সা.কোন অভিযোগই করেননি।

হযরত জাবেরকে পুরস্কৃত করার ঘটনা

হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ রাযি. ছিলেন আনসার সাহাবী। তিনি রাসূলুল্লাহ সা.-এর খুব প্রিয় সাহাবী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে তার বড় গভীর সম্পর্ক ছিল। তাঁর একটি ঘটনা বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি গাযওয়ায়ে বনী মুস্তালাক থেকে জিহাদ করে ফিরছিলেন। তার উট ছিল একেবারে ধীরগতি সম্পন্ন। চলতে চলতে থেমে যাচ্ছিল। তিনি দ্রুত চলার জন্য চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু সে কিছুতেই চলছিল না। পুরা কাফেলা আগে আগে চলত আর তিনি একেবারে পিছে পড়ে থাকতেন।

রাসূলুল্লাহ সা. এ বিষয়টি লক্ষ্য করে তাঁর নিকট গেলেন এবং সে কেন কাফেলার সাথে চলতে পারছে না– তার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সা.কে বললেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! উটটি চলছে না। আমি দ্রুত চালানের চেষ্টা করলেও পিছেই রয়ে যাচ্ছে।

নবী সা. কাছেই একটি ঝাড় থেকে একটি ডাল ভাংলেন এবং ঐ ডাল দিয়ে চাবুকের মত করে হাল্কাভাবে উটকে আঘাত দিলেন। নবী সা. আঘাত দেয়ার সাথে সাথে উট যেন হাওয়ার গতি পেয়ে যায়। খুব দ্রুত চলা আরম্ভ করে। এমনকি পুরা কাফেলাকে ছাড়িয়ে সামনে চলে যায়। রাসূলুল্লাহ সা.

আবার তাঁর নিকট যান এবং তাকে বলেন– তোমার উট তো এখন খুব দ্রুত চলছে!

হযরত জাবের বললেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ আপনার বরকতে এত গতি সম্পন্ন হয়েছে যে, সবার আগে চলে এসেছে।

নবী সা. তাকে বললেন– উটটি খুব চমৎকার। তুমি কি এ উটটি আমার নিকট বিক্রি করবে। হযরত জাবের রাযি. বললেন– বিক্রির কথা বলছেন কেন, আপনার পছন্দ হলে আমার পক্ষ থেকে হাদিয়া হিসাবে গ্রহণ করুন।

নবী সা. বললেন– হাদিয়া না, দাম দিয়ে নেব। তুমি যদি বিক্রি করতে চাও, তাহলে বিক্রি করে দাও। হযরত জাবের রাযি. বললেন– আপনি যদি কিনতেই চান, তাহলে যে দামে ইচ্ছা আপনি কিনে নিন।

নবী সা. বললেন – না, তুমিই বল, কী দামে বিক্রি করবে। হযরত জাবের রাযি. বললেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটাকে এক আওকিয়া চাঁদীর বিনিময়ে বিক্রি করব। ('আওকিয়া' চাঁদীর একটা ওজনের নাম, যা প্রায় চল্লিশ দেরহামের সমপরিমাণ)

নবী সা. বললেন– 'তুমি অনেক বেশি দাম চেয়েছ, এ দামে বড় বড় উট পাওয়া যায়।' তিনি বললেন– 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যত ইচ্ছা দিতে পারেন।

নবী সা. বললেন, ঠিক আছে এক আওকিয়া দিয়েই কিনলাম। তবে হ্যাঁ, মূল্য আমি মদীনায় গিয়ে দেব।

এরপর হযরত জাবের রাযি. উট থেকে নেমে দাঁড়িয়ে যান। নবী সা. তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি উট থেকে নামলে কেন? হযরত জাবের রাযি. বললেন, এ উটতো আপনি কিনে নিয়েছেন। এটাতো এখন আপনার।

নবী সা. বললেন, তুমি কি এখন মদীনায় হেঁটে যাবে? এক কাজ কর, তুমি এ উটেই মদীনাও চল। ওখানে যাওয়ার পরই তোমার থেকে এ উট নেব, আর দামও দিয়ে দেব।

মদীনায় পৌঁছার পর হযরত জাবের রাযি. উটটি নবী সা.-এর নিকট পাঠিয়ে দেন। কিন্তু নবী সা. সে উটও তাকে ফেরত দেন এবং সাথে এক আওকিয়া চাঁদীও দেন। এটা মূলত তাকে পুরস্কৃত করার একটা বাহানা ছিল মাত্র।

অনাড়ম্বর বিয়ের দ্বিতীয় ঘটনা

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, উট যখন দ্রুত গতিতে চলছিল, নবী সা.ও তার সাথে চলছিলেন। নবী সা. তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন– ভাই! তুমি কি বিয়ে করেছ? হযরত জাবের রাযি. বললেন– হ্যাঁ, যুদ্ধে যাবার আগে বিয়ে করেছি।

রাসূলুল্লাহ সা. আবার জিজ্ঞাসা করলেন 'কুমারী মেয়েকে বিয়ে করেছ, নাকি বিধবা মেয়েকে? তিনি বললেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি একজন বিধবা মেয়েকে বিয়ে করেছি।

রাসূলুল্লাহ সা. আবার জিজ্ঞাসা করলেন– কুমারী মেয়েকে বিয়ে করলে না কেন? তিনি উত্তরে বললেন– আসল ব্যাপার হল– আমার আব্বা ইন্তেকাল করেছেন। আমার ছোট ছোট অনেকগুলো বোন রয়েছে। এজন্য আমি এমন একজন মেয়ে খুঁজছিলাম, যে তাদেরকে দেখা শোনাও করতে পারবে। অল্প বয়স্ক মেয়ে বিয়ে করলে সে তাদেরকে দেখা শোনা করতে পারত না। এজন্য আমি বিধবা মেয়ে বিয়ে করেছি। যাহোক রাসূলুল্লাহ সা. তাঁর এ কথা শুনে তার জন্য দুআ করলেন–

بَارَكَ اللهُ لَكَ

'আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে বরকত দিন এবং তোমরা প্রেম ও ভালবাসাপূর্ণ জীবন যাপন কর।' (বুখারী শরীফ, হাদীস-৪৯৪৮)

আপনারা একবার ভাবুন, হযরত জাবের রাযি. যুদ্ধে যাওয়ার পূর্বে মদীনায় বিয়ে করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ সা. মদীনাতেই ছিলেন। এরপর যুদ্ধ চলাকালিন তিনি রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাথেই ছিলেন। এরপর যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে রাসূলুল্লাহ সা. জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন– আমি বিয়ে করেছি। তিনি বিয়ের অনুষ্ঠানে রাসূলুল্লাহ সা.কে ডাকার প্রয়োজন মনে করেননি। আর রাসূলুল্লাহ সা.ও অভিযোগ করেননি যে, তুমি চুপে চুপে বিয়ে করলে কেন? আমাকে দাওয়াত দিলে না কেন?

অন্যকে ডাকার গুরুত্ব

নবী সা.-এর পুরা 'সীরাতে তাইয়্যেবায়' বিয়ের অনাড়ম্বরতা দেখলে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ সা. বিয়েকে যেমন সহজ সরল রেখেছিলেন, সাহাবায়ে কেরামও তেমনি সহজ সরল ও অনাড়ম্বর রেখেছিলেন। তার অর্থ আমি এ কথা বলছি না যে, বিয়ের সময় বড়দেরকে বা আত্মীয়-স্বজনদেরকে

ডাকা হারাম বা না জায়েয। আপনি বড়দেরকে ডাকুন, আত্মীয়-স্বজনদেরকে ডাকুন। তবে সহজতা, সরলত ও অনাড়ম্বরতা বজায় রাখুন।

হযরত ফাতেমা রাযি.-এর বিয়ের সময় নবী সা. বললেন– আবু বকর রাযি. এবং ওমর রাযি.কে ডেকে আন। এখনই বিয়ে হবে। রাসূলুল্লাহ সা. এ ধরনের বিশেষ বিশেষ লোকদেরকে ডেকে আনেন। সুতরাং বিয়ের সময় আত্মীয় স্বজন ও বড়দের ডাকা অবৈধ নয়। কিন্তু বিয়ের মধ্যে এমন গুরুত্ব দেয়া যে, যতক্ষণ পর্যন্ত অমুক না আসবে, যতক্ষণ পর্যন্ত অমুক শর্ত পুরা না করা হবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত অমুক অমুক প্রথা পালন না করা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বিয়ে হবে না। বিয়েতে এ ধরনের গুরুত্ব আরোপের কোন অবকাশ নেই।

বর্তমান আমরা হালালকে কষ্টকর বানিয়েছি

বর্তমান আমরা বিয়েকে কষ্টকর বানিয়েছি। ফলে হালালের দরজা বন্ধ করে দিচ্ছি। হারামের দরজা উন্মুক্ত হচ্ছে। বর্তমান কেউ হালাল পথ অবলম্বন করতে চাইলে তার পথে হাজারো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। লক্ষ টাকা না হলে সে হালাল পথ অবলম্বন করতে পারে না। ফলে তারা হারাম পথ গ্রহণ করে, যার দরজা সদা উন্মুক্ত। ফলে সমাজে ফেতনা ফাসাদ ও অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ছে। অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটছে।

তিন ক্ষেত্রে বিলম্ব না করা

আরেকটি হাদীস স্মরণ রাখার মত। সেটি হল– নবী সা. হযরত আলী রাযি.-এর উদ্দেশ্যে বলেন–

ثَلَاثٌ لَا تُؤَخِّرْهَا

'তিনটি জিনিসের ক্ষেত্রে বিলম্ব করবে না।' (তিরমিযী শরীফ, হাদীস-১৫৬)

এক. الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ

'নামাযের মুস্তাহাব ওয়াক্ত শুরু হলে নামাযের বিলম্ব করবে না।'

বরং যত দ্রুত সম্ভব নামায পড়ে নিবে। পরবীতে সময় পাওয়া যাক বা না যাক, অবস্থা অনুকূলে থাক বা না থাক।

দুই. الْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ

'জানাযা তৈরি হয়ে গেলে জানাযার নামায পড়তে বিলম্ব না করা।'

জানাযার নামায তাড়াতাড়ি পড়ার হুকুম এতই গুরুত্ববহ যে, ফুকাহায়ে কেরাম লেখেন– জামাত তৈয়ার, এমন অবস্থায়ও যদি জানাযা আসে তাহলে প্রথমে ফরয আদায় করা, এরপর জানাযার নামায আদায় করা, এরপর সুন্নাত আদায় করা। কিছু কিছু ফকীহ বলেছেন, ফরযের পর সুন্নাত পড়াতো জায়েয আছে। কিন্তু জানাযা জাতিয় আরো নফল পড়া জায়েয নেই। এ মতের উপরই ফতওয়া। সাধারণ মানুষ এ মাসআলা জানে না। যার কারণে জানাযা নামাযের এলান করা সত্ত্বেও অনেকে ফরযের পর নফল পড়তে আরম্ভ করে। অথচ নফলের জন্য জানাযার নামায বিলম্ব করা জায়েয নেই।

তিন. اَلْأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْئًا

'অবিবাহিত মেয়ের উপযুক্ত বর পেলে তার বিয়েতে বিলম্ব করবে না।'

সুতরাং এই তিন ক্ষেত্রে বিলম্ব না করা উচিত। উপযুক্ত সম্পর্ক পাওয়ার পরও বিয়ে না দিলে ফেতনা ফাসাদ সৃষ্টি হবে। নবী সা. ইরশাদ করেন–

إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ

إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

'দ্বীন ও চরিত্র পছন্দ হয়, এমন ব্যক্তি বিয়ের প্রস্তাব দিলে তার সাথে বিয়ে দাও। নতুবা পৃথিবীতে ফেতনা ফাসাদ ছড়িয়ে পড়বে।'

(তিরমিযী শরীফ, হাদীস-১০০৪)

আর সেই ফেতনা ফাসাদ হল, হালাল পথ রূদ্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে হারাম পথ উন্মুক্ত হয়ে যাবে।

অনার্থক প্রথা পরিহার করুন

এ কারণে শরীয়ত বিয়েকে যে পরিমাণ সহজ করে দিয়েছে, আমরা সে পরিমাণই জটিল বানিয়ে নিয়েছি। আযাব ও লৌকিকতা বানিয়ে ফেলেছি।

আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন, কত রকম রীতি ও প্রথা আমরা বিয়ের ক্ষেত্রে তৈরি করে নিয়েছি। প্রথমে বাগদান হতে হবে। বাগদানে অমুক অমুক প্রথা পালন করতে হবে। বিয়ের পূর্বে মেহেদী অনুষ্ঠান হতে হবে। গায়ে হলুদ হতে হবে। এ প্রথাসমূহ ছাড়া বিয়ে হতে পারে না। এগুলো আমরা নিজেদের পক্ষ থেকে বাড়িয়ে নিয়েছি। যার কারণে বর্তমানের বিয়েগুলো বরকতময় হচ্ছে না।

ঘোষণা দিয়ে বিয়ে করুন

দ্বিতীয় হল– বিয়ের সময়ের কাজসমূহ। আমি আগেই বলেছি বিয়ে একটি ইবাদত। হাদীস শরীফে নবী সা. ইরশাদ করেন–

أَعْلِنُوا النِّكَاحَ

'তোমরা বিয়ের ঘোষণা দাও।' (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস-১৫৫৪৫)

বিয়ের ঘোষণা হওয়া উচিত। হালাল হারামের মধ্যে এটাই পার্থক্য যে, হারাম কাজ লুকিয়ে, চুরি করে ও গোপনে করা হয়। এজন্য বিয়ের ক্ষেত্রে শরীয়ত ঘোষণা দেয়াকে আবশ্যক করেছে, যেন মানুষ জানতে পারে, অমুকের সাথে অমুকের বিয়ে হয়েছে। এরপর ইরশাদ করেন– বিয়ে হল ইবাদত, আল্লাহ তাআলার নির্দেশ পালন এবং নবী সা.-এর সুন্নাত অনুযায়ী আমল। সুতরাং নামায যেভাবে ইবাদত, তেমনিভাবে বিবাহও ইবাদত। এ কারণে বিয়ে মসজিদে সম্পন্ন করার তাকিদ দেয়া হয়েছে।

বিয়ের পর মসজিদে হৈ চৈ

কিন্তু আরেকটি মাসআলা শুনুন। হুজুর সা. নবী হওয়া হিসেবেই তার দৃষ্টি সেখান পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। সেটা হল– অন্য এক হাদীসে নবী সা. যেখানে ইরশাদ করেন– 'মসজিদে বিয়ে সম্পন্ন কর।' সেখানে একথাও ইরশাদ করেছেন, 'বাজারের মত হৈ চৈ থেকে দূরে থাক।'

বর্তমান আমাদের মাঝে মসজিদে বিয়ে সম্পন্ন করার রেওয়াজ তো আছে। কিন্তু এ হাদীসের মাধ্যমে নবী সা. এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, বিয়ে তো মসজিদে হবে, কিন্তু বিয়ের কারণে যেন মসজিদে হট্টগোল না হয়। বর্তমান এদিকে খেয়াল করা হয় না, বরং বিয়ের অনুষ্ঠানের পর হৈ চৈ শুরু হয়ে যায়।

নবী সা.-এর দৃষ্টি মুবারক যেহেতু দেখতেছিল যে, মানুষ যখন এর উপর আমল করবে, তখন যেন গুণাহে লিপ্ত না হয়, এ কারণে নবী সা. পূর্বেই সর্তক করে দিয়েছেন যে, মসজিদকে বাজারের মত হৈ চৈ থেকে রক্ষা কর।

ইবাদতে গুনাহর মিশ্রণ

সুতরাং বিয়ে যখন ইবাদত, তখন গুনাহের মিশ্রণ থেকে সেই ইবাদত পবিত্র হওয়া উচিত। ইবাদতও হচ্ছে, সাথে সাথে হারাম কাজও হচ্ছে, গুনাহও হচ্ছে– এটা বিস্ময়ের বিষয় বৈকি? যেমন কেউ নামাযও পড়ছে আবার

নামাযের মধ্যে গানও শুনছে। এটা কল্পনাতীত বিষয়। একজন মানুষ যত খারাপই হোক না কেন, কমপক্ষে নামাযের সময় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা সে অবশ্যই করবে। নামায পড়ার সময় সামনে ছবি থাকলে সরিয়ে দেবে। সঙ্গীত বাজতে থাকলে বন্ধ করে দিবে।

ইন্ডিয়াতে এমন হয় যে, কোন কাফের নামাযের সময় মসজিদের সামনে গান-বাজনা বাজালে ঝগড়া বেঁধে যায়। মুসলমানরা এর জন্য জীবন পর্যন্ত দিয়ে দেয়। আর এখন তো মাশা-আল্লাহ মসজিদের সামনে গান বাজনা শুরু হয়ে গেছে। এজন্য কমপক্ষে ঠিক নামাযের সময় ও ইবাদতের সময় আমাদের খেয়াল রাখা উচিত, অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করা উচিত, যেন ইবাদতের সময় কোন গুনাহের কাজ না হয়।

বিয়ের অনুষ্ঠান গুনাহ মুক্ত হোক

সুতরাং বিয়ে ইবাদত হওয়ার দাবি হল, বিয়ের মাহফিল– যা ইবাদতের মাহফিল, সুন্নাত আদায়ের মাহফিল, সাওয়াবের মাহফিল এবং যে মাহফিলে আল্লাহ তাআলার রহমত-বরকত নাযিল হতে থাকে– কমপক্ষে সে মাহফিলকে গুনাহমুক্ত করা, বর্তমান আমরা এ ধরনের মাহফিলকে সব ধরনের পাপের কেন্দ্রবিন্দু বানিয়ে ফেলেছি। নারী পুরুষের অবাধ মেলা মেশা চলছে, নারীরা সেজে গুজে অনুষ্ঠানে আসছে। আবার সাথে বিয়ের ইবাদতও হচ্ছে, এটা কেমন ইবাদত হচ্ছে? নবী সা.-এর কেমন সুন্নাত আদায় করা হচ্ছে?

আয়াত পাঠের মাধ্যমে নির্দেশ তো দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহকে ভয় কর। আর বিয়ে সম্পন্ন করতে গিয়ে যদি পাপে নিমজ্জিত হন, তাহলে সে বিয়েতে কি করে বরকত হবে? বরকত তো তখনই হবে, যখন বিয়ের সময়ও আল্লাহর আনুগত্য করা হবে এবং সেটাকে অনাড়ম্বরভাবে সম্পন্ন করা হবে, তাতে কোন গুনাহর কাজ হবে না। অনুষ্ঠানে মানুষকে ডাকা কোন হারাম না। সম্ভব হলে দাওয়াত করুন। কিন্তু গুনাহর কাজ থেকে বিরত থাকুন। কারণ– বিবাহর উদ্দেশ্যই হল মানুষের জন্মগত চাহিদা পূরণের জন্য বৈধ পন্থার ব্যবস্থা করা। তাতে গুনাহর কাজ করলে সেটা হবে বিয়ের উদ্দেশ্যের খেলাফ, এজন্য বিয়ের মাহফিলে গুনাহর কাজ থেকে পরহেজ করা উচিত।

সুখী দম্পতির জন্য তাকওয়া প্রয়োজন

তৃতীয় কথা হল– বিয়ের পর তাকওয়া অবলম্বন করা। আমার আব্বা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. বলতেন– অন্তরে তাকওয়া ও

খোদাভীতি না থাকলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক আনন্দময় হবে না। দেখুন! স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক এত গভীর হয়, যা অন্য কারো হয় না। উভয়ে একে অপরের এত কাছাকাছি চলে আসে, যা অন্যের ব্যাপারে কল্পনা করা যায় না। দু'জনের সম্পর্ক এমন যে, অন্য কেউ সেখানে আসতে পারে না। সুতরাং নির্জনতার এ সময়ে একে অন্যকে কষ্ট দিলে অথবা কারো হক নষ্ট করলে, তাকে বাধা দেয়ার কেউ নেই।

অনেক হক এমন আছে, যেগুলো কেউ নষ্ট করলে পুলিশের মাধ্যমে তা উসূল করা যায়। অথবা আদালতের মাধ্যমে সে হক উসূল করা যায়। কিন্তু স্বামী স্ত্রীর বেশির ভাগ হক এমন যে, সেগুলো না পুলিশের মাধ্যমে উসূল করা যায়, না আদালতের মাধ্যমে উসূল করা যায়। আদালত বেশির থেকে বেশি স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ ও মহরের টাকা আদায় করে দিতে পারে। কিন্তু স্বামী যদি ঘরে এসে মুখ ভার করে থাকে, উপহাস ও ঠ্যাস মেরে কথা বলে– এ দুঃখ কোন আদালত, কোন পুলিশ দূর করবে?

একমাত্র খোদাভীতিই হক আদায় করতে পারে

দুঃখ দূর করার মত বস্তু একটাই সেটা হল– খোদাভীতি। স্বামীর অন্তরে একথা যদি অনুভূত হয় যে, আল্লাহ তাআলা স্ত্রীর অস্তিত্বকে আমার সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। আমার দায়িত্বে তার কিছু হক রয়েছে, যা আমাকে আদায় করতে হবে। আদায় না করলে আল্লাহর কাছে ধরা পড়তে হবে। এ অনুভূতি যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরে না থাকবে, মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত তার হকসমূহ আদায় করতে পারবে না। এ হক আদালতও দিতে পারে না, পুলিশও দিতে পারে না।

হিংস্র প্রাণীর গুণ

আমার এক সহপাঠি একবার গর্ব করে বলতেছিল, আমি ঘরে ঢোকার পর আমার স্ত্রী ও সন্তানদের এ সাহস নেই যে, তারা আমার সাথে কোন প্রকার কথা বলে, অথবা আমার হুকুম লঙ্ঘণ করে। সে তার বাহাদুরী বর্ণনা করতে গিয়ে এ কথা বলে। আমি তাকে বললাম, আপনি আপনার যে গুণ বর্ণনা করলেন, এটা হিংস্র প্রাণীর গুণ, মানুষে গুণ না। মানুষের গুণ তো সেটা, যা নবী সা. সম্পর্কে হযরত আয়েশা রাযি. বর্ণনা করেছেন। নবী সা. যখন ঘরে তাশরিফ আনতেন, তখন তার চেহারা মুবারক ঝলমল করত, হাসি লেগে থাকত। আর আমি যতদিন নবী সা.-এর সাথে কাটিয়েছি, এর মধ্যে কখনোই তিনি আমার সাথে রূঢ় আচরণ করেননি।

আজ পর্যন্ত স্বর পরিবর্তন করে কথা বলিনি

এটা হল মানুষের কাজ, যা নবী সা. করে দেখিয়েছেন। অন্তরে তাকওয়া ও খোদাভীতি না থাকলে এ কাজ কখনোই সম্ভব না। আমার শায়েখ হযরত ডাক্তার আবদুল হাই সাহেব রহ. তাঁর অভ্যাস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমার বিয়ের বয়স ৫৫ বছর হয়ে গেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত পরিবারের সদস্যদের সাথে রাগান্বিত অবস্থায় স্বর পরিবর্তন করে কথা বলার সুযোগ হয়নি। মানুষ বাতাসে উড়া বা জ্বলন্ত আগুনের মধ্য দিয়ে চলাকে কারামত মনে করে। কিন্তু আসল কারামত হল– স্বামী স্ত্রীর এত গভীর সম্পর্ক হওয়া সত্ত্বেও ৫৫ বছর অতিবাহিত হয়েছে– কখনো স্ত্রীর সাথে স্বর পরিবর্তন করে রেগে কথা বলার ঘটনা ঘটেনি।

স্বয়ং ডাক্তার সাহেবের আহলিয়া মুহতারামা বলতেন যে, সারা জীবনে হযরত আমাকে কখনো কোন কাজ করার হুকুম দেননি। যেমন কখনো এমন বলেননি– পানি পান করাও অথবা এ কাজ কর। বরং আমি আগ্রহ করে কোন কাজ করলে করেছি। স্ত্রীর সাথে স্বর পরিবর্তন করে কখনোই কথা না বলার ইহতিমাম ততক্ষণ পর্যন্ত হতে পারে না, যতক্ষণ অন্তরে খোদাভীতির প্রহরী না থাকবে। তাকওয়ার প্রহরী না থাকবে। এজন্য এ কাজ পুলিশ দ্বারাও সম্ভব না। আদালত দ্বারাও সম্ভব না।

স্ত্রীর হাত কে ঠেকাতে পারে

এমনিভাবে স্ত্রী যদি স্বামীকে কষ্ট দেয়, তখনো তার হাত ধরার কেউ নেই। কোন আদালত, কোন পুলিশ তাকে বাধা দিতে পারবে না। একমাত্র তাকওয়া ও খোদাভীতিই স্ত্রীকে এ কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে। এজন্য জীবনে দুটি পথের মিলনের এই নাযুক মুহূর্তের মাসনুন খুতবায় এমন সব আয়াত নির্বাচন করেছেন, যাতে তাকওয়া অবলম্বনে খোদাভীতি সৃষ্টি ও আল্লাহর সামনে জবাব দেয়ার অনুভূতি পয়দা করার তাকিদ দেয়া হয়েছে। একমাত্র এর মাধ্যমে আপনারা পরস্পরের হক আদায় করতে পারেন। এটা ছাড়া অন্য কোনভাবেই অন্যের হক আদায় করা সম্ভব না।

প্রত্যেক কাজের শুদ্ধতা একমাত্র তাকওয়ায়

সত্য কথা হল তাকওয়া ও খোদাভীতি ছাড়া দুনিয়ার কোন কাজই সঠিক হতে পারে না। বিশেষ করে বৈবাহিক ব্যাপার ও স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের হক

তাকওয়া বিহীন শুদ্ধই হতে পারে না। মানুষের দৃষ্টি যদি নবী সা.-এর হায়াতে তাইয়্যেবায় থাকে, ইত্তেবায়ে সুন্নাতের স্পৃহা যদি অন্তরে থাকে, খোদাভীতি যদি অন্তরে বিরাজমান থাকে এবং আখেরাতে জবাবদিহির অনুভূতি যদি হৃদয়ে বিদ্যমান থাক, তবেই পরস্পরের হক আদায় সম্ভব। এজন্যই বলা হয়েছে আত্মীদের হক আদায়ে আল্লাহকে ভয় কর। সেখানে তার প্রত্যেক বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তুমি তাদের কার সাথে কী ধরনের আচরণ করেছ?

বিয়ে করা সুন্নাত

বিয়ের খুতবায় উল্লেখিত আয়াত ছাড়া কয়েকটি হাদীসও তেলাওয়াত করা হয়। আমি একটি হাদীস এটিও তেলাওয়াত করেছি যে, নবী সা. ইরশাদ করেন–

اَلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِيْ

'বিয়ে আমার সুন্নাত।' (ইবনে মাযাহ শরীফ, হাদীস-১৮৩৬)

এর মধ্যেমে এদিকে ইশারা করা হয়েছি যে, এটি দুনিয়াদারীর কাজই শুধু নয়, বরং আল্লাহ তাআলা এটাকে সাওয়াবের কাজও বানিয়েছেন।

এর দ্বারা এ কথা স্পষ্ট হয় যে, দুনিয়ার যে সমস্ত কাজকে আমরা দুনিয়াবী মনে করি, যদি একটু নিয়ত পরিবর্তন করি, দৃষ্টিভঙ্গি একটু পাল্টে ফেলি এবং তার কর্মপদ্ধতি যদি পরিবর্তন করে নেই, তাহলেই সেটা দ্বীন হয়ে যাবে। বিবাহও দ্বীন। বেচা-কেনা, ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষেত-খামার, চাকুরী-বাকুরী, স্ত্রী সন্তানের সাথে হাসি-আনন্দ করাও দ্বীন। তবে শর্ত হল, এ কাজগুলোতে আপনার নিয়ত থাকতে হবে আল্লাহকে রাজি করা, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা। তাহলে খাওয়া-দাওয়া, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প সব দ্বীনে পরিণত হবে।

বিয়ের মাধ্যমে দুই বংশের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন হয়

দ্বিতীয় হাদীস তেলাওয়াত করেছিলাম – নবী সা. ইরশাদ করেন– 'দুই বংশের সম্পর্ককে পোক্ত করার ক্ষেত্রে বিয়ের চেয়ে অধিক প্রভাবশালী কোন জিনিস নেই। সুতরাং দুই বংশের মধ্যে যদি সম্পর্ক থাকে, তাহলে সে সম্পর্ক স্থায়ী করার জন্য ঐ বংশের কিছু সদস্যের মধ্যে আত্মীয় সম্পর্ক স্থাপন করে দিলে সে সম্পর্ক আরো শক্তিশালী হয়। আল্লাহ তাআলা সে সম্পর্কের মধ্যে অধিক পরিমাণ বরকত দান করেন। তবে শর্ত হল উভয়দেরকে মুত্তাকী হতে হবে, পরস্পরের হকের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। নবী সা.-এর বহু বিবাহের

অন্যতম কারণ ছিল অধিক কবিলার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা, এ উদ্দেশ্যেই তিনি ঐ সমস্ত কবিলার মেয়েদেরকে বিয়ে করেন। সে যুগেও এ রেওয়াজ ছিল যে, পরস্পরের গভীর সম্পর্ককে বিয়ের মাধ্যমে আরো বেশি পোক্ত করা হত।

সৎ স্ত্রী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বস্তু সম্পদ

তৃতীয় যে হাদীসটি তেলাওয়াত করেছি, সেটা হল, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন–

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

'সমগ্র পৃথিবীটাই সম্পদ। আর দুনিয়ার সম্পদগুলোর মধ্যে উত্তম সম্পদ হল নেককার স্ত্রী।' (মুসলিম শরীফ, হাদীস-২৬৬৮)

কারণ আল্লাহ তাআলা পৃথিবীকে মানুষের উপকারের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর পৃথিবীর সবচে উত্তম উপকারী সম্পদ হল নেককার স্ত্রী। নেককার স্ত্রীকে নবী সা. সবচে বড় নেয়ামত বলেছেন।

পৃথিবীর জান্নাত

শাইখুল ইসলাম হযরত আল্লামা শিব্বীর আহমাদ উসমানী রহ. বলেন, দুনিয়ার জান্নাত হল স্বামী-স্ত্রীর এক হওয়া, নেক হওয়া। অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে মিল মহব্বতও যদি থাকে এবং উভয়ে যদি নেককারও হয়, তাহলে তাদের পার্থিব জীবন জান্নাত তুল্য। আর যদি কোন একটাও অনুপস্থিত থাকে, তাহলে তাদের দুনিয়াঁাই জাহান্নাম। কারণ এ অবস্থায় দুনিয়াঁা তিক্ত ও বিষাদ হয়ে যায় এবং এতে ঘৃণা জন্মে।

সৌভাগ্যের তিন আলামত

এ কারণেই নবী সা. ইরশাদ করেছেন – মানুষ যদি পৃথিবীর বুকে তিনটি জিনিস পায়, তাহলে সে ভাগ্যবান। ১. প্রশস্ত বাড়ী। ২. নেককার নারী। ৩. উত্তম সওয়ারী। আর এ তিনটি খারাপ হলে সেটা দূর্ভাগ্যের লক্ষণ। অর্থাৎ সমগ্র জীবনের জন্য কুলক্ষণ ও বিপদ। এ হাদীসের মাধ্যমে নবী সা. এ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন যে, স্বামীর স্ত্রী নির্বাচনের সময় ও স্ত্রীর স্বামী নির্বাচনের সময় বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা উচিত যে, সে কেমন মুত্তাকী। দ্বীনের উপর চলার আগ্রহ তার কেমন। কারণ এগুলো ছাড়া বৈবাহিক জীবনের উপকারিতা অর্জিত হতে পারে না।

বরকতপূর্ণ বিয়ে

চতুর্থ হাদীস তেলাওয়াত করেছিলাম– নবী সা. ইরশাদ করেন–

إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً

'যে বিয়ে যত সহজ, যত অল্প খরচ যে বিয়েতে হয়, সে বিয়ে তত বেশি বরকতপূর্ণ।' (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস-২৩৩৮৮)

অর্থাৎ যে বিয়ে যত বেশি কষ্ট ক্লেশ ও ব্যয়হীন, সে বিয়ে তত বেশি বরকতপূর্ণ। বিয়ে সহজ সরল অনাড়ম্বর হলে তাতে বেশি বরকত হবে।

মোটকথা নবী সা. বিয়ে সম্পর্কে এ সমস্ত ইরশাদ করেছেন। আর সত্যিকার অর্থে যদি তদ্বানুযায়ী আমল করা হয়, তবে দ্বীন দুনিয়ায় উভয়ের সফলতা। আজ আমাদের সমাজের চারপার্শ্বে যে খারাবী ও বিপর্যয় বিস্তার লাভ করেছে, তার মূল কারণ নবী সা.-এর এ সমস্ত বাণী থেকে উদাসীনতা।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে এসমস্ত বাণীর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

ধ্বংসাত্মক একটি ব্যাধি : হিংসা

শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী

অনুবাদ : মুহাম্মাদ রুহুল আমীন নাটোরী

প্রথম প্রকাশ : মার্চ– ২০০৭ ঈ.

সূচী

হিংসা একটি আধ্যাত্মিক ব্যাধি-১৫৯
হিংসার আগুন জ্বলতেই থাকে-১৬০
হিংসা থেকে বিরত থাকা ফরয + হিংসা কি-১৬০
ঈর্ষা করা জায়েয আছে + হিংসার ক্রমধারা-১৬১
সর্ব প্রথম হিংসাকারী-১৬২
হিংসার কুফল + হিংসার দু'টি কারণ-১৬২
হিংসা মানুষকে ধ্বংস করে-১৬৩
হিংসুকরা হিংসার আগুনেই জ্বলে-১৬৩
হিংসার চিকিৎসা-১৬৩
তিনটি জগত + প্রকৃত শান্তি কিসে-১৬৪
রিযিক এক নেয়ামত খাওয়ানো ভিন্ন নেয়ামত-১৬৫
আল্লাহ তাআলার ফায়সালা হেকমতপূর্ণ-১৬৬
একটি প্রবাদ বাক্য-১৬৬
নিজের নেয়ামতসমূহ দেখ + দুঃখি ব্যক্তিকে দেখ-১৬৭
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক রহ.-১৬৭
চাহিদার শেষ নেই-১৬৮
এটা আল্লাহর বণ্টন-১৬৮
হিংসার দ্বিতীয় চিকিৎসা-১৬৮
একজন বুযুর্গের কাহিনী-১৬৯
নেকী চলে যায়-১৬৯
ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর একটি ঘটনা-১৭০
প্রকৃত গরীব কে-১৭০
বেহেশতের সু-সংবাদ-১৭১
হিংসার তৃতীয় চিকিৎসা-১৭৩
হিংসা দুই প্রকার-১৭৩
তার জন্য দুআ করবে-১৭৪
তাওবা দ্বারা বান্দার হক মাফ হয় না-১৭৪
ঈর্ষা কখনো হিংসায় পরিণত হয়-১৭৫
দ্বীনি কাজে ঈর্ষা করা ভাল-১৭৫
দুনিয়ার কাজে ঈর্ষা করা ভাল না-১৭৫
পীর ও মুরব্বীর প্রয়োজন-১৭৬

অনুবাদকের কথা

মানুষের দেহের যেমন রোগ-ব্যাধি রয়েছে, তেমিনভাবে মানুষের মূল চালিকাশক্তি রূহ এবং আত্মারও রোগ-ব্যাধি রয়েছে।

মানুষ দেহ ও আত্মার সমন্বিত রূপ। কিন্তু এ কথা সর্বজনবিদিত যে, দেহের চেয়ে আত্মা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আত্মাই দেহের মূল চালিকাশক্তি। এই আত্মা যখন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে, তখন দেহ ও আত্মার সমন্বিত রূপ মানব অস্তিত্বেও গর্বর শুরু হয়ে যায়। যা শুধু ব্যক্তি জীবনকে নয়, বরং সমাজের সামগ্রিক জীবনের অবকাঠামোকে তছনছ করে দেয়। 'হিংসা' আত্মার এমনই একটি ধ্বংসাত্মক ব্যাধি।

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, 'হিংসা তোমাদের আমলকে এমনভাবে খেয়ে ফেলে, যেমন আগুন শুকনো খড়িকে খেয়ে ফেলে।'

সুতরাং কাঙ্খিত ব্যক্তি জীবন ও সু-সংহত সামাজিক জীবন গঠনে এই ধ্বংসাত্মক ব্যাধি 'হিংসা' পরিহার করা একান্ত নৈতিক দায়িত্ব।

আলহামদুল্লিাহ! মহান আল্লাহর অশেষ দয়ায় এ সম্পর্কে মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী -এর 'হাসাদ এক মুহলিক বিমারী' শীর্ষক বয়ানটি অনুবাদ করার তাওফীক হল। আশা করি হযরতের এ বয়ানের মাধ্যমে হিংসার রূপ-প্রকৃতি ও এর ধ্বংসাত্মকতা সম্পর্কে অবগত হতে পারব। এর মাধ্যমে যদি আমরা এ ধ্বংসাত্মক ব্যাধি থেকে আরোগ্যতা লাভ করতে পারি, তবেই আমাদের এ প্রয়াস সার্থক। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

মুহাম্মাদ রুহুল আমীন নাটোরী
থেলকুর, নাটোর
০৩.০৩.০৭ ঈ.

বর্তমান আমাদের সমাজে হিংসা মহামারীর মত ছেঁয়ে গেছে। গুটিকতক মানুষ ছাড়া সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তিই এ ব্যাধিতে আক্রান্ত। যে কোন চোরা পথ ধরে অন্তরে হিংসা ঢুকতে পারে। এ জন্য এটা থেকে বেঁচে থাকা ফরয। তাছাড়া সামাজিক জীবন অতিবাহিত করাও দুস্কর হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু এদিকে আমাদের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই যে, আমরা কত মারাত্মক একটি ব্যাধিতে আক্রান্ত। তাই হিংসা থেকে বাঁচার জন্য সকলকে যত্নবান হতে হবে। আন্তরিক হতে হবে।



ধ্বংসাত্মক একটি ব্যাধি : হিংসা

হিংসা একটি আধ্যাত্মিক ব্যাধি

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন-

إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ أَوْ قَالَ الْعُشْبَ

'তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাকো। কারণ, হিংসা নেকীসমূহকে খেয়ে ফেলে, ধ্বংস করে দেয়, যেমন আগুন খড়ি খেয়ে ফেলে।'

(আবু দাউদ শরীফ, হাদীস-৪২৫৭)

আল্লাহ তাআলা যেমন মানুষের বাহ্যিক আমলের ক্ষেত্রে কিছু কিছু কাজ ফরয ও কিছু কিছু কাজ ওয়াজিব করেছেন এবং কিছু কিছু কাজকে হারাম ও গুনাহ বলে নির্দেশ করেছেন, তদরূপ আমাদের বাতেনী তথা আধ্যাত্মিক আমলের ক্ষেত্রেও কিছু কাজকে ফরয, ওয়াজিব আবার কিছু কাজকে গুনাহ ও হারাম করেছেন। বাহ্যিক আমলের ক্ষেত্রে হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা যেমন অপরিহার্য, তেমনি আধ্যাত্মিক আমলের ক্ষেত্রেও হারাম কাজ ও গুনাহ থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য।

আজ আধ্যাত্মিক ব্যাধি সমূহ থেকে একটা ধ্বংসাত্মক ব্যাধি সম্পর্কে আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ। সেটা 'হিংসা'।

উপরোক্ত হাদীসটিতে এই ব্যাধির কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসটির অর্থ হল- 'তোমরা হিংসা থেকে দূরে থাকো। কেননা হিংসা মানুষের নেক আমলকে এমনভাবে বিনষ্ট করে দেয়, যেমন আগুন খড়ি বা শুকনো ঘাসকে জ্বালিয়ে ধ্বংস করে দেয়। অর্থাৎ খড়ি বা শুকনো ঘাসে আগুন লাগলে আগুন যেভাবে তা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে দেয়, তদরূপ কোন মানুষের অন্তরে হিংসা থাকলে তার সব নেক আমলকে এভাবেই জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে ফেলে।

হিংসার আগুন জ্বলতেই থাকে

এক ধরনের আগুন আছে যা অনেক বড়। যার প্রজ্বলন অনেক দীর্ঘ সময় ধরে হয়। নিমিষেই সবকিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দেয়। আবার এক ধরনের আগুন আছে যা আস্তে আস্তে জ্বলে। সেই আগুন কোথাও লাগলে নিমিষেই সবকিছু জ্বালিয়ে দেয় না। বরং আস্তে আস্তে জ্বলতে থাকে এবং অল্প অল্প করে পুড়িয়ে ভস্ম করে, ছাই বানিয়ে দেয়।

হিংসা এমন একটি ব্যাধি এবং এমন একটি আগুন, যা জ্বলতে জ্বলতে ক্রমান্বয়ে মানুষের সাওয়াবকে নিঃশেষ করে দেয়। মানুষ বুঝতেই পারে না যে, তার সমস্ত নেক আমল শেষ হতে চলেছে। এ জন্য রাসূলুল্লাহ সা. হিংসা থেকে বেঁচে থাকার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন।

হিংসা থেকে বিরত থাকা ফরয

বর্তমান আমাদের সমাজে হিংসা মহামারীর মত ছেঁয়ে গেছে। গুটিকতক মানুষ ছাড়া সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তিই এ ব্যাধিতে আক্রান্ত। যে কোন চোরা পথ ধরে অন্তরে হিংসা ঢুকতে পারে। এ জন্য এটা থেকে বেঁচে থাকা ফরয। তাছাড়া সামাজিক জীবন অতিবাহিত করাও দুস্কর হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু এদিকে আমাদের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই যে, আমরা কত মারাত্মক একটি ব্যাধিতে আক্রান্ত। তাই হিংসা থেকে বাঁচার জন্য সকলকে যত্নবান হতে হবে। আন্তরিক হতে হবে।

হিংসা থেকে বাঁচতে হলে প্রথমে হিংসার হাকীকত তথা পরিচয়, প্রকারভেদ, কারণ ও এর প্রতিকার কী, তা জানতে হবে। এই চারটি জিনিস হল আজকের আলোচনার মূল বিষয়বস্তু। আল্লাহ তাআলা এ আলোচনাকে আমাদের অন্তর থেকে হিংসা দূর করার মাধ্যম বানিয়ে দিন। আমীন।

হিংসা কি

'হিংসা' বলা হয়- 'কোন ব্যক্তির পার্থিব অথবা পরলৌকিক নেয়ামত দেখে অন্তরে জ্বলন ও অস্থিরতা সৃষ্টি হওয়া এবং এ কথা ভাবা যে, সে এ নেয়ামত কোথায় পেল। সাথে সাথে অন্তরে এই বাসনা সৃষ্টি করা যে, এই নেয়ামত যদি তার থেকে ছিনিয়ে নেয়া হত! তার নিকট যদি এ নেয়ামত না থাকত! তাহলে কতই না ভাল হত।

যেমন আল্লাহ তাআলা কাউকে ধন-সম্পদ, ইজ্জত-সম্মান অথবা ইলম-কালাম দিয়েছেন। অন্য কোন ব্যক্তির অন্তরে তার এ নেয়ামতপ্রাপ্তি দেখে এ

জ্বলন শুরু হল যে, সে এ নেয়ামত কেন পেল, কোথা থেকে পেল। তার থেকে যদি এ নেয়ামত চলে যেত, ছিনিয়ে নেয়া হত, তাহলে খুবই ভাল হত। তার কোন ক্ষতি হলে সে তাতে খুশি হয়। আর তার উন্নতি ও অগ্রগতি দেখে ব্যথিত হয়, অস্থিরতা বোধ করে এবং আফসোস করে এ কথা ভেবে যে, সে কীভাবে এত বড় হচ্ছে! এর নামই 'হিংসা'।

হিংসার এ বাস্তবতাকে সামনে রেখে চিন্তা করলে স্পষ্টভাবে দেখা যাবে যে, হিংসাকারী মূলত তার সৃষ্টিকর্তা, দয়াময় প্রভু আল্লাহ তাআলার ফায়সালার উপর অভিযোগ ও আপত্তি করে বসল যে, আল্লাহ তাআলা তাকে এই নেয়ামত কেন দিলেন! আমাকে কেন দিলেন না? সাথে সাথে এই অসৎ কামনাও করল যে, এ নেয়ামত তার থেকে দূর হয়ে যাক। এ জন্য হিংসার ভয়াবহতা অনেক বেশি ও ধ্বংসাত্মক।

ঈর্ষা করা জায়েয আছে

এখানে একটা জানার বিষয় হল যে, অনেক সময় অপরকে নেয়ামত পেতে দেখে নিজের অন্তরে তা পাওয়ার আশা জাগে আমিও যদি এটা পেতাম! এমন আশা করাকে হিংসা বলে না বরং ঈর্ষা বলে। যেমন কারো ভাল বাড়ী দেখে অন্তরে ইচ্ছা হল যে, ঐ ব্যক্তির মত আমিও যদি এমন আরাম ও আয়েশে বসবাস করতে পারতাম! কারো উচ্চপদের চাকুরী দেখে এ আশা হল যে, আমিও যদি এমন চাকুরী পেতাম। আমারও যদি এত টাকা পয়সা, ইলম-কালাম থাকত। এমন ভাবা ও চাওয়া হিংসা নয়, 'ঈর্ষা'। এতে কোন গুনাহ নেই। হ্যাঁ, অন্তরে অন্যের নেয়ামত দূর হওয়ার কু-বাসনা সৃষ্টি হলে তা 'হিংসা'র অন্তর্ভুক্ত।

হিংসার ক্রমধারা

হিংসার তিনটি স্তর রয়েছে। এক. অন্তরে এই কামনা ও বাসনা সৃষ্টি হওয়া যে, তার নেয়ামত বহাল থেকে আমার কাছে আসলে তো ভাল, অন্যথায় তার নেয়ামত চলে গিয়ে হলেও আমার কাছে আসুক। এটা হিংসার প্রথম স্তর।

দুই. অপর ব্যক্তি যে নেয়ামত পেয়েছে তা তার থেকে দূর হয়ে আমার কাছে আসুক। এখানে প্রথম ধাপ হল তার থেকে নেয়ামত দূরীভূত হওয়া। আর দ্বিতীয় ধাপ হল নিজের নিকট আসার কামনা করা।

তিন. হিংসার তৃতীয় স্তর হল, তার কাছ থেকে তার নেয়ামত দূর হয়ে যাক এবং ঐ নেয়ামতের কারণে সে যে সম্মানিত ও বিখ্যাত হয়েছিল, তা থেকে সে বঞ্চিত হোক। চাই ঐ নেয়ামত নিজের কাছে আসুক বা না আসুক।

এটা সবচেয়ে নোংরামী ও নিম্নস্তরের হিংসা। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে এ থেকে হেফাজত করুন আমীন।

সর্ব প্রথম হিংসাকারী

সর্ব প্রথম হিংসাকারী হল 'ইবলিস'। আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত আদম আ. কে সৃষ্টি করলেন, তখন আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করলেন যে, আমি তাঁকে জমিনে খেলাফত দান করব, তাঁকে খলীফা বানাবো। অতঃপর আল্লাহ তাআলা হযরত আদম আ. কে এমন মর্যাদা দান করলেন যে, সমস্ত ফেরেশতাকে নির্দেশ দিলেন, 'তোমরা আদম আ. কে সিজদা কর'। এ হুকুম শুনা মাত্রই ইবলিস হিংসার আগুনে জ্বলে উঠল যে, আদম আ. কেমন করে এই মর্যাদার অধিকারী হল? আমি পেলাম না কেন? এই হিংসার কারণে সে আদম আ. কে সিজদা করতে অস্বীকার করে বসল। সুতরাং সর্বপ্রথম 'হিংসাকারী' এবং 'অহংকারী' হল ইবলিস শয়তান।

হিংসার কুফল

হিংসার অনিবার্য কুফল ও শাস্তি হল, যার উপর হিংসা করা হয়, যদি তার কোন কষ্ট সাধন হয় অথবা সে কোন চিন্তা বা পেরেশানীতে নিপতিত হয়, তখন হিংসাকারী তা দেখে খুশি হয়। আর যদি তার কোন উন্নতি ও অগ্রগতি হয় অথবা সে কোন নেয়ামত লাভ করে, তখন হিংসাকারী দুঃখ, বেদনা ও ক্রোধে জ্বলতে থাকে।

অপরের কষ্টে খুশি হওয়াকে আরবীতে 'শামাতাত' বলা হয়। ইহাও হিংসার এক প্রকার। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের অনেক স্থানে এর খারাবী বর্ণনা করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ

'মানুষ কি অপরের উপর হিংসা করে যে, আল্লাহ তাআলা স্বীয় নেয়ামত তাকে দিয়েছেন!' (সূরা ৪ নিসা, আয়াত-৫৪)

হিংসার দু'টি কারণ

হিংসার কারণ কি? এ রোগ অন্তরে কেন সৃষ্টি হয়?

মূলতঃ হিংসার দু'টি কারণ রয়েছে। একটি হল দুনিয়ার ধন-সম্পদের মুহাব্বত এবং পদ-মর্যাদার মোহ। কারণ, মানুষ সব সময় নিজের সম্মান ও

পদ-মর্যাদা বৃদ্ধির কামনা করে। এখন সে যদি অন্যকে উন্নতি ও উচ্চ সম্মানে সমাসীন দেখে, তখন সে তাকে নিচে নামানোর প্রচেষ্টায় থাকে।

দ্বিতীয় কারণ হল, বিদ্বেষ ও শত্রুতা। যখন কারো প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি হয় তখন তার আরাম-আয়েশ দেখে অন্তরে কষ্ট অনুভব হয় এবং তার খুশিতে পেরেশানী সৃষ্টি হয়। এ দু'টি কারণ অন্তরে টাই পেলে অবশ্যই তার অন্তরে 'হিংসা' সৃষ্টি হবে।

হিংসা মানুষকে ধ্বংস করে

হিংসা এমন একটি ব্যাধি, যা দুনিয়াতে মানুষের ধ্বংসের কারণ হয় এবং আখেরাতের প্রাপ্তিকে ধুলিস্যাৎ করে দেয়। হিংসা দ্বারা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতের ক্ষতি হয়। যখন কেউ কারো প্রতি হিংসা করে তখন সে সর্বদা সংকীর্ণতা ও পেরেশানীতে নিমজ্জিত থাকে। কেননা যখন সে অন্যকে আগে বাড়তে দেখে তখন তার অন্তরে দুঃশ্চিন্তা ও অশান্তি শুরু হয়ে যায়। যার ফলে আস্তে আস্তে তার স্বাস্থ্য ও সুস্থতা উভয়টি নষ্ট হয়ে যায়।

হিংসুকরা হিংসার আগুনেই জ্বলে

আরবীতে একটি কবিতা আছে যার ভাবার্থ এই, হিংসার দৃষ্টান্ত হল প্রজ্জ্বলিত আগুনের ন্যায়। আর আগুনের বৈশিষ্ট হল সব জিনিসকে পুড়িয়ে ফেলা। যেমন খড়িতে আগুন লাগলে তা পুড়তে থাকে। এক খণ্ড পুড়ে শেষ হলে অন্য খণ্ডকে খাওয়া শুরু করে। এভাবে আগুন এক সময় নিভে যায়। হিংসার আগুনও ঠিক তেমনি। হিংসুক প্রথমে অন্যের ক্ষতি সাধনের প্রচেষ্টায় থাকে। কিন্ত যখন অন্যের ক্ষতি করতে ব্যর্থ হয়, তখন সে নিজেই হিংসার আগুনে জ্বলে-পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যায়।

হিংসার চিকিৎসা

হিংসা থেকে মুক্তি ও চিকিৎসার উপায় হল, হিংসুক মনে মনে এ চিন্তা ও ফিকির করবে যে, আল্লাহ তাআলা এই পৃথিবীতে নিজের বিশেষ হিকমতে ও রহস্যে মানুষের কাছে স্বীয় নেয়ামতরাজী বণ্টন করে দিয়েছেন। কাউকে সুস্থতার নেয়ামত দিয়েছেন, কাউকে সম্পদের নেয়ামত দিয়েছেন, কাউকে ইজ্জত-সম্মান দিয়েছেন, কাউকে আরাম-আয়েশ দিয়েছেন, কাউকে দিয়েছেন শান্তি ও নিরাপত্তা। দুনিয়াতে কেউই নেয়ামত থেকে বঞ্চিত নয়। আবার কেউই কষ্ট ও পেরেশানী থেকে মুক্ত নয়।

তিনটি জগত

আল্লাহ তাআলা তিনটি 'আলম' তথা জগত সৃষ্টি করেছেন। তন্মধ্যে একটি হল, যেখানে শুধু শান্তিই শান্তি। অশান্তি এবং দুঃখ কষ্টের কোন ছোটয়া নেই সেখানে। সেটা হল 'আলমে জান্নাত' তথা 'জান্নাতের জগত'। আল্লাহ তাআলা নিজ ফজলে সকলকে জান্নাত লাভের তাওফীক দান করুন। আমীন।

আরেকটি জগত সম্পূর্ণ এর বিপরীত। সেখানে শুধু কষ্টই কষ্ট। শুধু দুঃখই দুঃখ। অশান্তির পাহাড়। শান্তির লেশ মাত্র নেই সেখানে। আরাম আয়েশের নাম গন্ধও নেই। আর সেটা হল 'আলমে জাহান্নাম' তথা 'জাহান্নামের জগত'। আমাদের সবাইকে আল্লাহ তাআলা এর থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

তৃতীয় একটি জগত যা উভয়ের সংমিশ্রনে তৈরি। যেখানে খুশিও আছে চিন্তাও আছে, সুখও আছে দুঃখও আছে। সেটা হল 'আলমে দুনিয়া' তথা 'ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর জগত'। যেখানে আমরা বসবাস করছি। এখানে এমন কাউকে পাওয়া যাবে না, যে সারা জীবন কখনো দুঃখ পায়নি, কষ্টের ছোটয়া কখনো তাকে স্পর্শ করেনি। পৃথিবীর প্রতিটি সুখের সাথে দুঃখের কাঁটা লেগে আছে এবং প্রতিটি কষ্টের সাথে সুখের সুধা লুকায়িত আছে। পৃথিবীর দুঃখ-কষ্ট, আরাম-আয়েশ কোনটিই খাঁটি নয়, স্থায়ী নয়।

প্রকৃত শান্তি কিসে

আল্লাহ তাআলা নিজ হেকমতে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর সেখানে একেক ব্যক্তিকে একেক রকম নেয়ামত দিয়েছেন। কাউকে সম্পদের নেয়ামত দান করেছেন। কাউকে সুস্থতার নেয়ামত দান করেছেন। কাউকে বা ইলমের নেয়ামত দান করেছেন। কিন্তু সম্পদশালী ব্যক্তি সুস্থ ব্যক্তির উপর এবং সুস্থ ব্যক্তি সম্পদশালী ব্যক্তির উপর হিংসা করে যে, সে ঐ নেয়ামত কেন পেল, কোত্থেকে পেল। অথচ এটা হল তকদীরের ফায়সালা। কেউ অন্যের ব্যাপারে বলতে পারবে না যে, সে সবচেয়ে বেশি সুখে আছে, শান্তিতে আছে।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে আমরা একজন ব্যক্তিকে দেখি যে, সে সব রকম নেয়ামত পেয়েছে। কল-কারখানা, বাড়ী-গাড়ী, টাকা-পয়সা, চাকুরী-বাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য মোটকথা দুনিয়ার সমস্ত নেয়ামতে ভরপুর। আবার কাউকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে দুঃখি মনে হয়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে দু'মুঠো খাদ্য জোগায়। এখন শ্রমিক বেচারা যদি ঐ সম্পদশালী ব্যক্তির দিকে তাকালে সে মনে করবে যে, তাকে দুনিয়ার সব নেয়ামত দেয়া হয়েছে। কিন্তু উভয়ের অভ্যান্তরীন অবস্থা গভীরভাব অবলকন করলে দেখা যাবে, যার নিকটে মিল-কারখানা আছে, বাড়ী-গাড়ী আছে, অঢেল ধন-সম্পদ আছে, তার অবস্থা এমন

যে, ঘুমাতে গেলে ঘুম আসে না। ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমাতে হয়। তার খাবার টেবিলে বিভিন্ন আইটেমের দামি দামি খাবার উপস্থিত। বাহারী ফল-মূল প্রস্তুত। কিন্তু তার পেটের সমস্যা। তার পেটে খানা সহ্য হয় না। ডাক্তার নিষেধ করেছেন তুমি খানা খেতে পারবে না। এখন তার নিকটে সব ধরনের খানা ও সমস্ত নেয়ামত বেকার।

অপর দিকে একজন শ্রমিক বেচারা আঁ ঘণ্টা কাজ করার পর শাক-ডাল-ভাত তার সামনে। সে ক্ষুধার্ত অবস্থায় খুব মজা করে তা খেয়ে বিছানায় যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দু'চোখে ঘুম নেমে আসে। আঁ দশ ঘণ্টা পরিতৃপ্তির সাথে ঘুমিয়ে আবার জাগ্রত হয়ে কর্মস্থলে যায়। এখন বলুন, উভয়ের মধ্যে প্রকৃত শান্তিতে কে আছে? কে প্রকৃত শান্তি উপভোগ করছে? একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বুঝে আসবে যে, প্রথম ব্যক্তিকে যদিও আল্লাহ তাআলা অফুরন্ত নেয়ামত দান করেছেন, কিন্তু প্রকৃত শান্তি দিয়েছেন অন্যকে। এসব কিছু আল্লাহ তাআলার হেকমতের ফায়সালা।

রিযিক এক নেয়ামত খাওয়ানো ভিন্ন নেয়ামত

একবার আমার আব্বা (আল্লাহ তাআলা তাঁকে জান্নাতের উচ্চাসনে সমাসীন করুক। আমীন।) বলেন যে, খানা খাওয়ার শেষে যে দুআ পড়া হয়–

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ

'আল্লাহ তাআলার শুকর যিনি আমাকে এই খানা খাওয়াইছেন এবং আমার শক্তি ও প্রচেষ্টা ছাড়াই আমাকে এই রিযিক দান করেছেন।'

রাসূলুল্লাহ সা. বলেন– 'যে ব্যক্তি খানা শেষে এই দুআ পড়বে আল্লাহ তাআলা তার পূর্বের সব (সগীরা) গুনাহ মাফ করে দেবেন।'

(তিরমিযী শরীফ, হাদীস-৩৩৮০)

অতঃপর আব্বাজান বলেন, এই রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ সা. ভিন্ন ভিন্ন দুটি শব্দ উল্লেখ করেছেন। এক. 'রিযিক'। দুই. 'খাওয়ানো'। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা আমাকে রিযিক দিয়েছেন এবং খানা খাওয়াইছেন। এখন প্রশ্ন হল, দু'টি শব্দের উদ্দেশ্য যখন এক, তাহলে ভিন্নভাবে উল্লেখ করলেন কেন? একটা শব্দ উল্লেখ করলেইতো যথেষ্ট ছিল। তিনি নিজেই উত্তর দিলেন যে, দু'টি কথা ভিন্নতর। কেননা রিযিক হাসিল হওয়া একটি স্বতন্ত্র নেয়ামত এবং খাওয়ানো আরেকটি স্বতন্ত্র নেয়ামত।

অনেক সময় রিযিক থাকা সত্ত্বেও ক্ষুধা না থাকায় বা পেট খারাপ হওয়ায় খেতে পারে না। এ ক্ষেত্রে 'রিযিক দিয়েছেন' বলা যাবে ঠিক, কিন্তু

'খাওয়াইছেন' এ কথা বলা যাবে না। রিযিক তো তাকে দেয়া হয়েছে, কিন্তু খাওয়ার উপযুক্ততা ও হজম শক্তি তাকে দেয়া হয়নি। মোটকথা আল্লাহ তাআলা এক হেকমতে এক ব্যক্তিকে এক নেয়ামত দিয়েছেন। আবার অন্য ব্যক্তিকে অন্য নেয়ামত দিয়েছেন অন্য হিকমতে।

আল্লাহ তাআলার ফায়সালা হেকমতপূর্ণ

সুতরাং হিংসার চিকিৎসা হল, হিংসুক ব্যক্তি মনে মনে এই চিন্তা করবে যে, অন্যের নেয়ামতপ্রাপ্তিতে আমার এ পেরেশানী এবং অস্থিরতা সৃষ্টি হচ্ছে কেন? আমাকে তো আল্লাহ এমন অনেক নেয়ামত দিয়েছেন যা অন্যকে দেন নাই। হতে পারে আল্লাহ তাআলা আমাকে তার চেয়ে বেশি সুস্থতা, বেশি ধন-সম্পদ ও মান-সন্মান দিয়েছেন অথবা আল্লাহ তাআলা আমাকে এমন নেয়ামত দান করেছেন যা তাকে দেন নাই। মোটকথা এ সমস্ত নেয়ামত বণ্টনে আল্লাহ তাআলার বিশেষ হেকমত নিহিত রয়েছে, যা মানুষের জ্ঞানের পরিধির বাইরে। এসব চিন্তা করলে হিংসা দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

একটি প্রবাদ বাক্য

উর্দু ভাষায় একটি প্রবাদ বাক্য আছে, যার অর্থ– 'আল্লাহ তাআলা টাকমাথা বিশিষ্ট ব্যক্তিকে যেন নখ না দেয়'। প্রবাদটি অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভপূর্ণ। অর্থাৎ ধন-সম্পদের নেয়ামত যাকে দেয়া হয়নি সে যদি তা পেত, তাহলে হয়তবা সে আরো বেশি খারাপ কাজে লিপ্ত হত। ফলে তার পরিণাম হত আরো ভয়াবহ। হয়তবা আল্লাহ তাআলা এমনই কোন হেকমতে তাকে কোন নেয়ামত থেকে বঞ্চিত রেখেছেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

'আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে একে অন্যের উপর যে জিনিস দ্বারা প্রধান্য দিয়েছেন, তোমরা ঐ জিনিসের আশা কর না।' (সূরা ৪ নিসা, আয়াত-৩২)

কারণ, বঞ্চিত নেয়ামত যদি তুমি পেতে, তাহলে হয়ত তোমার দ্বারা আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ পাওয়ার পরিবর্তে নাফরমানী প্রকাশ পেত। এমন অনেক ঘটনা আমাদের জানা আছে যে, বারবার প্রত্যাশা করে প্রাপ্ত বস্তু দ্বারা উপকারের পরিবর্তে ক্ষতিই বেশি হয়েছে। এ জন্য প্রথমে এ কথা ভাববে যে, অন্যের প্রাপ্ত নেয়ামতের উপর আমার আফসোস মূলত আল্লাহ তাআলার ফায়সালার উপর অভিযোগ উত্থাপন করা। অথবা হতে পারে আল্লাহ তাআলা আমাকে এর চেয়ে বড় নেয়ামত দান করবেন, যা অন্যকে দেয়া হয়নি।

নিজের নেয়ামতসমূহ দেখ

এ হিংসা ও ফেতনার কারণ হল, মানুষ নিজের নেয়ামত না দেখে অন্যের নেয়ামত দেখে নিজে যেসব নেয়ামত পেয়েছে তার দিকে খেয়ালও করে না, আল্লাহ তাআলার শুকরিয়াও আদায় করে না। বরং অন্যের নেয়ামতের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। এমনিভাবে আমরা নিজের দোষের দিকে নজর দেই না, কিন্তু অন্যের দোষ চর্চায় সোচ্চার। আমাদের উপর খোদাপ্রদত্ত যে নেয়ামত রয়েছে তা যদি স্মরণ রাখি তাহলে হাজারো কষ্টের মধ্যে অন্যের নেয়ামত দেখে হিংসা হবে না।

দুঃখি ব্যক্তিকে দেখ

বর্তমান আমাদের সমাজের মানুষ অন্যের প্রতি এ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে যে, সে কীভাবে ধন-সম্পদের মালিক হল। কেমন করে বিলাসবহুল বাসা-বাড়ী করল। কেমন করে গাড়ী ক্রয় করল, এসব বিষয় পর্যবেক্ষণ করে। যার ফলে ঐ ধনাঢ্য ব্যক্তির কোন জিনিস দেখে পছন্দ হলে তা অর্জন করতে উঠেপড়ে লাগে। আর সামর্থ না হলে অনিবার্যভাবে তার মধ্যে অন্যের প্রতি হিংসা সৃষ্টি হয়। তখন সে হিংসার ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে হিংসার আগুনে জ্বলতে থাকে। এ জন্য প্রবাদ বাক্যটি আমাদের স্মরণ রাখা দরকার। 'দুনিয়ার ব্যাপারে সর্বদা নিজের চেয়ে নিম্নমানের মানুষের দিকে দেখুন আর দ্বীনের ব্যাপারে নিজের চেয়ে উপরের ব্যক্তির দিকে দেখুন।' তাহলে আপনাকে আর হিংসার আগুনে জ্বলতে হবে না।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক রহ.

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক রহ. বলেন, আমি দীর্ঘ দিন ধনাঢ্য ব্যক্তিদের সাথে ছিলাম। তাদের সঙ্গে ওঠা-বসা, চলা-ফেরা করেছি। তখন আমার চেয়ে বেশি চিন্তা পেরেশানীতে হয়ত অন্য কেউ ছিল না। কারণ, আমি যাকেই লক্ষ্য করতাম, মনে হত সে আমার চেয়ে দামি কাপড় পরিধান করেছে, আমার চেয়ে উন্নত বাহন ব্যবহার করছে, আমার চেয়ে তাদের বাড়ী-গাড়ী অনেক উন্নত। ফলে আমি সব সময় এ চিন্তায় বিভোর থাকতাম যে, এ সমস্ত উন্নতমানের বস্তু আমি কী করে অর্জন করব? এ চিন্তায় সারাক্ষণ বিমর্ষ ও বিষন্ন থাকতাম। কিন্তু যখন আমি ঐ সমস্ত ধনাঢ্য ব্যক্তিদের সংস্পর্শ ত্যাগ করে গরীব, দুঃখি ও অভাবী লোকদের সংস্পর্শে আসলাম, তাদের সাথে ওঠা-বসা করতে লাগলাম, তখন আমি চিন্তামুক্ত হয়ে আরাম আয়েশে জীবন যাপন

করতে শুরু করলাম। কেননা তখন আমি যাকেই দেখতাম মনে হত, সে আমার চেয়ে নিম্নমানের কাপড় পরিধান করে আছে, আমার চেয়ে নিম্নমানের ঘরে বসবাস করছে, আমার বাহন তাদের চেয়ে উন্নত ও উৎকৃষ্ট। ফলে আল্লাহ তাআলা আমার অন্তরে অনাবিল প্রশান্তি দান করলেন।

চাহিদার শেষ নেই

মনে রাখবেন, কোন মানুষ যদি দুনিয়ার সমস্ত নেয়ামত ও জীবন উপকরণ পুঞ্জিভূত করতে থাকে, তবুও সে একত্র করে শেষ করতে পারবে না। কারণ, আল্লাহর নেয়ামতের কোন শেষ নেই। অতএব এই দুনিয়াতে যে ব্যক্তি সবচেয়ে ধনী, তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন, সে সব কিছু পেয়েছে কি না? তার সব চাহিদা পূর্ণ হয়েছে কি না? উত্তরে সে বলবে, আমার আরো অনেক কিছু চাওয়ার আছে, পাওয়ার আছে। আমার আরো সম্পদ চাই, সম্মান চাই

পৃথিবীর বাস্তবতা বর্ণনা করতে গিয়ে জনৈক আরবী কবি বলেন, 'এ দুনিয়া দ্বারা আজ পর্যন্ত কেউ পরিতৃপ্ত হয়নি। এক চাহিদা পূরণ হওয়া মাত্র আরেকটি চাহিদা সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক চাহিদা অপর একটি চাহিদা সৃষ্টি করে। এক প্রয়োজন অপর একটি প্রয়োজনের জন্ম দেয়।

এটা আল্লাহর বণ্টন

কতক্ষণ হিংসা করবে? কতদিন হিংসার আগুনে পুঁড়ে ছাঁই হবে? তুমি প্রতিনিয়তই অপরের নেয়ামত বৃদ্ধি পেতে দেখবে। এর চেয়ে উত্তম পন্থা হল বেশি বেশি এ কথা ভাবা যে, এগুলি আল্লাহ তাআলার বণ্টন। আল্লাহ তাআলার এই বণ্টনে অবশ্যই কোন না কোন রহস্য লুকায়িত আছে। আর আমাদের জ্ঞানের পরিসর অতি সামান্য। আমাদের চিন্তার প্রাচীর অতি সংকীর্ণ। আমাদের চিন্তা দ্বারা আল্লাহর ফায়সালার রহস্য ভেদ করা সম্ভম নয়। সুতরাং এ কথা ভেবে মেনে নেও যে, আল্লাহ যাকে যা ইচ্ছা তাই দান করেন। আর কাকে কি দিতে হবে, তা তিনিই ভাল জানেন। আশা করা যায়, এ কথা স্মরণ করলে অন্তরে হিংসা ব্যাধি জন্ম নেবে না।

হিংসার দ্বিতীয় চিকিৎসা

হিংসার দ্বিতীয় একটি কার্যকারী চিকিৎসা হল, হিংসাকারী মনে করবে, আমি তার হিংসা করে অনিষ্ট কামনা করছি। অথচ ব্যাপারটা ঠিক এর উল্টা হচ্ছে। কারণ, যার উপর হিংসা করছি তারতো শুধু লাভই হচ্ছে। আর আমার শুধু ক্ষতিই হচ্ছে। তার দুনিয়াতেও লাভ হচ্ছে। আখেরাতেও লাভ হচ্ছে।

দুনিয়াতে তার লাভ হল, যখন তুমি তাকে হিংসা করে দুশমন বানালে, তখন সে তোমার দুঃখ, কষ্ট ও পেরেশানী দেখে খুশি হবে। তুমি তার উপর হিংসা করে যখন হিংসার আগুনে জ্বলবে, কষ্ট অনুভব করবে, তখন সে তোমার কষ্ট দেখে খুশি হবে। আর আখেরাতের লাভ হল, তুমি তার উপর যতই হিংসা করবে, তার আমলনামায় ততই নেকী বৃদ্ধি পাবে। উপরন্তু তোমার হিংসার কারণে সে মজলুম সাব্যস্ত হবে, ফলে আখেরাতে তার সম্মান বৃদ্ধি পাবে।

আর হিংসার পরিণতি হল হিংসা মানুষকে গীবত, দোষচর্চা, চোগোলখোরি করার উপর উদ্বুদ্ধ করে। ফলে হিংসাকারীর নেক আমল অন্যের আমল নামায় চলে যায়। কারণ, যখন তুমি হিংসা করবে, বদদুআ করবে, গীবত করবে তখন তোমার সাওয়াবগুলো তার আমলনামায় চলে যাবে। সুতরাং তার উপর 'হিংসা' করার অর্থ হল, নিজের নেক আমল 'প্যাকেট' করে তার নিকট পাঠান। এটা হল তার আখেরাতের লাভ।

একজন বুযুর্গের কাহিনী

একজন বুযুর্গের ঘটনা বর্ণিত আছে যে, কেউ তাকে বলল, 'হুজুর! অমুক ব্যক্তি আপনাকে গাল-মন্দ করেছে।' এ কথা শুনে তিনি কোন উত্তর দিলেন না। চুপ থাকলেন। মজলিস শেষে ঘরে গিয়ে গাল-মন্দকারী ব্যক্তির নিকট একটি বড় ধরনের হাদিয়া প্রেরণ করলেন। লোকজন জিজ্ঞাসা করল, হুজুর! এ কেমন কথা যে, সে আপনাকে গাল-মন্দ করে আর আপনি তাকে হাদিয়া দিচ্ছেন? উত্তরে বুযুর্গ বললেন, 'সে আমার উপকার করেছে। সে আমার গাল-মন্দ করে আমার নেকি বৃদ্ধি করেছে। সে যখন আমার আখেরাতের উপকার করল। তো আমি তাকে কমপক্ষে দুনিয়ার উপকারটা করি। তাই আমি তার নিকট হাদিয়া প্রেরণ করেছি।'

নেকী চলে যায়

এ কথা প্রসিদ্ধ যে, হযরত ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর দরবারে কেউ গীবত করতে পারত না। কারণ, তিনি কারো গীবত করতেনও না, শুনতেনও না। তার মজলিস সর্বদা গীবত থেকে মুক্ত থাকত।

একদিন ইমাম আবু হানীফা রহ. স্বীয় ছাত্রদের সামনে গীবত ও হিংসার অনিষ্টতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, গীবত এমন বস্তু, যা গীবতকারীর নেকীকে ঐ ব্যক্তির নিকট পৌঁছিয়ে দেয়, যার গীবত করা হয়েছে। এ জন্য আমি কখনো কারো গীবত করি না। তবে কখনো যদি গীবত করার ইচ্ছা হয় তখন পিতা-মাতার গীবত করব। কেননা গীবতের কারণে যে নেকী চলে যাবে তা আমার

পিতা-মাতার আমল নামায় যাবে। তখন ঘরের জিনিস ঘরেই থাকবে। অপরের নিকট যাবে না। এ কথা বলে তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে, গীবতকারী ও হিংসাকারী তো অপরের খারাবী চেয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে সে তার দুনিয়া ও আখেরাতের উপকার করল এবং নিজের ক্ষতি করল। এ জন্য গীবত করা একটা নির্বুদ্ধিতার কাজ।

ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর একটি ঘটনা

ইমাম আবু সুফিয়ান রহ. ও ইমাম আবু হানীফা রহ. একই সময়ের মানুষ ছিলেন। তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পাঠদান করতেন। একদিন হযরত সুফিয়ান রহ.কে কেউ জিজ্ঞাসা করল যে, 'ইমাম আবু হানীফা রহ. সম্পর্কে আপনার মতামত কি?' উত্তরে তিনি বললেন, 'সে তো বড় কৃপণ।' লোকটি বলল, 'আমরা শুনেছি তিনি বড় দানশীল।' তখন সুফিয়ান সাওরি রহ. বললেন, 'তিনি এমন কৃপণ যে, নিজের নেকী কাউকে দেন না। অথচ অপরের নেকী খুব নেন। কেননা মানুষ তার গীবত ও দোষ ত্রুটি বলে বেড়ানোর ফলে তাদের নেকী তাঁর আমলনামায় চলে আসে। আর সে নিজে কখনো কারো গীবত করেনও না, শুনেনও না। তাই তাঁর নেকী কেউ পায় না। সুতরাং আখেরাতের দিক থেকে তার চেয়ে বড় কৃপণ আর কেউই নেই।

প্রকৃত গরীব কে

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সা. সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করলেন যে–

أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ

'প্রকৃত গরীব কে, তোমরা কি জান?'

উত্তরে সাহাবায়ে কেরাম বললেন–

الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ

'আমাদের মধ্যে প্রকৃত গরীব সেই ব্যক্তি, যার নিকট টাকা-পয়সাও নেই, কোন আসবাবপত্রও নেই।'

হুজুর সা. বললেন–

إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ

'না সে প্রকৃত গরীব নয়। প্রকৃত গরীব ঐ ব্যক্তি, যার আমলনামায় অনেক অনেক নামায, রোযা, যাকাত থাকবে।'

তার আমলনামায় হজ্জ থাকবে, যিকির-আযকার ও তেলাওয়াত থাকবে। কিন্তু কেয়ামতের দিন যখন আল্লাহর সামনে হিসাবের জন্য উপস্থিত হবে, তখন তার সামনে লোকজন ভিড় করবে। কেউ বলবে, সে আমার অমুক হক নষ্ট করেছে। আবার কেউ বলবে, সে আমার অমুক হক বরবাদ করেছে, আমার অমুক হক আত্মসাৎ করেছে।

فَيُعْطٰى هٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ

'তখন তাদেরকে তার নেকী দ্বারা বদলা দেয়া হবে।'

কারণ, সেখানে তাদের হক পুরা করার জন্য দুনিয়াবী কোন মুদ্রা কাজে আসবে না। সেখানকার মুদ্রা হবে নেক আমল। সুতরাং আল্লাহ তাআলা তখন নির্দেশ দেবেন, তাদের হকের বদলায় তার নেকী দেয়া হোক। তখন কেউ তার নামায নিয়ে যাবে, কেউ তার রোযা, কেউ যিকির, আবার কেউ তার তাসবীহ ও তেলাওয়াত নিয়ে যাবে। এরপরও তাদের হক আদায় হবে না। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, তার নেকী তো শেষ হয়ে গেছে, সুতরাং পাওনাদারদের গুনাহ তার আমলনামায় দিয়ে তাদের হক আদায় করে দাও। সবশেষে গুনাহের বোঝা মাথায় দিয়ে তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।

(মুসলিম শরীফ, হাদীস-৪৬৭৮)

দেখুন, তার আমলনামা নেকী দ্বারা ভর্তি ছিল। কিন্তু এখন তাকে শুধু খালি হাতে নয়, বরং গুনাহের বোঝা মাথায় নিয়ে ফিরে আসতে হল। এই ব্যক্তিই প্রকৃত গরীব ও অসহায়। মোটকথা, এভাবে হিংসার দ্বারা নেকী বরবাদ হয়ে যায়।

যদি আল্লাহ তাআলা কাউকে আয়নার মত পরিস্কার অন্তর দান করেন, যাতে কোন প্রকার হিংসা, দুশমনি, কোন গীবত থাকবে না। তার আমলনামায় বেশি নফল নামায, যিকির-আযকার ও তেলাওয়াত না থাকলেও তার অন্তর পরিস্কার থাকার কারণে সে ব্যক্তি উক্ত সম্মানের অধিকারী হবে, যার কোন সীমা থাকবে না।

বেহেশতের সু-সংবাদ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাযি. বলেন, একদিন আমরা মসজিদে নববীতে রাসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট বসা ছিলাম। তিনি আমাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, এখন যে ব্যক্তি এদিক দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করবে, সে জান্নাতী। আমরা সে দিকে তাকিয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ পরেই এক ব্যক্তি মসজিদের ঐ দিক দিয়ে প্রবেশ করল। তার চেহারা হতে ওযুর পানি টপকে

পড়ছিল। রাসূলুল্লাহ সা. তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন বলে আমরা তাকে ঈর্ষা করতে লাগলাম।

হযরত আবদুল্লাহ রাযি. বলেন, মজলিস শেষে আমার কৌতুহল জাগল যে, আমি তাঁর নিকট গিয়ে জানব যে, তাঁর কোন আমলের কারণে রাসূলুল্লাহ সা. এত গুরুত্বের সাথে তাকে বেহেশতের সুসংবাদ দিলেন। অতঃপর তিনি যখন বাড়ীর দিকে যেতে লাগলেন, তখন আমি তাঁর পিছে পিছে গেলাম। তাকে বললাম, আমি আপনার বাড়ীতে কিছু দিন থাকব। তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন।

অতঃপর আমি তাঁর বাড়ীতে গেলাম। রাতে তিনি যখন বিছানায় ঘুমিয়ে পড়লেন, তখন আমি জেগে থাকলাম, রাতে কী আমল করে তা দেখার জন্য। সারাঁা রাত অতিবাহিত হয়ে গেল, তবুও সে উঠল না। তাহাজ্জুদের নামাযও পড়ল না। ফজরের সময় ঘুম থেকে উঠল। দিনেও আমি তাঁর নিকট থাকলাম। কিন্তু তাঁকে বিশেষ কোন আমল করতে দেখলাম না। নামাযের সময় হলে মসজিদে গিয়ে নামায পড়ে আসে। অতিরিক্ত নফল, যিকির, তাসবীহ, তেলাওয়াত কিছুই করে না।

এভাবে কিছু দিন তাঁর নিকট থাকার পর বিশেষ কোন আমল দেখতে না পেয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ সা. আপনাকে জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন। আসলে আমি আপনার ঐ আমল দেখার জন্যই আপনার এখানে এসেছিলাম। কিন্তু আপনার বিশেষ কোন আমল তো দেখতে পেলাম না। শুধু ফরয ওয়াজিবগুলো নিয়মিত আদায় করছেন।

তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সা. যদি এ সুসংবাদ আমাকে দিয়ে থাকেন, তাহলে তা আমার জন্য বড় নেয়ামত। কিন্তু আমার তো বিশেষ কোন আমল নেই। তবে একটা জিনিস আমার ভিতর আছে, তা হল আমার অন্তরে কারো প্রতি কখনো হিংসা-বিদ্বেষ জন্মেনি। সুসংবাদটি হয়ত এ কারণেই দেয়া হয়েছে।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে, তিনি হলেন হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রাযি.। যিনি 'আশরায়ে মুবাশশারা' তথা 'জান্নাতের সু-সংবাদপ্রাপ্ত' দশজন সাহাবী'র একজন। মোটকথা, তার আমলনামায় বেশি নফল ও যিকির আযকার ইত্যাদি না থাকলেও তার অন্তর হিংসা-বিদ্বেষ থেকে পবিত্র ছিল। এসব থেকে নিজের অন্তরকে আয়নার মত পরিস্কার করে রেখেছেন। সুতরাং হিংসার দ্বিতীয় চিকিৎসা হল, হিংসাকারী এ কথার খেয়াল করবে যে, হিংসা করলে আমার শুধু ক্ষতিই হচ্ছে। আর যার হিংসা করা হচ্ছে তার দুনিয়া ও

আখেরাতের ফায়দা হচ্ছে। এমন চিন্তা মাথায় রাখলে হিংসা রোগ দূর হয়ে যাবে।

হিংসার তৃতীয় চিকিৎসা

উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হিংসার মূল ভিত্তি হল দুনিয়ার ভালবাসা ও পদ মর্যাদার লোভ। এ জন্য হিংসার তৃতীয় চিকিৎসা হল, অন্তর থেকে দুনিয়ার ভালবাসা ও পদ মর্যাদার লোভ দূর করতে হবে। কেননা সব রোগের মূল হল দুনিয়ার ভালবাসা। আর দুনিয়ার ভালবাসা অন্তর থেকে বের করার পদ্ধতি হল, মনে মনে এই চিন্তা করবে যে, দুনিয়ার সব কিছুই ক্ষণস্থায়ী। স্বল্প দিনের দুনিয়া। একদিন চক্ষুদ্বয় বন্ধ হয়ে যাবে। তখন দুনিয়ার সমস্ত ধন-সম্পদ, ইজ্জত-সম্মান, পদ-পদবী সব কিছু নিঃশেষ হয়ে যাবে। এরপরে বাঁচার আর কোন উপায় থাকবে না। নাযাতের কোন পথ থাকবে না। মোটকথা, মানুষ যদি উপরোল্লেখিত তিনটি বিষয়ে চিন্তা করে, তাহলে সে হিংসা রোগ থেকে মুক্তি পাবে। হিংসা আর অন্তরে স্থান পাবে না।

হিংসা দুই প্রকার

হিংসার অনিষ্টতা শোনার পর অন্তরে এ ধারণা হয় যে, অনেক সময় ইচ্ছা ছাড়া এমনিতেই হিংসা রোগ সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে যখন নিজের বন্ধু-বান্ধব, সমসাময়িক একই পেশার লোকের উন্নতি ও অগ্রগতি দেখে, তখন ইচ্ছা ছাড়াই তার প্রতি ধারণা হয় যে, সে কেমনে আমার চেয়ে উপরে উঠে গেল। অযথা তার প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। মূলতঃ তা ইচ্ছাকৃত ও পরিকল্পিত নয়। তাহলে এরকম অনিচ্ছাকৃত হিংসা থেকে বাঁচার উপায় কি?

আসলে হিংসার দু'টি ধাপ রয়েছে। প্রথম ধাপ হল অন্তরে এ খেয়াল আসা যে, অমুক যে নেয়ামত পেয়েছে তা তার থেকে দূর হয়ে যাক। এ ছাড়াও কথা ও কাজের দ্বারা তার ক্ষতি কামনা করা হয়। যেমন তার গীবত করা, যেখানে সেখানে তার দোষ ত্রুটি তুলে ধরা, যাতে তার অর্জিত মান সম্মান বিলিন হয়ে যায় এবং উক্ত নেয়ামত থেকে সে বঞ্চিত হয়। এই ধরনের হিংসা সম্পূর্ণ হারাম।

দ্বিতীয়ঃ মাঝে মাঝে অন্যের নেয়ামত দেখে অন্তরে শুধু খেয়াল হয় যে, সে কেন এই নেয়ামত পেল? ব্যাস এতটুকুই। এ ছাড়া কথা ও কাজের দ্বারা কোন প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে না। অপরের নেয়ামত দূর হওয়ার প্রচেষ্টাও করে না। তার দুর্নাম করে না, গীবত করে না। এটাও এক প্রকার হিংসা। এর

প্রতিকার অতি সহজ। একটু সচেতন হলেই এ থেকে বাঁচা সম্ভব। এর প্রতিকার হল, যখন অন্তরে এ রকম হিংসা জন্ম নেবে, সাথে সাথে হিংসার অনিষ্টতার কথা স্মরণ করে তাওবা করবে এবং মনে মনে ইস্তেগফার করবে। কারণ, এটা নফস ও শয়তানের ধোঁকা। ইনশাআল্লাহ তখনই তা দূর হয়ে যাবে।

তার জন্য দুআ করবে

বুযুর্গানেদ্বীন লিখেছেন, যখন অপরের নেয়ামত দেখে অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়, তখন একাকী বসে তার জন্য দুআ করবে– 'হে আল্লাহ! তাকে যে নেয়ামত দান করেছ তা আরো বাড়ীয়ে দিন।' সাথে সাথে নিজের জন্যেও দুআ করবে– 'হে আল্লাহ! তার নেয়ামতের কারণে আমার অন্তরে যে হিংসা সৃষ্টি হচ্ছে তুমি মেহেরবানী করে তা দূর করে দাও।' অবশ্য এ দুআ করতে অনেক কষ্ট হবে। মন সহজে মেনে নেবে না। তবুও জোর করে হলেও এ দুআ করতে হবে।

মোটকথা, তিনটি কাজ করতে হবে। প্রথমে অন্তরে যে হিংসা সৃষ্টি হচ্ছে, তা ঘৃণা করতে হবে। অতঃপর তার কল্যাণের দুআ করতে হবে। পরিশেষে নিজের অন্তর পরিস্কার করার দুআ করতে হবে। এই তিনটি কাজ করার পরেও যদি অন্তরে অনিচ্ছাকৃতভাবে হিংসাভাব সৃষ্টি হয়, তাহলে আশা করা যায়, এতে আল্লাহ তাআলা গুনাহ লেখবেন না। তবে অনিচ্ছাকৃত সেই খেয়ালকেও খারাপ ভাবতে হবে। অন্যথায় গুনাহ হবে।

তাওবা দ্বারা বান্দার হক মাফ হয় না

মনে রাখবেন, আল্লাহ তাআলার হক আদায়ে কমতি হলে তাওবা-ইস্তেগফার দ্বারা তার ক্ষতি পূরণ হয়, গুনাহ মাফ হয়। কিন্তু যে সমস্ত গুনাহ বান্দার হকের সাথে সম্পৃক্ত, তা শুধু তাওবা দ্বারা মাফ হয় না। তার হক আদায় করলে অথবা তার থেকে ক্ষমা নিলে এবং সে ক্ষমা করলে তবেই তা আদায় হবে।

হিংসার ব্যাপারটি এমন যে, হিংসার বহিঃপ্রকাশ করতে গিয়ে যখন তার গীবত করা হল, তার ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করা হল, তখন তা হবে তার হক নষ্ট করা, যার সংপৃক্ততা হক্কুল ইবাদের সাথে। সুতরাং সে যতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা হবে না। তবে যদি অন্তরে অন্তরেই তার প্রতি হিংসা জমে, বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা তার কোন বহিঃপ্রকাশ না ঘটে, তার

সম্পর্ক হবে আল্লাহর হকের সাথে। এমন গুনাহ উক্ত ব্যক্তির নিকট ক্ষমা চাওয়া ছাড়া শুধু তাওবা দ্বারাই মার্জনা হয়ে যায়।

ঈর্ষা কখনো হিংসায় পরিণত হয়

উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অপরের নেয়ামত দূরীভূত ও বিনষ্ট হওয়ার ইচ্ছা যদি অন্তরে না আসে বরং শুধু এ ধারণা প্রসূত হয় যে, ঐ নেয়ামত যদি আমারও অর্জন হত তাহলে কতইনা ভাল হত। এটা 'হিংসা' নয় বরং 'ঈর্ষা'। কিন্তু ঈর্ষাও বেশি করা এবং অন্তরে স্থান দেয়া ভাল নয়। কারণ এই ঈর্ষা বৃদ্ধি হতে হতে এক সময় তা হিংসায় পরিণত হবে। এ জন্য পার্থিব কোন সম্পদের কারণে যদি কারো উপর ঈর্ষা হয়, তবে তা অবশ্যই কোন ভাল কাজ নয়। কারণ, এ ঈর্ষা থেকেই লোভ ও হিংসা জন্ম নিতে পারে।

দ্বীনি কাজে ঈর্ষা করা ভাল

তবে যদি দ্বীনি কোন কাজে ঈর্ষা হয়, তাহলে তা ভাল। হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন–

لَا حَسَدَ إِلَّا عَلَى اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ

وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يَتَصَدَّقُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

'দুই ব্যক্তির উপর ঈর্ষা করা যেতে পারে। এক. যাকে আল্লাহ তাআলা ইলম দান করেছেন। পবিত্র কুরআনের জ্ঞান দান করেন। রাতে সে পবিত্র কুরআন নামাযের মধ্যে তেলাওয়াত করে। দুই. যাকে আল্লাহ তাআলা ধন-সম্পদ দান করেছেন। সে তা থেকে দিনে ও রাতে, প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে আল্লাহর রাস্তায় দান করে।' (বুখারী শরীফ, হাদীস-৪৬৩৭)

হাদীসে বর্ণিত দু'ব্যক্তির উপর ঈর্ষা করা যেতে পারে। এমন ভাবা যাবে যে, দ্বীনি কাজে সে আমার চেয়ে অগ্রসর হয়ে গেছে। আমি তার চেয়েও বেশি করব। সে যেমন আখেরাতের পাথেয় সংগ্রহ করছে, তেমনি আমিও করব, তার চেয়ে বেশি করব। এমন ঈর্ষা করা ভাল ও প্রশংসনীয়।

দুনিয়ার কাজে ঈর্ষা করা ভাল না

কিন্তু দুনিয়ার কোন সম্পদের জন্য ঈর্ষা করা যে, অমুক এত এত ধন-সম্পদের মালিক, দামি ও উন্নত বাড়ী-গাড়ীর মালিক, পদ-পদবী ও মান-মর্যাদার মালিক ইত্যাদি। এসব বিষয়ের জন্য ঈর্ষা করা ভাল নয়। এটা ঘৃণিত

কাজ। কারণ, দুনিয়াবী বিষয়-বস্তুর ঈর্ষা এক পর্যায়ে লোভ সৃষ্টি করে। হিংসার জন্ম দেয়।

দুনিয়াবী কোন বিষয়ে ঈর্ষা হলে ভাববে যে, আল্লাহ তাআলা তাকে এক নেয়ামত দিয়েছেন, আর আমাকে অন্য নেয়ামত দিয়েছেন। এ নেয়ামত আমাকে না দেয়ার পিছেও আল্লাহর হেকমত রয়েছে। এ নেয়ামত পাওয়া থেকে না পাওয়ার মধ্যেই আমার জন্য কল্যাণ রয়েছে। এ নেয়ামত পেলে হয়ত আমার আরো সমস্যা হত। মোটকথা, এসব কথা ভেবে ঈর্ষাকে অন্তর থেকে বের করার চেষ্টা করবে। ইনশাআল্লাহ অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ পাবে না। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে সঠিক বুঝ দান করুন এবং হিংসা থেকে বাঁচার তাওফীক দান করুন। আমীন।

পীর ও মুরব্বীর প্রয়োজন

অন্তরের রোগ-ব্যাধি থেকে বাঁচার জন্য কোন চিকিৎসকের নিকট যেতে হবে। শুধু রোগ সম্পর্কে অবগত হলেই তা দূর করা সম্ভব নয়। যেমন কোন ডাক্তার কোন রুগীকে জ্বর ও তার চিকিৎসা সম্পর্কে ভালভাবে বুঝিয়ে দিল। কিন্তু যখন তার জ্বর আসবে তখন কি সে শুধু ডাক্তারের বাতানো কথামত চিকিৎসা করবে? নিশ্চয় সে তা করবে না। কারণ, জ্বরের বিভিন্ন প্রকার থাকে, বিভিন্ন অবস্থা থাকে। নিজে চিকিৎসা করতে গেলে ভুল করে বসবে। এ জন্য ডাক্তারের পরার্মশ নিতে হয়।

তদরূপ অন্তরের রোগ হিংসা, অহংকার, শত্রুতা ইত্যাদি বিভিন্ন রোগের বিভিন্ন অবস্থা রয়েছে। এ সব ব্যাধি দূর করার জন্য শুধু সে সম্পর্কে অবগত হলেই হবে না বরং তার চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করা দরকার। রোগ দূর করতে অভিজ্ঞ ডাক্তারের নিকট যাওয়া অতীব জরুরী। তার নিকট গিয়ে নিজের রোগ ও অবস্থাদী বর্ণনা করে চিকিৎসা নেয়া জরুরী। এতে হয়ত আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এসব ধ্বংসাত্মক ব্যাধি থেকে মুক্তি দেবেন।

আল্লাহ তাআলা অন্তরের হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি ধ্বংসাত্মক ব্যাধি থেকে আমাদের সবাইকে হেফাজত করুন। আমীন।

গীবত : একটি ভয়ঙ্কর গুনাহ

শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
অনুবাদ : মুহাম্মাদ নূরুল আলম

প্রথম প্রকাশ : মে- ২০০৭ ঈ.

সূচী

মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া-১৮১
গীবতের সংজ্ঞা-১৮২
গীবত কবীরা গুনাহ + গীবতকারী আপন চেহারা আঁচড়াবে-১৮৩
গীবত যেনার চেয়েও ভয়ঙ্কর-১৮৩
গীবতকারীকে জান্নাতে যেতে দেয়া হবে না-১৮৪
গীবত নিকৃষ্টতম সুদ-১৮৫
গীবত মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার নামান্তর-১৮৫
গীবত করার উপর ভীতিকর স্বপ্ন-১৮৬
হারাম খাওয়ার অপকারিতা + যেসব ক্ষেত্রে গীবত করা বৈধ-১৮৭
অন্যের খারাবী থেকে বাঁচার জন্য গীবত-১৮৮
অন্যের জানের ভয় হলে + প্রকাশ্যে গুনাহকারীর গীবত-১৮৯
এটাও গীবত-১৮৯
ফাসেক-ফাজেরের গীবত করা বৈধ নয়-১৯০
জুলুমের আলোচনা গীবত নয়-১৯০
গীবত থেকে বাঁচার জন্য প্রয়োজন ইচ্ছা ও সাহস-১৯১
গীবত থেকে বাঁচার চিকিৎসা-১৯১
গীবতের কাফফারা + ক্ষতি পূরণের পদ্ধতি-১৯২
ক্ষমা নেওয়া ও ক্ষমা করার ফযীলত + রাসূলুল্লাহ সা.-এর ক্ষমা প্রার্থনা-১৯৩
ইসলামের একটি মূলনীতি-১৯৪
গীবত থেকে বাঁচার সহজ পথ + নিজের দোষ দেখুন-১৯৫
গীবত সব অনিষ্টের মূল + ইশারা-ইঙ্গিতে গীবত করা-১৯৬
গীবত থেকে বাঁচার চেষ্টা করুন-১৯৭
গীবত থেকে বাঁচার পদ্ধতি-১৯৭
গীবত থেকে বাঁচার দৃঢ় সংকল্প করুন-১৯৮
পরনিন্দা একটি মারাত্মক গুনাহ-১৯৯
পরনিন্দা গীবত থেকেও মারাত্মক-১৯৯
কবরের আযাবের অন্যতম দু'টি কারণ-১৯৯
পেশাবের ছিটা থেকে বেঁচে থাকবে-২০০
পরনিন্দা থেকে বেঁচে থাকতে হবে-২০১
গোপন তথ্য প্রকাশ করা পরনিন্দার মত-২০১
যবানের দু'টি বড় গুনাহ-২০২

অনুবাদকের কথা

বর্তমানে আমাদের ব্যক্তিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবন গুনাহের ভারে নুয়ে পড়েছে। গুনাহের অকল্যাণ ও কলুষতায় জীবনের সব সুখ-শান্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। চরম অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠায় অতিবাহিত হচ্ছে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত। প্রীতি-সৌহার্দ ও আন্তরিকতা-ভালবাসার পরিবর্তে বেড়েই চলছে দূরত্ব ও বিচ্ছিন্নতা। সুখ ও শান্তির জীবন কল্প-রাজ্যের বিষয় বলে মনে হয়...। আর সত্য কথা হল, এগুলো আমাদের পাপ ও মন্দকর্মের অনাকাঙ্খিত ফল।

আমাদের আপদমস্তক পুরোঁাই গুনাহের নর্দমায় নিমজ্জিত। অধিকন্তু এমন কোন গুনাহ নেই, যা আমাদের জীবনের অংশে পরিণত হয়নি। বিশেষভাবে মৌখিক গুনাহে আমাদের লিপ্ততা খুব বেশি। সবচেয়ে মারাত্মক ও আশঙ্কার বিষয় হল এগুলোকে আমরা গুনাহের কাজই মনে করি না।

মৌখিক এসব গুনাহের মধ্যে অন্যতম হল 'গীবত'। বর্তমানে আমরা গীবতে এতটাই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে, এটি যে একটি অন্যায় ও ধ্বংসাত্মক গুনাহ– সে কথাই আমরা ভুলে গেছি। অথচ রাসূলুল্লাহ্ সা. গীবতকে 'মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া' ও 'আপন মায়ের সাথে যেনা করা'র চেয়েও জঘণ্য বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর আমরা এ সম্পর্কে একদম বেপরোয়া ও উদাসীন।

বর্তমান মুসলিম বিশ্বের অন্যতম ইসলামী ব্যক্তিত্ব, যুগের থানবী, শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম– এ বিষয়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে সারগর্ভ আলোচনা করেছেন। এর ক্ষতি ও ভয়ঙ্কর দিকসমূহ এবং এর থেকে বাঁচার পথ-পদ্ধতি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন।

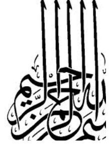
এ ছোট্ট পুস্তিকা গীবতের ভয়ঙ্কর গুনাহ থেকে বাঁচার অমূল্য পাথেয় হোক– এই প্রত্যাশা রইল।

আল্লাহ তাআলা আমাদের এ খেদমতটুকু কবুল করুন এবং এর উসিলায় আমাদের সবাইকে এই ভয়ঙ্কর গুনাহ থেকে বাঁচার তাওফীক দান করুন। আমীন ॥

মুহাম্মাদ নূরুল আলম
ধানগড়া, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ
০৫.০৫.০৭ ঈ.

'গীবত' অর্থ কারো অগোচরে তার দোষ চর্চা করা। চাই উক্ত দোষ তার মধ্যে সত্যিকারার্থেই থাকুক না কেন, তবুও তা আলোচনা করলে গীবতের অন্তর্ভূক্ত হবে।

'মানুষের গোশত খাওয়া-নিজের ভাইয়ের গোশত খাওয়া। আবার ভাইও জীবিত নয়, মৃত। মানুষের গোশত খাওয়া, আপন মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার মত গীবতও একটি হীন কাজ এবং গুনাহও বড় ভয়ঙ্কর ও মারাত্মক।'



গীবত : একটি ভয়ঙ্কর গুনাহ

মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ

لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

'তোমাদের কেউ যেন কারো পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে? বস্তুতঃ তোমরা তো একে ঘৃণাই কর। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।' (সূরা ৪৯ হুজুরাত, আয়াত-১২)

গীবত এমন একটি গুনাহ যা আমাদের সমাজ জীবনে সংক্রামকের ন্যায় ছড়িয়ে পরেছে। আমাদের কোন আসর এবং আলোচনার কোন মজলিশ গীবত থেকে মুক্ত নয়। রাসূলুল্লাহ সা.-এর জন্য কঠিন ধমকি দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে গীবতের ব্যাপারে এত ভয়ঙ্কর শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যা অন্য কোন গুনাহের ব্যাপারে করা হয়নি।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন– 'একে অপরের দোষ চর্চা কর না। কেননা এটা এমন খারাপ কাজ, যেমন নিজের মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া। তোমাদের কেউ কি এটা পছন্দ কর যে, নিজের মৃত ভাইয়ের গোশত খাবে? সুতরাং যখন তোমরা এ কাজ খারাপ মনে কর, তাহলে গীবতকেও খারাপ মনে কর।

গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন, উক্ত আয়াতে গীবতের কত বড় খারাবী বর্ণনা করা হয়েছে। মানুষের গোশত খাওয়া-নিজের ভাইয়ের গোশত খাওয়া। আবার ভাইও জীবিত নয়, মৃত। মানুষের গোশত খাওয়া, আপন মৃত ভাইয়ের

গোশত খাওয়ার মত গীবতও একটি হীন কাজ এবং গুনাহও বড় ভয়ঙ্কর ও মারাত্মক।

গীবতের সংজ্ঞা

'গীবত' অর্থ কারো অগোচরে তার দোষ চর্চা করা। চাই উক্ত দোষ তার মধ্যে সত্যিকারার্থেই থাকুক না কেন, তবুও তা আলোচনা করলে গীবতের অন্ত র্ভূক্ত হবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বলেন–

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْغِيبَةُ

'এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! গীবত কি?'

উত্তরে রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করলেন–

ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ

'তোমার কোন মুসলমান ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার এমন আলোচনা করা, যা সে পছন্দ করে না।'

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে, সে যদি জানতে পারে যে, আমার আলোচনা উক্ত মজলিসে এভাবে হয়েছে, আর এতে যদি সে কষ্ট পায় এবং এটাকে অপছন্দ করে, তাহলে এটা 'গীবত'।

ঐ সাহাবী আবার প্রশ্ন করলেন-

أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ

'যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে বাস্তবেই সে দোষ থাকে, যা আমি তার সম্পর্কে বলছি, তাহলেও কি গীবত হবে?'

উত্তরে রাসূলুল্লাহ সা. বললেন–

إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ

'যদি বাস্তবেই সে দোষ তার মধ্যে থাকে, তবেই তো গীবত। আর যদি না থাকে তবে তো সেটা অপবাদ। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস-১৮৫৭)

আমাদের কোন আসর, কোন মজলিস গীবত থেকে খালি নয়। দিন-রাত সর্বক্ষণ এ গুনাহে লিপ্ত। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে হেফাজত করুন। আমীন।

কেউ কেউ বলে, গীবত করছি না, বাস্তবতা বলছি। আর একথা আমি তার সামনেই বলতে পারব। উদ্দেশ্য হল, আমি একথা তার সামনেই বলতে পারব, তাই এটা গীবত নয়।

মনে রাখবেন! তার সামনে বলতে পারলেও গীবত হবে, বলতে না পারলেও গীবত হবে। 'কারো দোষ চর্চা করাই গীবত।'

গীবত কবীরা গুনাহ

মদপান, ডাকাতী, ব্যভিচার ইত্যাদি যেমন কবীরা গুনাহ, ঠিক তেমনি গীবতও কবীরা গুনাহ। স্পষ্ট হারাম। বরং গীবত বান্দার হকের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে এর গুনাহ তুলনামূলক বেশি, ভয়ঙ্কর ও মারাত্মক। কারণ, বান্দার হক নষ্ট করলে যতক্ষণ সে ব্যক্তি ক্ষমা না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা ক্ষমা করা হবে না।

অন্যান্য গুনাহ তাওবা দ্বারা মাফ হতে পারে। কিন্তু গীবতের গুনাহ তাওবা দ্বারা মাফ হবে না। এ দ্বারা উক্ত গুনাহের ভয়াবহতার অনুমান করা যায়। আল্লাহর ওয়াস্তে গীবত করা ও শোনা থেকে বিরত থাকুন। যে মজলিসে গীবত হচ্ছে সেখানে আলোচনার দিক পরিবর্তন করার চেষ্টা করুন। অন্য কোন আলোচনা তুলে ধরুন। সম্ভব না হলে উক্ত মজলিস ত্যাগ করুন। কারণ, 'গীবত করাও হারাম, শোনাও হারাম'।

গীবতকারী আপন চেহারা আঁচড়াবে

হযরত আনাস বিন মালেক রাযি. হুজুর সা.-এর বিশিষ্ট খাদেম ছিলেন। দশ বছর তাঁর খেদমত করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন–

لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمُشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ

فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ

'মেরাজের রাতে আমাকে উপরে নেয়া হলে সেখানে এমন কিছু মানুষের পাশ দিয়ে আমার অতিক্রম হয়, যারা নিজেদের আঙ্গুল দ্বারা নিজেদের চেহারা ও বুক আঁচড়াচ্ছিল। আমি হযরত জিবরাইল আ. কে জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কারা? তিনি বললেন, এরা ঐ সমস্ত মানুষ, যারা মানুষের গোশত খেত এবং তাদের সম্মান ও মর্যাদার উপর আঘাত-আক্রমণ করত।'

(আবু দাউদ শরীফ, হাদীস-৪২৩৫)

গীবত যেনার চেয়েও ভয়ঙ্কর

রাসূলুল্লাহ সা. বিভিন্নভাবে গীবতের ভয়াবহতা সাহাবাগণের সামনে তুলে ধরেছেন। এগুলো আমাদের দৃষ্টির সামনে রাখা উচিত, যেন আমাদের অন্তরে

এর খারাবী দৃঢ়ভাবে বসে। আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে এর খারাবী আমাদের অন্তরে দৃঢ় করুন এবং তা থেকে বাঁচার তাওফীক দান করুন। আমীন।

উক্ত হাদীসে গীবতকারীর পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা নিজেই নিজের চেহারা আচঁড়াবে ও নিস্পেষণ করতে থাকবে।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে- যা সনদের দিক থেকে বেশি মজবুত না হলেও অর্থের দিক থেকে সঠিক। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন–

الغيبة أشد من الزنا

'গীবতের গুনাহ যেনার চেয়েও মারাত্মক ও ভয়ঙ্কর'।

সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যেনার চেয়ে গীবত মারাত্মক ও ভয়ঙ্কর কীভাবে? রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করলেন–

إن الرجل ليزني فيتوب فيتوب الله عليه

'কারণ, যেনা করলে এক সময় সে তার কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হয়ে তাওবা করবে। তখন আল্লাহ তাআলা তার গুনাহ মাফ করে দেবেন।'

অন্য বর্ণনায় আছে–

وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفرها له صاحبه

'গীবতের গুনাহ ঐ সময় পর্যন্ত ক্ষমা হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ ব্যক্তি ক্ষমা না করবে, যার গীবত করা হয়েছে।' (মেশকাত শরীফ, হাদীস-৪৮৭৪)

এর দ্বারা অনুমান করুন, এটা কেমন ভয়ঙ্কর ও মারাত্মক গুনাহ।

গীবতকারীকে জান্নাতে যেতে দেয়া হবে না

একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, 'গীবতকারী পৃথিবীতে ভাল কাজ করবে, নামায পড়বে, রোযা রাখবে এবং অন্যান্য ইবাদত করবে। কিন্তু তারা পুলছিরাত পার হয়ে জান্নাতে যেতে পারবে না। তাদেরকে বাধা দেয়া হবে।'

'পুলছিরাত' এমন একটি পুল, যা দোযখের উপরে অবস্থিত। জান্নাতবাসী তা পার হয়ে জান্নাতে পৌঁছে যাবে। আর জাহান্নামীকে উক্ত পুল থেকে টেনে নামানো হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। কিন্তু গীবতকারীকে উক্ত পুলে উঠতেই দেয়া হবে না। তাকে বলা হবে, যার গীবত করেছ তার নিকট ক্ষমা নিয়ে এখানে আসো। অর্থাৎ যার গীবত করা হয়েছে তার কাছে ক্ষমা না নিলে পুলছিরাতে উঠতেই দেয়া হবে না, তাহলে সে কীভাবে পার হয়ে জান্নাতে যাবে?

গীবত নিকৃষ্টতম সুদ

একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, 'সুদ অনেক বড় গুনাহ। সুদের মধ্যে অসংখ্য-অগণিত খারাবী রয়েছে। সুদ অনেক গুনাহের সমন্বয়কারী। আর এই সুদের সর্বনিম্ন গুনাহ এমন (নাউজুবিল্লাহ) যেমন কোন ব্যক্তি নিজ মায়ের সাথে যেনা করে।'

দেখুন! সুদ এর উপরে এত কঠিন ধমকি এসেছে, যা অন্য কোন গুনাহের উপর আসেনি। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন–

إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرِّبَا الاِسْتِطَالَةَ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ

'সবচেয়ে নিকৃষ্টতম সুদ হল এই যে, কোন ব্যক্তি নিজ মুসলমান ভাইয়ের সম্মানের উপর অন্যায়ভাবে আক্রমণ করে।' কত বড় ধমকি বর্ণনা করিয়াছেন। (আবু দাউদ শরীফ, হাদীস-৪২৩৩)

গীবত মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার নামান্তর

এক হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সা.-এর যামানায় দু'জন মহিলা রোযা রেখে পরস্পর কথা বলছিল। এক পর্যায়ে তারা কারো গীবত করল। কিছুক্ষণ পর হুজুর সা.-এর খেদমতে এক ব্যক্তি এসে বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঐ দুজন মহিলা রোযা রেখেছিল, কিন্তু তাদের বর্তমান অবস্থা খুব শোচনীয়। পিপাসায় তাদের জীবন ওষ্ঠাগত। এবং মহিলাদ্বয় মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে।

রাসূলুল্লাহ সা. ওহীর মাধ্যমে জানলেন যে, তারা গীবত করেছে, তাই তাদের এ অবস্থা। রাসূলুল্লাহ সা. নির্দেশ দিলেন যে, মহিলাদ্বয়কে আমার নিকট নিয়ে আস। তাদেরকে আনা হল। তখন হুজুর সা. দেখলেন, বাস্তবেই তাদের অবস্থা বড় শোচনীয়। রাসূলুল্লাহ সা. পুনরায় হুকুম দিলেন যে, বড় একটি পিয়ালা নিয়ে আস। অতএব, পেয়ালা উপস্থিত করা হল রাসূলুল্লাহ সা. তাদের একজনকে নির্দেশ দিলেন যে, তুমি এই পেয়ালাতে বমি কর। সে বমি করতে আরম্ভ করল। তখন বমির সাথে রক্ত, পুঁজ ও গোস্তের টুকরা বের হল। এরপর অপর মহিলাকে বললেন যে, তুমিও বমি কর। সেও বমি করল। তার বমিতেও অনুরূপ রক্ত, পুঁজ এবং গোশতের টুকরা বের হল, এমনকি তা দ্বারা পেয়ালাটি ভরে গেল।

অতঃপর হুজুর সা. বললেন, এগুলো তোমাদের ঐ সমস্ত ভাই- বোনদের রক্ত, পুঁজ, ও গোশতের টুকরা, যা তোমরা দু'জন রোযা অবস্থায় ভক্ষণ করেছিলে। তোমরা রোযা অবস্থায় হালাল খাদ্য হতে বিরত থেকেছ ঠিক, কিন্তু হারাম খাদ্য অর্থাৎ অপর মুসলমান ভাইয়ের রক্ত, পুঁজ ও গোশত খাওয়া

পরিত্যাগ করনি। যার ফলে তোমাদের পেটের এই অবস্থা। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সা. তাদেরকে বলেন, 'আগামীতে কখনো গীবতে লিপ্ত হবে না'।

দেখুন! আল্লাহ তাআলা গীবতের বাস্তবরূপ দেখালেন যে, গীবতের পরিণাম এমনই হয়। আসল কথা হল, আমাদের রুচি নষ্ট হয়ে গেছে। আমাদের অনুভূতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। যার ফলে গুনাহের ক্ষতি ও অনিষ্টতা আমাদের অন্তর থেকে চলে গেছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা যাদেরকে রুচি ও বিবেক দান করেছেন, সুস্থ অনুভূতি দান করেছেন, তাদেরকে এর বাস্তবতা দেখিয়ে দেন।

গীবত করার উপর ভীতিকর স্বপ্ন

'রিবয়ী' নামক একজন তাবেয়ী ছিলেন। তিনি নিজের একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। একদা আমি কোন এক মজলিসে উপস্থিত হয়ে দেখি, লোকেরা বসে কথা বলছে। আমিও উক্ত মজলিসে বসলাম। আলোচনার এক পর্যায়ে গীবত শুরু হয়ে গেল। আমার এটা খারাপ লাগল যে, আমরা এখানে বসে গীবত করছি। এরপর আমি উক্ত মজলিস থেকে উঠে চলে গেলাম।

কিছুক্ষণ পর ভাবলাম, হয়ত উক্ত মজলিসে গীবতের আলোচনা শেষ হয়ে গেছে। এজন্য আমি দ্বিতীয়বার উক্ত মজলিসে যোগ দিলাম। কিছু সময় এটা সেটা আলোচনা হল। কিন্তু একটু পর আবার গীবত শুরু হল। তবে এবার মজলিস থেকে উঠার হিম্মত হল না। প্রথমে তাদের গীবত শুনছিলাম। পরে নিজেও গীবতের দু'একটি বাক্য বলে ফেললাম।

অতঃপর মজলিস ত্যাগ করে বাড়ী আসলাম। রাতে ঘুমানোর পর একটি ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখলাম। অত্যন্ত কালো-কুশ্রী একজন মানুষকে দেখলাম। বড় একটি প্লেটে আমার জন্য গোশত নিয়ে এসেছে। গভীর দৃষ্টিতে দেখি, তা ছিল শুকুরের গোশত। অতঃপ সে আমাকে বলল, 'এ গোশত খাও'। আমি বললাম, আমি মুসলমান! শুকুরের গোশত কীভাবে খাব?' সে বলল, 'তোমাকে খেতেই হবে'। এক পর্যায়ে সে জোর করে গোশতের টুকরা তুলে আমার মুখের ভিতর ঢুকানো শুরু করল। আমি বাধা দিতে থাকি, আর সে মুখে ঢুকাতেই থাকে। এমনকি আমার বমির উপক্রম হয়, তবুও সে আমার মুখে উক্ত গোশত ঢুকাতেই থাকে। অতঃপর এই কঠিন কষ্টের অবস্থায় আমার চোখ খুলে যায়। ঘুম থেকে জাগার পর যখন খানা খেলাম, তখন স্বপ্নের মধ্যে শুকুরের গোশতের যে দূর্গন্ধ ও খারাপ স্বাদ ছিল তা অনুভব করলাম। ত্রিশ দিন যাবত আমার এ অবস্থা ছিল যে, যখনই আমি পানাহার করতাম, আমার সব খাদ্যের মধ্যে শুকুরের গোশতের দূর্গন্ধ ও খারাপ মজা আসত।

উক্ত তাবেয়ী বলেন, এ ঘটনার দ্বারা আল্লাহ তাআলা সর্তক করলেন যে, অল্প একটু সময় আমি মজলিসের মধ্যে গীবত করেছিলাম, যার খারাপ মজা ও দূর্গন্ধ ত্রিশ দিন পর্যন্ত অনুভব করতে থাকি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এর থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

এজন্য কোন মজলিসে যদি গীবত হতে থাকে, তাহলে সকলের উচিত তা বন্ধ করা। অতঃপর যদি বন্ধ করার শক্তি না থাকে তবে কমপক্ষে নিজে উক্ত আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবে না, বরং সেখান থেকে উঠে চলে যাবে।

হারাম খাওয়ার অপকারিতা

পরিবেশ খারাপ হওয়ার কারণে আমাদের অনুভূতিও নষ্ট হয়ে গেছে। গুনাহকে আমরা আর গুনাহই মনে করছি না।

হযরত মাওলানা ইয়াকুব নানুতুবী রহ. বলতেন, কোন এক দাওয়াতে গিয়ে সন্দেহযুক্ত কিছু খানা খেয়েছিলাম। হারাম হওয়ার সন্দেহ ছিল। পরবর্তীতে তার অপকারিতা, হারামের কলুষিতা কয়েক মাস পর্যন্ত অনুভব করতে থাকি। খারাপ মানসিকতা সৃষ্টি হত। গুনাহ করার ইচ্ছা হত। মন্দ কাজে লিপ্ত হওয়ার প্রচণ্ড আগ্রহ হত।

গুনাহের প্রতিক্রিয়া হল, অন্তরে অন্ধকার সৃষ্টি হয়। যার ফলে গুনাহের চাহিদা সৃষ্টি হয়, গুনাহের ইচ্ছা জাগে, একসময় তাতে লিপ্ত হয়। আল্লাহ তাআলা আমাদের অনুভূতি ঠিক করে দিন। আমীন।

গীবতের গুনাহ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। আল্লাহ তাআলা যাকে সঠিক অনুভূতি দান করেছেন, সে বুঝতে পারে আমি কী করছি। কত বড় গুনাহে লিপ্ত হচ্ছি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এসব গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন।

যেসব ক্ষেত্রে গীবত করা বৈধ

পূর্বে গীবতের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে যে, কারো অগোচরে তার আলোচনা এভাবে করা যে, সে জানতে পারলে মন খারাপ করবে। যদিও সে কথা সঠিক ও সত্য হয়, তবুও তা গীবত হবে।

শরীয়ত সবকিছুর প্রতি দৃষ্টি রেখেছে। মানুষের সৃষ্টিগত অভ্যাসের প্রতিও দৃষ্টি রেখেছে। বৈধ প্রয়োজনের প্রতিও দৃষ্টি রেখেছে। এ কারণে কিছু কিছু বস্তুকে গীবত থেকে পৃথক করে দিয়েছে, যদিও তা বাহ্যিক দৃষ্টিতে গীবত মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা গীবত নয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে তা বৈধ।

অন্যের খারাবী থেকে বাঁচার জন্য গীবত

যেমন, কেউ এমন কাজ করছে, যাতে অন্যের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তখন তাকে বলতে হবে যে, অমুক ব্যক্তি থেকে সাবধানে থাকবে, সে তোমার ক্ষতি করতে পারে। এভাবে বলে দিলে তা গীবত হবে না।

রাসূলুল্লাহ সা. উম্মাতকে সবকিছু শিখিয়ে গেছেন। এমন ব্যক্তির অনিষ্ট থেকে বাঁচার শিক্ষাও তিনি আমাদেরকে দিয়েছেন। এক হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট বসা ছিলাম। এক ব্যক্তি আমাদের দিকে আসছিল। সে দূরে রাস্তায় ছিল। রাসূলুল্লাহ সা. তার দিকে ইশারা করে বললেন, ‘সে তার বংশের খারাপ ব্যক্তিদের একজন’।

হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, আমি ঠিক-ঠাক হয়ে বসলাম, তার অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য সতর্ক হয়ে গেলাম। সে মজলিসে উপস্থিত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সা. নিজ অভ্যাস অনুযায়ী তার সাথে নরম ভাষায় কথা বললেন। সে চলে যাবার পর আমি জিজ্ঞেস করলাম–

قُلْتَ لَهُ مَا قُلْتَ ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ الْقَوْلَ

‘সে খারাপ’ এ কথা বলার পর তার সাথে নরম ও মিষ্টি ভাষায় কথা বললেন কেন?’

রাসূলুল্লাহ সা. বললেন–

يَا عَائِشَةُ إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ

‘হে আয়েশা! যার অনিষ্টতার ভয়ে লোকেরা তার থেকে দূরে থাকে, সে খুব খারাপ ব্যক্তি।’ (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং-১৯১৯)

অর্থাৎ তার স্বভাবের মধ্যেই খারাবী আছে। তার সাথে নরম ও মিষ্টি ভাষায় কথা না বললে সে ফেতনা-ফাসাদ শুরু করতে পারে। এজন্য আমি অভ্যাস অনুযায়ী তার সাথে নরম ব্যবহার করলাম।

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ওলামায়ে কেরাম লেখেছেন, রাসূলুল্লাহ সা. হযরত আয়েশা রাযি.কে যা বললেন, বাহ্যিক দৃষ্টিতে তা গীবত মনে হয়। কারণ, তার অগোচরে বলা হয়েছে। কিন্তু এমন গীবত এজন্য বৈধ যে, রাসূলুল্লাহ সা.-এর উদ্দেশ্য ছিল হযরত আয়েশা রাযি.কে সতর্ক করা, যেন ভবিষ্যতে তার খারাবী থেকে বাঁচতে পারে। এজন্য কাউকে কারো অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য তার অগোচরে কোন খারাবী বর্ণনা করা জায়েয। তার অগোচরে এমনটি বলা গীবতের অন্তর্ভূক্ত হবে না।

অন্যের জানের ভয় হলে

বরং কখনো কখনো এমন হয় যে, এমন ব্যক্তির খারাবী বর্ণনা করা ওয়াজিব তথা জরুরী হয়ে যায়। যেমন, কেউ কারো উপর আক্রমণের প্রস্তুতি নিলে, তার এ আক্রমণ সম্পর্কে অবহিত করা অত্যন্ত জরুরী হয়ে যায়। তখন যার উপর আক্রমণ হবার সম্ভবনা আছে, তাকে বলে দিতে হবে যে, অমুক ব্যক্তি তোমার উপর আক্রমণ করতে পারে, তুমি সাবধানে থেকো। যেন সে তার অনিষ্ট থেকে রেহাই পায়। এমন স্থানে গীবত করা শুধু বৈধই নয়, বরং জরুরীও বটে।

প্রকাশ্যে গুনাহকারীর গীবত

এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে– যার সঠিক উদ্দেশ্য মানুষ বোঝে না। হাদীসটি হল, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'ফাসেকের গীবত করলে তা গীবতের অন্তর্ভূক্ত হবে না।' কেউ কেউ এ কথার উদ্দেশ্য এটা বোঝে যে, কেউ গুনাহে কবীরাতে লিপ্ত হলে, বেদআতে লিপ্ত হলে তার গীবত করা বৈধ। অথচ হাদীসের উদ্দেশ্য এটা নয়।

হাদীসের উদ্দেশ্য হল– যে ব্যক্তি প্রকাশ্য অন্যায়-অপকর্মে লিপ্ত আছে, তার এ অপকর্ম সম্পর্কে বললে তা গীবত হবে না। কারণ, সে নিজেই প্রকাশ্যে এসব করছে। তার অগোচরে বললে সে খারাপ মনে করবে না, আর তা গীবতও হবে না। যেমন, কেউ প্রকাশ্যে মদ পান করে। এমন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে 'সে মদ পান করে' এ কথা বললে তা গীবত হবে না।

এটাও গীবত

তবে সে এমন কিছু কাজ করে, যা অন্যের সামনে প্রকাশ হওয়া পছন্দ করে না। এমন বিষয়ের আলোচনা তার অনুপস্থিতে করলে তা গীবতের হবে। যেমন, কেউ প্রকাশ্যে মদ পান করে, সুদ গ্রহণ করে, কিন্তু অন্য কোন গুনাহ গোপনে করে, প্রকাশ করে না। আর সে গুনাহও এমন নয়, যার ক্ষতি অপর পর্যন্ত পৌঁছবে। তাহলে এমন বিষয়ের আলোচনা করা বৈধ হবে না। তা 'গীবত' হবে।

মোটকথা, যে গুনাহ প্রকাশ্যে করে, তার আলোচনা করা গীবত নয়, কিন্তু যে গুনাহ প্রকাশ্যে করে না, তার আলোচনা করা গীবত।

ফাসেক-ফাজেরের গীবত করা বৈধ নয়

হযরত থানবী রহ. বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. এক মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি হাজ্জাজ বিন ইউসুফের অপকর্মের কথা বলতে শুরু করে তখন তিনি তাকে বললেন, এটা গীবত হচ্ছে। আর এমন ভেবো না যে, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ লাখো মানুষকে খুন করেছে বলে তার গীবত করা বৈধ। অথচ তার গীবত করাও বৈধ নয়। আল্লাহ তাআলা হাজ্জাজ বিন ইউসুফের খুনের হিসাবও গ্রহণ করবেন, তোমার গীবতের হিসাবও গ্রহণ করবেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে 'গীবত' থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

সুতরাং এ কথা ভেবো না যে, অমুক ব্যক্তি ফাসেক, ফাজের ও বেদআতী। অতএব তার গীবত করা বৈধ। যত খুশি তার গীবত করব। এমন ভাবা নির্বুদ্ধিতা। এ ধরনের ফাসেকদের গীবত করাও অন্যায়। এর থেকে বিরত থাকা অত্যন্ত জরুরী।

জুলুমের আলোচনা গীবত নয়

আরো একটি ক্ষেত্রে শরীয়ত গীবতকে বৈধ করেছে। সেটা হল– একজন আপনার উপর জুলুম করেছে। আর আপনি তার জুলুমের আলোচনা অন্য কারো সাথে করলেন যে, অমুক আমার সাথে এই জুলুম করে এবং বাড়াবাড়ী করে। এমন বলা গীবত নয়। এতে গুনাহ নাই। যার কাছে জুলুমের আলোচনা করছেন, সে তা সংশোধন করতে সক্ষম হোক বা না হোক।

যেমন কেউ আপনার ঘরে চুরি করেছে। এমতাবস্থায় থানায় গিয়ে চুরি সম্পর্কে জানালে তা গীবতের অন্তর্ভূক্ত হবে না। কারণ, সে আপনার ক্ষতি করেছে, আপনার উপর জুলুম করেছে। আপনি তার জুলুমের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন। এটা গীবত নয়। চুরির ঘটনা এমন ব্যক্তির নিকটও যদি বলা হয়, যে তার কোন প্রতিকার করতে পারবে না, তবুও তাতে কোন গুনাহ হবে না এবং তা গীবতেরও অন্তর্ভূক্ত হবে না।

দেখুন, শরীয়ত আমাদের স্বভাবের দিকে লক্ষ্য করে এমন গীবতকে বৈধ করেছেন। মানুষের স্বভাব হল, জুলুমের কথা বলে নিজের অন্তরে শান্তি লাভ করে। যার কাছে বলছে, সে তার কোন প্রতিকার করতে সক্ষম হোক বা না হোক।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا

'মন্দ কথার প্রচার আল্লাহ পছন্দ করেন না, তবে যার উপর অত্যাচার করা হয়েছে, সে তার জুলুমের কথা অন্যের কাছে বলতে পারে। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।' (সূরা ৪ নিসা, আয়াত-১৪৮)

মোটকথা, আল্লাহ তাআলা এগুলোকে গীবতের অন্তর্ভূক্ত করেননি। কিন্তু আমরা আসর-মজলিসে বসে সময় কাটানোর জন্য অন্যের দোষচর্চায় লিপ্ত হই। এসবই গীবতের অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহর ওয়াস্তে নিজের আত্মার উপর দয়া করে এই মানসিকতা ত্যাগ করার চেষ্টা করি এবং যবানকে একটু নিজের অধীনে নিয়ে আসি। একটু বাগডোর পরাই। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে গীবত থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন।

গীবত থেকে বাঁচার জন্য প্রয়োজন ইচ্ছা ও সাহস

গীবতের আলাচনা করলাম, আর আপনারা শুনলেন। শুধু বললে ও শুনলে কাজ হবে না, বরং তা পরিত্যাগ করার দৃঢ় ইচ্ছা ও সংকল্প করতে হবে যে, আজ থেকে আর কারো গীবত করব না, ইনশাআল্লাহ। ভুলবশত কখনো হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তাওবা করব। উত্তম ও সঠিক চিকিৎসা হল, যার গীবত করা হয়েছে তাকে বলবে, আমি আপনার গীবত করেছি, আমাকে ক্ষমা করে দিন। আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ এমনি করে থাকেন।

গীবত থেকে বাঁচার চিকিৎসা

হযরত থানবী রহ. বলেন, কেউ কেউ আমাকে বলে, আমি আপনার গীবত করেছিলাম, আমাকে মাফ করে দিন। আমি তাদেরকে বলি, 'কী গীবত করেছিলে' তা বললে মাফ করতে পারি। এর উদ্দেশ্য হল, আমি যেন জানতে পারি যে, তারা আমার সম্পর্কে যে কথা বলেছে তা বাস্তবেই আমার মধ্যে বিদ্যমান আছে কি না। তখন আল্লাহ তাআলা তা থেকে আমাকে বাঁচার তাওফীক দেবেন।

তিনি বলেন, কখনো কারো গীবত করলে তার চিকিৎসা হল, তাকে গিয়ে বলুন, আমি আপনার গীবত করেছি। একথা বলা অনেক কষ্টদায়ক ও কঠিন। কিন্তু এর বিকল্প কোন চিকিৎসা নেই। এমনটি দু'চার বার করলে ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষা হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ।

হযরত হাসান বছরী রহ. গীবত থেকে বাঁচার অন্য একটি পন্থা বলেছেন। তিনি বলেন, কেউ দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়। তাই কারো গীবত শুরু হলে নিজের দোষসমূহকে কল্পনা করুন। ভাবুন, আমার মাঝেও ঐ দোষ রয়েছে। আমি অপরের দোষ আলোচনা করছি কেন? সাথে সাথে গীবতের ভয়াবহ শাস্তি র কথা খেয়াল করুন এবং আল্লাহর নিকট দুআ করুন, 'হে আল্লাহ! গীবত থেকে আমাকে মুক্তি দেন। হে আল্লাহ! মজলিসে এ আলোচনা হচ্ছে, আমাকে এর থেকে বাঁচান, যেন আমি এতে লিপ্ত না হই।

গীবতের কাফফারা

কিছু কিছু হাদীসে বর্ণিত আছে, (যদিও তা যঈফ তবে অর্থেক দিক থেকে সহীহ) সেটা হল, 'যদি কারো গীবত হয়ে যায়, তাহলে উক্ত গীবতের কাফফারা হল, তার জন্য খুব দুআ করবে, ক্ষমা প্রার্থনা করবে। যেমন মনে করুন যে, আজই কেউ এ বিষয়ে সতর্ক হল যে, বাস্তবিকই আমি অনেক অন্যায়ের মধ্যে লিপ্ত আছি। জানি না, কত মানুষের গীবত করেছি। এখন আর কারো গীবত করব না, ইনশাআল্লাহ । কিন্তু যাদের গীবত করেছি, তাদেরকে স্মরণ করব কীভাবে, তাদেরকে পাব কোথায়, আর তাদের থেকে কীভাবে ক্ষমা নেব? কোথায় কোথায় যাব? তাই এখন তাদের জন্য দুআ এবং ক্ষমা প্রার্থনা করা ছাড়া কোন উপায় নেই। তাদের জন্য এভাবে দুআ করবে–

اللهم اغفر لنا وله

(মেশকাত শরীফ, হাদীস নং-৪৮৭৭)

ক্ষতি পূরণের পদ্ধতি

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. এবং আমার শ্রদ্ধেয় পিতা হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. তো এটা করেছিলেন যে, একটি চিঠি লিখে পরিচিত সকলের নিকট প্রেরণ করেছিলেন। তাতে লেখা ছিল, জীবনে আপনার কত হক নষ্ট করেছি, কত ভুল করেছি, তা তো জানা নেই। সামগ্রিকভাবে আপনার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে ক্ষমা করে দিন।

আশা করা যায়, আল্লাহ তাআলা এর উছিলায় ঐসব হকসমূহকে ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু যদি মেনে নেওয়া হয় যে, এমন লোকদের হক নষ্ট করা হয়েছে, যাদের নিকট এখন যাওয়া সম্ভব নয়- হয়ত তাদের ইন্তেকাল হয়েছে অথবা তারা এমন স্থানে চলে গেছে, যেখানের ঠিকানা জানা সম্ভব নয়, তাহলে এমতাবস্থায় হযরত হাসান বছরী রহ. বলেন, যাদের গীবত করা হয়েছিল,

তাদের জন্য বেশি বেশি দুআ কর যে, 'হে আল্লাহ! আমি যাদের গীবত করেছিলাম তাদের মর্যাদা বাড়ীয়ে দিন এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সকল প্রকার উন্নতি দান করুন।'

আমরাও যদি আমাদের সম্পৃক্ত ব্যক্তিদেরকে এ ধরনের চিঠি দেই, তাহলে আমাদের সম্মানের হানী হয়ে যাবে কি? আমাদের মর্যাদা চলে যাবে কি? হতে পারে আল্লাহ তাআলা এর দ্বারা আমাদের ক্ষমার সম্বল তৈরি করে দেবেন।

ক্ষমা নেওয়া ও ক্ষমা করার ফযীলত

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যদি আল্লাহর কোন বান্দা কারো নিকট কৃত অন্যায়ের জন্য লজ্জিত হয়ে খাঁটি অন্তরে ক্ষমা চায়, আর সে এটা ভেবে ক্ষমা করে দেয় যে, সে আমার নিকট ক্ষমা চাচ্ছে, লজ্জিত হচ্ছে, তাহলে আল্লাহ তাআলা ক্ষমাকারীকে ঐ দিন ক্ষমা করবেন, যে দিন সে ক্ষমার সবচেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী হবে। আর যদি মাফ না করে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে ঐ দিন ক্ষমা করবেন না, যে দিন সে ক্ষমার সবচেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী হবে। আল্লাহ বলবেন, তুমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করনি, তোমাকে ক্ষমা করব কীভাবে?

বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর। সুতরাং কেউ লজ্জিত হয়ে ক্ষমা চাইলে সে তার দায়িত্ব আদায় করল। তার আর কোন সমস্যা বাকি থাকল না। চাই তাকে ক্ষমা করা হোক বা না হোক। এ জন্য বান্দার হক আদায় করার জন্য ক্ষমা নেয়া উচিত এবং কেউ ক্ষমা চাইলে তাকে ক্ষমা করাও উচিত।

রাসূলুল্লাহ সা.-এর ক্ষমা প্রার্থনা

আমি আর আপনি কোন শ্রেণীর? স্বয়ং নবী কারীম সা. একদা মসজিদে নব্বীতে দাঁড়িয়ে সাহাবাগণকে লক্ষ্য করে বললেন, আজ আমি নিজকে তোমাদের সামনে সোপর্দ করছি। যদি কোন ব্যক্তি আমার দ্বারা কষ্ট পেয়ে থাকে অথবা আমি কারো জান মালের ক্ষতি করে থাকি, তাহলে আজ আমি তোমাদের সামনে উপস্থিত। প্রতিশোধ নিতে চাইলে প্রতিশোধ নিয়ে নাও। আর ক্ষমা করতে চাইলে ক্ষমা করে দাও। যেন কেয়ামতের দিন তোমাদের কোন হক আমার উপর বাকি না থাকে।

দেখুন, দু'জাহানের সরদার, মুহসিন ও মহান পথপ্রদর্শক, যার এক নিঃশ্বাসের বিনিময়ে সাহাবায়েকেরাম নিজেদের জীবন কুরবান করতে রাজি

ছিলেন, তিনি বলছেন যে, কাউকে কোন কষ্ট দিয়ে থাকলে সে আমার থেকে বদলা গ্রহণ কর।

এমন সময় এক সাহাবী দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি একদা আমার কোমরে আঘাত করেছিলেন। আমি তার বদলা নিতে চাই। হুজুর সা. কোন প্রকার বিস্ময় প্রকাশ না করে বললেন, এসো এবং আমার কোমরে আঘাত করে বদলা নাও। সাহাবী রাসূলুল্লাহ সা.-এর পিছনে এসে বললেন, যে সময় আপনি আমাকে মেরেছিলেন, তখন আমার কোমর খোলা ছিল। আর এখন তো আপনার কোমরে কাপড় রয়েছে। এমতাবস্থায় বদলা নিলে পরিপূর্ণ বদলা নেয়া হবে না।

রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, আমি চাদর খুলে দিচ্ছি। এরপর হুজুর সা. চাদর উঠালেন। তখন ঐ সাহাবী অগ্রসর হয়ে 'মহরে নবুওয়্যাতে' চুম্বন করলেন, যা রাসূলুল্লাহ সা.-এর পিষ্ঠদেশে ছিল। অতপর সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ গোস্তাখী আমি শুধু এ জন্য করেছি, যাতে এই 'মহরে নবুওয়্যাত' চুম্বন করার সুযোগ পাই। আমার এ গোস্তাখী ক্ষমা করে দিন। (মাজমাউযযাওয়ায়েদ)

যাহোক, রাসূলুল্লাহ সা. এভাবেই নিজেকে সাহাবায়ে কেরামের সম্মুখে পেশ করেন। এখন আমরা লক্ষ্য করি যে, আমরা কোন পর্যায়ের? আমরা যদি আমাদের পরিচিতজনদের নিকট এমন লিখে পাঠাই, তাহলে এর দ্বারা আমাদের কী ক্ষতি হবে? হতে পারে এর দ্বারা আল্লাহ তাআলা আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর সুন্নাত পালনের নিয়তে করলে এর বরকতে আল্লাহ তাআলা আমাদের বেড়া পার করে দেবেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

ইসলামের একটি মূলনীতি

ইসলামের একটি মূলনীতি হল, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন–

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

'তোমাদের কেউ পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আপন মুসলমান ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ করবে না, যা নিজের জন্য পছন্দ করে।'

(তিরমিযী শরীফ, হাদীস-২৪৩৯)

এবার বল, কেউ যদি তোমার অনুপস্থিতে তোমার সমালোচনা করে, তখন তোমার কেমন লাগবে? তুমি কি তা ভাল মনে করবে, না খারাপ মনে করবে? যদি তুমি এটাকে খারাপ মনে কর এবং নিজের জন্য অপছন্দ কর, তাহলে অন্যের জন্য তা কেন পছন্দ করবে? এটাতো দুই মাপকাঠি নির্ধারণ করা হল,

নিজের জন্য এক নিক্তি আর অন্যের জন্য ভিন্ন আরেক নিক্তি। এর নামই 'নেফাক'। কপোঁতা। গীবতের মধ্যে নেফাকও রয়েছে। এসব কথা চিন্তা করুন এবং এর শাস্তি সম্পর্কে ভাবুন, তাহলে ইনশাআল্লাহ 'গীবত' করার মাত্রা ও মানসিকতা কমে যাবে।

গীবত থেকে বাঁচার সহজ পথ

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. বলেন, 'অন্যের ভাল-মন্দ কোন আলোচনা না করাই' গীবত থেকে বাঁচার সবচেয়ে সহজ পথ। কারণ, শয়তান বড় খবিছ। কারো ভাল আলোচনা করে বলবে, সে খুব ভাল মানুষ। তার ভিতর এসব ভাল গুণাবলী রয়েছে। তখন মাথায় এ কথা থাকবে যে, আমি তার গীবত করছি না। বরং তার ভাল গুণের আলোচনা করছি। কিন্তু তার ভাল গুণ বলতে বলতে শয়তান এমন একটি বাক্য ছেড়ে দেবে, যা দ্বারা সেই ভাল আলোচনা দোষে পরিণত হয়ে যাবে।

যেমন, সে বলবে ঐ ব্যক্তি মানুষতো খুব ভাল, কিন্তু তার মধ্যে এই দোষ রয়েছে। এই 'কিন্তু' শব্দটি পূর্বের সব গুণাবলী নষ্ট করে দেবে। যার ফলে আলোচনা গীবতের দিকে মোড় নেবে। এ জন্যই হযরত থানবী রহ. বলেছেন, অন্যের আলোচনাই করতে নেই। হ্যাঁ, কারো ভাল আলোচনা করলে কোমর শক্ত করে বসো, যাতে শয়তান ভুল পথে না ফেলে।

নিজের দোষ দেখুন

অন্যের দোষ না দেখে নিজের দোষ দেখুন। নিজের দোষগুলো স্মরণ করুন। মনে রাখবেন, অন্যের দোষে আপনাকে শাস্তি দেয়া হবে না। তার সাওয়াব ও গুনাহ সম্পর্কে সে চিন্তা করবে আর তার আল্লাহ চিন্তা করবেন। সকলেই নিজ নিজ আমলের পুরস্কার পাবে।

নিজের দোষ না দেখে অন্যের দোষ দেখার সুযোগ তখন হয়, যখন মানুষ নিজের থেকে এবং নিজের দোষ-ক্রটি থেকে উদাসীন হয়। কারণ, নিজের দোষ সামনে থাকলে কখনো অন্যের দোষের প্রতি দৃষ্টি যায় না। সে ব্যাপারে তার যবান কখনোই চলতে পারে না।

মরহুম বাহাদুর শাহ জাফর সুন্দর একটি কবিতা বলেছেন। যার অর্থ–

যখন নিজের দোষ-ক্রুতি থেকে বে-খবর ছিলাম,
তখন অন্যের দোষ-ক্রুটি খুঁজে বেড়াতাম।
যখন নিজের দোষের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছি,
তখন আর কেউই আমার চোখে খারাপ থাকেনি।

আল্লাহ তাআলা আপন অনুগ্রহে আমাদের অন্তরে নিজের দোষ-ক্রটির কল্পনা সৃষ্টি করে দিন। আমীন।

'আমাকে কবরের নির্জন ঘরে একাকী থাকতে হবে' ও 'আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে' এই কল্পনা না থাকা এবং নিজের প্রতি খেয়াল না থাকাই এসব ফেতনা-ফাসাদের মূল কারণ। কখনো একজনের দোষ, আবার কখনো অন্যজনের দোষ আলোচানা করতেই আমাদের দিন-রাত অতিবাহিত হচ্ছে। আল্লাহর ওয়াস্তে এগুলো থেকে পরিত্যাগ করার চেষ্টা করা উচিত।

যে অবস্থায়, যে সব পরিবেশে আমরা জীবন যাপন করছি, সেখানে এ কাজ মুশকিলতো বটেই। কিন্তু এ থেকে বাঁচা মানুষের সাধ্যের বাইরে না। কারণ, সাধ্যের বাইরে হলে আল্লাহ তাআলা এটাকে হারাম করতেন না। এ থেকে বেঁচে থাকা মানুষের ইচ্ছাধীন বিষয়। আলোচনার বিষয় যখনই পরিবর্তন হয়ে যায়, তখনই মূল আলোচনায় ফিরে যেতে হবে। আর কখনো গীবতে লিপ্ত হলে সাথে সাথে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে এবং ভবিষ্যতে তা থেকে বাঁচার সংকল্পকে পূনরায় তাজা করতে হবে।

গীবত সব অনিষ্টের মূল

মনে রাখবেন, এই গীবতই ঝগড়া বিবাদ, পরস্পরে বিবাদ-বিচ্ছেদ এর কারণেই হয়।

কেউ মদ পান করলে তা খারাপ ভাবা হয়। দ্বীনের সাথে কিঞ্চিত সম্পর্ক আছে এমন ব্যক্তিও তাকে ঘৃণার চোখে দেখে, তার এ কাজকে মন্দ জ্ঞান করে। খোদ মদপানকারী নিজেও তার এ কাজকে 'বড় গুনাহের কাজ' বলে মনে করে। কিন্তু কেউ গীবত করলে কেউ তার সম্পর্কে এতটুকু খারাপ ধারণা করে না এবং গীবতকারী নিজেও এ কথা মনে করে না যে, 'আমি মারাত্মক এক গুনাহে লিপ্ত রয়েছি'। কারণ, গীবতের খারাবী আমাদের অন্তরে নেই। এর বাস্তবতা সম্পর্কেও আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস নেই। কারণ, উক্ত দু'টি গুনাহের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। একটিকে খারাপ মনে করলে অপরটিকেও খারাপ মনে করা উচিত। তাই এই গুনাহের খারাবী অন্তরে সৃষ্টি করতে হবে যে, এটা অনেক বড় গুনাহ।

ইশারা-ইঙ্গিতে গীবত করা

হযরত আয়েশা রাযি. রাসূলুল্লাহ সা.-এর সামনে উপস্থিত ছিলেন। হযরত সুফিয়াহ রাযি.-এর আলোচনা উঠল। মানবিক তাকিদে সতীনদের মধ্যে

পরস্পর কিছু বিরোধিতা হয়ে থাকে। হযরত সুফিয়াহ রাযি. উচ্চতায় কিছুটা খাটো ছিলেন। তখন হযরত আয়েশা রাযি. তার আলোচনা করতে গিয়ে হাত দ্বারা এইভাবে ইশারা করলেন যে, সে ছোট দেহের ঠগের পত্নী। যবানে একথা বলেনি যে, সে ঠগের পত্নী। বরং শুধু হাত দ্বারা ইশারা করেছেন। তখন নবী কারীম সা. আয়েশা রাযি. কে বললেন–

لَقَدْ مَزَجْتِ بِكَلِمَةٍ لَوْ مَزَجْتِ بِهَا مَاءَ الْبَحْرِ لَمُزِجَ

'আয়েশা! তুমি আজকে এমন একটি কাজ করলে, যদি তার দুর্গন্ধ এবং বিষ সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়, তাহলে পুরা সমুদ্রকে দুর্গন্ধ এবং বিষাক্ত বানিয়ে দেবে।' (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং-২৪২৬)

দেখুন, নবী কারীম সা. ইঙ্গিতপূর্ণ এই গীবতকে কেমন মারাত্মক দোষ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

অতপর রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, কেউ পুরা পৃথিবীর সম্পদ আমাকে এনে দিলেও আমি কারো এমন আলোচনা করতে রাজি নই, যাতে তার উপহাস রয়েছে এবং তার দোষের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে।

গীবত থেকে বাঁচার চেষ্টা করুন

অপরের কোন কথা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করাা একটি সুক্ষ্ম বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এমন ব্যক্তির প্রশংসা করা হয়। অথচ রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, কেউ আমাকে পৃথিবীর সম্পূর্ণ সম্পদ এনে দিলেও আমি কারো কথা নকল করতে প্রস্তুত নই। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, নবী কারীম সা. কত গুরুত্বের সাথে এ সব থেকে নিষেধ করেছেন। অথচ আমরা মদ পান করাকে দোষণীয় মনে করি, যেনা-ব্যভিচারকে দোষণীয় মনে করি, কিন্তু গীবতকে দোষণীয় মনে করি না। এটাকে মায়ের দুধের মত হালাল মনে করি। কোন মজলিসই এটা থেকে খালি নেই। আল্লাহর ওয়াস্তে গীবত থেকে বাঁচার চেষ্টা করুন।

গীবত থেকে বাঁচার পদ্ধতি

গীবত থেকে বাঁচার পদ্ধতি হল, এর অনিষ্টতা অন্তরে সৃষ্টি করে আল্লাহ তাআলার নিকট দুআ করতে হবে যে, 'হে আল্লাহ! গীবত অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও মারাত্মক গুনাহ। আমি এ থেকে বাঁচতে চাই। কিন্তু বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে কথার মাঝে গীবতের কথাও হয়ে যায়। হে আল্লাহ! আমি

নিজের পক্ষ থেকে এ দৃঢ় অঙ্গীকার করছি যে, আগামীতে আর গীবত করব না। আমাকে আমার সংকল্পের উপর দৃঢ়, অটল ও স্থির থাকার তাওফীক দান করুন। হে আল্লাহ! আমাকে হিম্মত দান করুন। শক্তি দান করুন। দৃঢ়তার সাথে এ দুআ করুন। ইনশাআল্লাহ, অবশ্যই মুক্তি পাবেন।

গীবত থেকে বাঁচার দৃঢ় সংকল্প করুন

দেখুন, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ কোন কাজের দৃঢ় পরিকল্পনা ও সদিচ্ছা না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়াতে কোন কাজই হয় না। আর শয়তান তো সব ভাল কাজ পিছাতে থাকে যে, কাল করব, পরশু করব। কোন ওজর সামনে আসলে 'ঠিক আছে কাল থেকে শুরু করব' বলে তা করে না। আগামী কাল আর আসে না। যে কাজ করার তা এখনি করে নিন। পরে করতে চাইলে তা কখনো করা হয়ে ওঠে না।

কারো জীবিকা উপার্জনের ব্যবস্থা না থাকলে সে জীবিকার জন্য অস্থির হবে কি না? কেউ ঋণগ্রস্ত থাকলে সে তা পরিশোধের জন্য ব্যস্ত হবে কি না? কেউ অসুস্থ হলে চিকিৎসার জন্য চেষ্টা করবে কি না? তাহলে 'আমাদের কু-অভ্যাসগুলো দূর হচ্ছে না' এ ব্যাপারে কেন আমাদের অস্থিরতা সৃষ্টি হয় না? নিজের ভিতরে অস্থিরতা সৃষ্টি করে দু'রাকাত 'সালাতুল হাজত' নামায পড়ে আল্লাহর কাছে দুআ করুন, 'হে আল্লাহ! আমি এই খারাবী থেকে বাঁচতে চাই। দয়া করে আমাকে এ থেকে বাঁচার তাওফীক দিন এবং দৃঢ়তা দান করুন।'

হযরত থানবী রহ. বলেন, এরপরও কাজ না হলে নিজের উপর জরিমানা নির্ধারণ করুন। এভাবে অঙ্গীকার করুন, 'যখনই গীবত করব তখনই দু'রাকাত নফল নামায পড়ব'। অথবা 'এই পরিমাণ টাকা সাদকা করব'। তাহলে 'গীবত' থেকে মুক্তি মিলবে।

এ ব্যাধি থেকে মুক্তি পেতে হবে। এর জন্য এমনভাবে অস্থিরতা সৃষ্টি করতে হবে, যেমন অসুস্থ ব্যক্তি চিকিৎসার জন্য অস্থির হয়। কেননা এটাও একটা ব্যাধি। বরং আরো ভয়ঙ্কর ব্যাধি। শারীরিক রোগ থেকেও বেশি মারাত্মক। কারণ, এ ব্যাধি জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং নিজেও এ থেকে বাঁচুন, পরিবার-পরিজনকেও বাঁচান। বিশেষভাবে মহিলাদের মধ্যে এই মহামারীর প্রচলন অনেক বেশি। যেখানে চার মহিলা একত্র বসেছে, সেখানে কারো না কারো গীবত শুরু হয়ে যায়। মহিলারা এ থেকে বিরত থাকলে পুরা পরিবারের সংশোধন হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে গীবত থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন।

পরনিন্দা একটি মারাত্মক গুনাহ

আরেকটি গুনাহ রয়েছে যা গীবতের চেয়েও বেশি মারাত্মক। সেটা হল ‘পরনিন্দা’। এর সঠিক অর্থ হল– ‘কারো দোষ অন্যের সামনে এ উদ্দেশ্যে বলা, যেন শ্রোতা তাকে কষ্ট দেয়। আর সে এই ভেবে আনন্দিত হয় যে, সে কষ্ট পেল।’ পরনিন্দার মধ্যে এটা জরুরী নয় যে, উক্ত দোষ তার মধ্যে থাকতেই হবে। বরং উক্ত দোষ তার মধ্যে থাক বা না থাক, শুধু এই উদ্দেশ্যে তা বলা হয়, যেন অন্য ব্যক্তি শুনে তাকে কষ্ট দেয়। এটা পরনিন্দার আসল রূপ।

পরনিন্দা গীবত থেকেও মারাত্মক

পরনিন্দা গীবত থেকেও মারাত্মক। কারণ, এতে গীবত ও অপর মুসলমানকে কষ্ট দেয়ার দুই গুনাহই রয়েছে। তাই পরনিন্দা বড়ই মারাত্মক গুনাহ। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে এর অসংখ্য খারাবী বর্ণিত রয়েছে এবং এর জন্য কঠোর ধমকি দেয়া হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা কাফেরদের খারাবীর বিবরণ দিতে গিয়ে ইরশাদ করেন–

هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ

‘তারা ঐ ব্যক্তির মত চলে, যারা পিছনে নিন্দা করে ও চোগলখুরী করে বেড়ায়।’ (সূরা ৬৮ কলম, আয়াত-১১)

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন–

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ

‘পরনিন্দাকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না’। (মুসলিম শরীফ, হাদীস-১৫১)

কবরের আযাবের অন্যতম দু’টি কারণ

প্রসিদ্ধ একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, একদা রাসূলুল্লাহ সা. সাহাবীগণকে নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে দু’টি কবর দেখতে পেলেন। কবর দু’টির নিকটে পৌঁছে তিনি কবরের দিকে ইশারা করে সাহাবীগণকে বললেন–

إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير

‘কবর দুটিতে শাস্তি হচ্ছে। তবে বড় কোন গুনাহের কারণে নয়।’

(মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৫৩)

আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সা.কে কবরের আযাব সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছিলেন।

কবরের শাস্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, ‘যখন কবরে শাস্তি হয় তখন আল্লাহ তাআলা আপন অনুগ্রহ ও দয়ায় তার আওয়াজ আমাদের থেকে গোপন করেন। কারণ, ঐ শাস্তির আওয়াজ শুনলে কেউ জীবিত থাকতে পারবে না এবং জীবনে কোন কাজ করতে পারবে না।’ এ জন্য এটা আল্লাহর রহমত যে, তিনি তা আমাদের থেকে গোপন রেখেছেন। তবে আল্লাহ তাআলা কখনো কখনো কোন বান্দার নিকট তা প্রকাশও করে দেন। যা হোক হুজুর সা.-এর উপর প্রকাশ হল যে, উক্ত কবর দু’টিতে আযাব হচ্ছে।

অতপর সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞাস করলেন যে, তোমরা কি জান ঐ দুজনের উপর আযাব হচ্ছে কেন?

অতপর রাসূলুল্লাহ সা. নিজেই বললেন, এমন দু’টি কাজের দরুণ তাদের শাস্তি হচ্ছে, যা থেকে বাঁচা তাদের জন্য বেশি কষ্টকর ছিল না। যদি তারা ইচ্ছা করত তাহলে সহজেই বাঁচতে পারত। কিন্তু তারা বেঁচে থাকে নাই। এ কারণে তাদের উপর শাস্তি হচ্ছে।

এরপর রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন–

أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة

একজনকে এজন্য শাস্তি দেয়া হচ্ছে যে, সে পেশাবের ছিটা থেকে বেঁচে থাকত না, আর আরেকজন অন্যের নিন্দা করে বেড়াত।’

(মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৫৩)

অর্থাৎ পেশাবের সময় সাবধানতা অবলম্বন করত না। এমন স্থানে পেশাব করত যার ছিটা এসে শরীরে লাগত। বিশেষ করে সে যুগে উট-ছাগল চরানোর বেশি প্রচলন ছিল এবং সবসময় ঐ সমস্ত প্রাণীর সঙ্গে থাকতে হত। যার কারণে অনেক সময় তার ছিটা লেগে যেত। আর এ থেকে সাবধানতা অবলম্বন না করার কারণেই তাদের উপর শাস্তি হচ্ছে।

পেশাবের ছিটা থেকে বেঁচে থাকবে

আলহামদুলিল্লাহ! ‘ইসলামে পবিত্রতার আদব’ ও ‘কীভাবে পবিত্রতা অর্জন করা উচিত’ তা বিস্তারিত শিক্ষা দেয়া হয়েছে। কিন্তু বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতিক্রিয়া হল, বাহ্যিক পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার খুব গুরুত্ব দেয়া হয়। কিন্ত ‘শরয়ী পবিত্রতা’র প্রতি ভ্রুক্ষেপই করা হয় না। টয়লেটগুলো এমন যে, পেশাবের ছিটা থেকে বেঁচে থাকা অত্যন্ত মুশকিল ব্যাপার।

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন–

أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ

'কবরের অধিকাংশ শাস্তি পেশাবের কারণেই হয়।'

(ইবনে মাযাহ শরীফ, হাদীস-৩৪২)

পেশাবের ছিটা শরীরে ও কাপড়ে লাগলে কবরে শাস্তি হয়। তাই এ ব্যাপারে বেশি সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

পরনিন্দা থেকে বেঁচে থাকতে হবে

অপর ব্যক্তির আযাবের কারণ ছিল, সে অন্যের নিন্দা করত। যার কারণে তার কবরে শাস্তি হচ্ছে। এ কারণে রাসূলুল্লাহ সা. পরনিন্দাকে কবরে শাস্তির কারণ হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন। এ জন্য পরনিন্দা গীবত থেকেও মারাত্মক ও ভয়ঙ্কর। কেননা পরনিন্দা করা হয় খারাপ নিয়াতে, অপরকে কষ্ট দেয়ার নিয়াতে।

গোপন তথ্য প্রকাশ করা পরনিন্দার মত

ইমান গাযালী রহ. 'এহয়াউল উলুম' গ্রন্থে বলেন, অন্যের গোপন কোন তথ্য প্রকাশ করাও পরনিন্দার অন্তর্ভূক্ত। কেউ তার গোপন তথ্য অন্যের সামনে প্রকাশ হওয়া কামনা করে না। চাই তা ভাল হোক বা খারাপ হোক। যেমন, একজন সম্পদশালী ব্যক্তি। সে তার সম্পদকে অন্যের থেকে গোপন রাখতে চায়। তার নিকট অঢেল সম্পদ আছে এটা কেউ জানুক, সে তা চায় না।

তার এ সম্পদের খবর যে কোনভাবে আপনি জেনে সকলকে তা বলে দিচ্ছেন। তাহলে আপনি তার গোপন তথ্য প্রকাশ করলেন, যা সে প্রত্যাশা করেনি। এটাও পরনিন্দার অন্তর্ভূক্ত যা স্পষ্ট হারাম।

এমনিভাবে কেউ পারিবারিক কোন প্লান তৈরি করল। আর আপনি কোনভাবে তা জেনে অন্যের নিকট বলে দিলেন। এটাও পরনিন্দা। এমনিভাবে যে কোন মানুষের যে কোন গোপন তথ্য হোক, তার অনুমতি ছাড়া অন্যের কাছে বলা পরনিন্দার অন্তর্ভূক্ত।

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, 'মজলিসের মধ্যে যে সব কথা হয়, তা আমানত।' যেমন কেউ আপনাকে বিশ্বস্ত ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ভেবে মজলিসের মধ্যে একটি কথা বলল, যা আপনি অন্যের নিকট বললেন। এটা আমানতের খেয়ানত এবং পরনিন্দার শামিল।

যবানের দু'টি বড় গুনাহ

মোটকথা, যবানের দু'টি বড় গুনাহ সম্পর্কে আলোচনা করার ইচ্ছা ছিল। এ দু'টি গুনাহ বড় মারাত্মক ও ভয়ঙ্কর, যার বিস্তারিত বিবরণ হাদীসের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু এ গুনাহ যত বেশি মারাত্মক ও ভয়াবহ, আমরা তা থেকে তত বেশি বেপরোয়া ও উদাসীন। ঘরের পরিবেশ ও মজলিসগুলো এ গুনাহে ভরপুর। যবান কেচির মত চলছে। বন্ধ করার নাম নেই। আল্লাহর ওয়াস্তে যবানে লাগাম দিন, যবানকে নিয়ন্ত্রণ করুন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান অনুযায়ী পরিচালনার চেষ্টা করুন। তা না হলে –এর কারণে– শত শত পরিবার ধ্বংস হয়। পরস্পর শত্রুতা ও দুশমনি সৃষ্টি হয়। আল্লাহ ভাল জানেন, এটা কত অসংখ্য গুনাহ ও ফেতনার কারণ। আর আখেরাতে এর কারণে যে শাস্তি হওয়ার, তাতো আছেই। আল্লাহ তাআলা দয়া করে এর খারাবী ও অনিষ্টতা বোঝার তাওফীক দান করুন এবং এই ভয়ঙ্কর গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন ॥

মৃত্যু আসছে : আপনি কি প্রস্তুত

শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
অনুবাদ : আলী হাসান তৈয়ব

প্রথম প্রকাশ : মার্চ– ২০০৭ ঈ.

সূচী

মৃত্যু সুনিশ্চিত বিষয়-২০৭
মৃত্যুর পূর্বেই মরার ব্যাখ্যা-২০৮
দু'টি বড় নেয়ামত ও আমাদের উদাসীনতা-২০৯
হযরত বাহলুল রহ.-এর শিক্ষামূলক ঘটনা-২০৯
প্রকৃত জ্ঞানী কে-২১১
আমরা সবাই বোকা-২১২
মৃত্যু এবং আখেরাতের ধ্যান করার পদ্ধতি-২১২
হযরত আবদুর রহমান বিন আবি নুয়াম রহ.-২১৩
প্রেমময় প্রভুর সাথে মিলনের বাসনা-২১৪
আজই নিজের হিসাব কষে নাও-২১৪
প্রভাতে মনের সাথে অঙ্গীকার-২১৫
অঙ্গীকারের পর দুআ-২১৫
পুরো দিন নিজের আমলের মোরাকাবা-২১৫
শোয়ার আগে মোহাসাবা-২১৬
অতঃপর শুকরিয়া আদায় কর-২১৬
অন্যথায় তাওবা কর-২১৬
নফসকে শাস্তি প্রদান কর-২১৭
শাস্তি হওয়া চাই পরিমিত ও ভারসাম্যপূর্ণ-২১৭
একটু সাহস করতে হবে-২১৮
করতে হবে শুধু চারটি কাজ-২১৮
ধারাবাহিকভাবে এ আমল করে যেতে হবে-২১৮
হযরত আমিরে মুয়াবিয়া রাযি.-এর একটি ঘটনা-২১৯
অনুশোচনা ও তাওবা দ্বারা মর্যাদা বৃদ্ধি পায়-২১৯
গুনাহ আমার কি ক্ষতি করবে-২২০
আজীবন লড়াই চলবে-২২১
অগ্রসর হও, আল্লাহ স্বাগতম জানাবেন-২২১
আল্লাহর সামনে কি জবাব দেবে-২২২
আল্লাহর কাছে সাহস ও প্রত্যয় প্রার্থনা কর-২২৩
আল্লাহর দানের ভাণ্ডারে কোন অভাব নেই-২২৩

অনুবাদকের কথা

আজ আমাদের প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয়িত হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ লংঘণের মধ্য দিয়ে। আমাদের দ্বারা এমন সব অনাচার ও পাপাচার সংঘটিত হচ্ছে, যা দেখে শয়তানও লজ্জা পায়। এমনকি ঈমানের দৌলত থেকে বঞ্চিত অমুসলিমরাও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। আমাদের উপর্যপুরী পরাজয় ও শত্রুদের জয়ের কারণ এটিই।

আল্লাহর বাতলানো পথ ছেড়ে প্রবৃত্তি ও শয়তানের অনুসারী হওয়ার ফলেই বিশ্বজুড়ে মুসলমানদের এ দূরাবস্থা, তা কম-বেশি সবাই বুঝতে শুরু করেছে। কিন্তু পতনের কারণ জানলেও উত্তোরণের উপায় না জানার ফলে আল্লাহর অপ্রিয় ও নিষিদ্ধ পথ থেকে ফিরে আসতে না পারায় বেরিয়ে আসতে পারছে না পরাজয়ের বৃত্ত থেকে।

সমকালীন বিশ্বের বহুমূখী প্রতিভার অধিকারী বরেণ্য আলেম শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী 'মরনে ছে পহেলে মউত কি তইয়ারী কিজিয়ে' বয়ানে অতি সহজভাবে আমাদের পতনের কারণ এবং পাপ থেকে বাঁচার পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। এটাই সেই অব্যর্থ প্রতিষেধক যা মানুষকে পাপের অভিশপ্ত রোগ থেকে মুক্তি দিতে পারে এবং 'মৃত্যু আসছে' এ কথা স্মরণ করে দিতে পারে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণের মাধ্যমে সকল প্রকার গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন।

আলী হাসান তৈয়ব
মালতিনগর, বগুড়া
০৩.০৩.০৭ ঈ.

'মৃত্যু আসবে' এতে কোন সন্দেহ নেই। নেই কোন দ্বিধা বা শংসয়। এ ব্যাপারে কেউ দ্বিমত পোষণ করেনি। আল্লাহকে অস্বীকার করেছে, রাসূলকে অস্বীকার করেছে, কিন্তু মৃত্যুকে কেউ অস্বীকার করতে পারেনি। এ কথা সবাই মানে, 'পৃথিবীতে আসলে একদিন তাকে মৃত্যুবরণ করতেই হবে'। আবার এ ব্যাপারেও সবাই একমত যে, 'মৃত্যুর কোন সুনির্দিষ্ট সময় নেই'।

বিজ্ঞানের গবেষণা উৎকর্ষের চরম সীমায় পৌঁছলেও 'কে কখন কোথায় মরবে' এ তথ্য দিতে পারছে না।

বাস্তব কথা হল, পৃথিবীতে আমাদের মাধ্যমে যত অনাচার, পাপাচার সংঘটিত হয়, গুনাহ নাফরমানি প্রকাশ পায় এর বড় কারণ হল, 'মৃত্যুকে ভুলে যাওয়া'।



মৃত্যু আসছে : আপনি কি প্রস্তুত

মৃত্যু সুনিশ্চিত বিষয়

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللهِ قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا وَبَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ قَبْلَ أَنْ تُشْغَلُوا

'হে লোকসকল! মৃত্যুর আগেই আল্লাহর কাছে তাওবা কর এবং সময় থাকতেই নেক আমল কর।' (ইবনে মাযাহ শরীফ, হাদীস-১০৭১)

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন–

حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا

'কেয়ামত দিবসে হিসাব নেয়ার পূর্বেই নিজের হিসাব নাও।'

(তিরমিযী শরীফ, হাদীস-২৩৮৩)

অন্য একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন–

وَعُدَّ نَفْسَكَ فِي أَهْلِ الْقُبُورِ

'তুমি নিজেকে কবরবাসীদের অন্তর্ভূক্ত মনে কর।'

(তিরমিযী শরীফ, হাদীস-২২৫৫)

শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ. উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন–

فَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى مَا قِيلَ مُوتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا وَحَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا

'এতে ইঙ্গিত রয়েছে সেই কথার দিকে, যা বলা হয় যে, মৃত্যুর পূর্বেই মৃত্যু বরণ কর এবং হিসাব গ্রহণের পূর্বেই নিজের হিসাব নাও।'

(তোহফাতুল আহওয়াযী, হাদীস-২২৫৫)

'মৃত্যু আসবে' এতে কোন সন্দেহ নেই। নেই কোন দ্বিধা বা শংসয়। এ ব্যাপারে কেউ দ্বিমত পোষণ করেনি। আল্লাহকে অস্বীকার করেছে, রাসূলকে

অস্বীকার করেছে, কিন্তু মৃত্যুকে কেউ অস্বীকার করতে পারেনি। এ কথা সবাই মানে, 'পৃথিবীতে আসলে একদিন তাকে মৃত্যুবরণ করতেই হবে'। আবার এ ব্যাপারেও সবাই একমত যে, 'মৃত্যুর কোন সুনির্দিষ্ট সময় নেই'। হতে পারে মৃত্যু এখনই এসে পড়বে কিংবা এক মিনিট, এক ঘণ্টা, একদিন, এক সপ্তাহ অথবা এক বছর পর আসবে। কোন নিশ্চয়তা নেই। বিজ্ঞানের গবেষণা উৎকর্ষের চরম সীমায় পৌঁছলেও 'কে কখন কোথায় মরবে' এ তথ্য দিতে পারছে না।

মৃত্যুর পূর্বেই মরার ব্যাখ্যা

মৃত্যুর আগমন যেহেতু সন্দেহাতীত, এর দিন-ক্ষণ জানাও সাধ্যাতীত, তাই অপ্রস্তুত অবস্থায় যদি কেউ মারা যায়, আল্লাহ জানেন ওপারে সে কোন অবস্থার সম্মুখীন হবে। এমন যেন না হয়, ওপারে পৌঁছে আল্লাহর আযাব-গযবের মুখে পড়তে হয়। অসন্তোষ-অশান্তির মুখোমুখি হতে হয়। তাই রাসূল সা. ইরশাদ করছেন, এই রুঢ় বাস্তব 'মৃত্যু' আসার পূর্বেই মর।

কীভাবে মরবে? মরার আগে মরার ব্যাখ্যা কী? ওলামায়ে কেরাম এর দু'ধরনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

এক. প্রকৃত মৃত্যু আগমনের পূর্বে আল্লাহর নির্দেশের সাথে সাংঘর্ষিক ও এর পরিপন্থি মনের সকল কামনা-বাসনা এবং নাফরমানি, পাপ ও অবৈধ কাজ করার যে চাহিদা সৃষ্টি হয়, সব কিছুকে পদদলিত ও মথিত করে দাও। ধ্বংস ও বিনাশ করে দাও।

দুই. মরার পূর্বে মরার চিন্তা ও ধ্যান কর। চিন্তা কর, একদিন আমাকে এ জগত ছেড়ে যেতে হবে খালি ও রিক্ত হাতে। টাকা-পয়সা সাথে যাবে না। সন্তানাদি, কুঠি-বাংলো, বন্ধু-বান্ধব কেউ সাথে যাবে না, বরং যেতে হবে একাকী, শূণ্য হাতে। এসব একটু ভেবে দেখ।

বাস্তব কথা হল, পৃথিবীতে আমাদের মাধ্যমে যত অনাচার, পাপাচার সংঘটিত হয়, গুনাহ নাফরমানি প্রকাশ পায় এর বড় কারণ হল, 'মৃত্যুকে ভুলে যাওয়া'। যতদিন শরীরে শক্তি আছে, স্বাস্থ্য ভাল আছে, হাত-পা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সচল আছে, ততদিন মানুষ নিজেকে সর্বেসর্বাভাবে। আকাশ কুসুম কল্পনা ফাঁদে। অহঙ্কার ও আত্মগৌরব করে। অন্যের উপর জুলুম করে, অধিকার হরণ করে। মানুষ এসব যৌবনকালে অবলিলায় করতে থাকে। 'তাকে একদিন মরতে হবে' এ কথা তার কল্পনাতেই আসে না। আপনজনের জানাযা বহন করে, নিজ হাতে প্রিয়জনকে কবরস্থ করে, তবুও ভাবনার পরিবর্তন হয় না।

মনে করে যে, সেই তো মরেছে, আমি মরিনি। এভাবে উদাসীনতা ও অন্যমনস্কতার ভেতর দিয়ে জীবন কাটিয়ে দেয়, ফলে মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণের সুযোগ পায় না।

দু'টি বড় নেয়ামত ও আমাদের উদাসীনতা

একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন–

نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

'আল্লাহর দেয়া দু'টি নেয়ামতের ব্যাপারে অধিকাংশ লোকই প্রবঞ্চনায় লিপ্ত। এক. সুস্থতার নেয়ামত। দুই. অবসরের নেয়ামত।'

(বুখারী শরীফ, হাদীস-৫৯৩৩)

মনে হয় 'সুস্থতার নেয়ামত চিরকালই অক্ষুন্ন থাকবে'। সুস্থকালে পূণ্য ও নেকীর কাজগুলো করে না। কাল করব, পরশু করব- এভাবে পেছায়। এক সময় নেয়ামত ফুরিয়ে যায়। অনুরুপভাবে 'অবসর বা সুযোগ' নেয়ামতেরও মূল্যায়ন করা হয় না। এখন কাজটি করার সময় ও সুযোগ আছে; কিন্তু মানুষ ভাল কাজকে এ ভেবে করে না যে, এখনো সময় আছে; পরে করে নেব। যৌবন এখনো অটুট আছে, তারুণ্যের ইস্পাত শক্তি বলে পাহাড়-পর্বত বয়ে নিয়ে যেতে পারে। অনেক শ্রম ও কষ্টসাধ্য কাজ করতে পারে। চাইলে এই যৌবনে অনেক ইবাদত করতে পারে। রিয়াযাত-মুজাহাদা, ত্যাগ-সাধনা করতে পারে। সৃষ্টির সেবা করতে পারে। আল্লাহকে খুশি করার জন্য আমলমানায় নেকীর স্তুপ গড়তে পারে। কিন্তু মস্তিষ্কে এ কথা বসে গেছে যে, আমি এখনো যুবক আছি, এখন একটু যৌবনের স্বাদ গ্রহণ করি। ইবাদত-বন্দেগী ও নেক কাজ করার জন্য সারা জীবন পড়ে আছে। এগুলো পরে করব। এভাবে সে নেক কাজ টলাতে থাকে। যৌবন কখন শেষ হয়ে যায় তা টেরই পায় না। দুর্বল হয়ে পরে। ফলে ইবাদত ও নেক কাজ করার প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আর করতে পারে না। কারণ এখন তার দেহে শক্তি নেই। স্বাস্থ্য ভাল নেই। অবসরের সংকট ও কাজের ব্যস্ততা এত বেশি যে, এসবের জন্য সময়ই বের করতে পারে না। এর একমাত্র কারণ হল, মানুষ মৃত্যু থেকে উদাসীন। মৃত্যুর ধ্যান করে না।

হযরত বাহলুল রহ.-এর শিক্ষামূলক ঘটনা

বাদশা হারুনুর রশীদের আমলে 'বাহলুল' নামক বড় এক বুযুর্গ ছিলেন। খোদার প্রেমে পাগল এ বুযুর্গের সাথে বাদশা হাস্য-কৌতুক করতেন। পাগল

হলেও জ্ঞানী সুলভ কথা বলতেন। বাদশাহ তার প্রহরীকে বলে রেখেছিলেন, এ ব্যক্তিটি আমার সাক্ষাতে যখনই আসতে চায়, তখনই তাকে আসতে দিও। সুতরাং যখন খুশি তিনি রাজ দরবারে হাজির হতেন।

একদিন তিনি দরবারে প্রবেশ করে বাদশা হারুনুর রশীদের হাতে একটি ছড়ি দেখতে পেলেন। হারুনুর রশীদ কৌতুক করে বললেন, 'বাহলুল সাহেব তোমার কাছে একটা অনুরোধ রাখব'। বাহলুল বললেন, কী অনুরোধ? হারুনুর রশীদ তাকে ছড়িটি দিয়ে বললেন, 'এটা তোমাকে আমানত স্বরূপ দিচ্ছি'। পৃথিবীর বুকে তোমার চেয়ে বড় কোন বেকুব যদি খুঁজে পাও তাকে আমার পক্ষ থেকে এটি উপহার দেবে।' 'আচ্ছা ঠিক আছে' বলে ছড়িটি বাহলুল নিজের কাছে রেখে দিল।

বাদশাহ ঠাট্টা করে বাহলুলকে এটাই বুঝাতে চাচ্ছিলেন যে, তোমার চেয়ে বড় নির্বোধ পৃথিবীতে আর কেউ নেই। যা হোক তখনকার মত বাহলুল ছড়ি নিয়ে দরবার থেকে চলে গেল।

কয়েক বছর পরের ঘটনা। একদিন বাহলুল জানতে পারল, হারুনুর রশিদ খুব অসুস্থ, শয্যাশায়ী। তাঁর চিকিৎসা চলছে, কিন্তু কোন ফল দিচ্ছে না। বাহলুল বাদশার শুশ্রূষার জন্য তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আমীরুল মুমিনীন কেমন আছেন?' বাদশাহ বললেন, 'অবস্থা আর কি, সামনে সুদূর সফর উপস্থিত'।

– বাহলুল জিজ্ঞেস করল, 'কোথাকার সফর?'

– আখেরাতের সফর! এখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছি।

– কতদিন পর ফিরে আসবেন?

– আরে ভাই! এটাতো আখেরাতের সফর। এ সফরে গেলে কেউ আর ফিরে আসে না।

– আচ্ছা আপনি তো এ সফর থেকে আর ফিরবেন না, তাই সফরে আরাম ও সুবিধার জন্য কি ব্যবস্থা করেছেন?

– তুমি দেখি আবার নির্বোধের মত কথাবার্তা শুরু করেছ। আখেরাতের সফরে কেউ সঙ্গে যেতে পারে নাকি? এ সফরে বডিগার্ড, সৈন্য-সামন্ত কেউ সাথে যেতে পারে না। সঙ্গিহীন একাকী যেতে হয়। এ এক মহা সফর।

– এত দীর্ঘ সফর! সেখান থেকে আর ফিরবেন না, তবুও সৈন্য-সামন্ত কিছু পাঠালেন না? অথচ ইতি পূর্বে সব সফরেই এর যাবতীয় ব্যবস্থাপনার জন্য আগে থেকেই আসবাব-পত্র ও সৈন্য- সামন্ত প্রেরণ করতেন। এ সফরে কেন পাঠালেন না?

– এটা এমন সফর যে, এতে সৈন্য পাঠান যায় না।

– জাঁহাপনা! বহুদিন হল আপনার একটি আমানত আমার কাছে রয়ে গেছে। সেটি একটি ছড়ি। আমার চেয়ে বড় কোন নির্বোধ পেলে এটা তাকে উপহার দিতে বলেছিলেন। আমি অনেক খুঁজেছি, কিন্তু আপনার চেয়ে বড় নির্বোধ আর কাউকে পেলাম না। কারণ, আমি দেখেছি আপনি কোন সংক্ষিপ্ত সফরে গেলেও মাস খানেক পূর্ব থেকেই তার প্রস্তুতি চলত। পানাহারের আসবাব, তাবু, সৈন্য, বডিগার্ড ইত্যাদি আগে থেকেই পাঠান হত। আর এখন এত দীর্ঘ সফর যেখান থেকে ফেরার সম্ভাবনাও নেই, অথচ এর জন্য কোন প্রস্তুতি নেই। আপনার চেয়ে বড় বোকা জগতে আর কে আছে? অতএব আপনার আমানত আপনাকেই ফেরত দিচ্ছি।

এসব শুনে বাদশাহ কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন এবং বিলাপ করে বলতে লাগলেন, বাহলুল! তুমি সঠিক বলেছ। আমরা আজীবন তোমাকে বোকা ভেবেছি, কিন্তু বাস্তবতা হল তুমিই প্রকৃত বুদ্ধিমান। তুমি প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা বলেছ। বাস্তবেই আমি সারা জীবন বৃথা কাটিয়েছি। আখেরাতের কোন প্রস্তুতিই আমি নেইনি।

প্রকৃত জ্ঞানী কে

বাহলুল যা বলেছে, তা একটি হাদীসের মর্মকথা। হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন–

الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ

‘প্রকৃত জ্ঞানি সেই ব্যক্তি, যে নিজের নফসকে কন্ট্রোল করেছে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য নেক কাজ করেছে।’ (তিরমিযী শরীফ, হাদীস-২৩৮৩)

উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা. ‘প্রকৃত জ্ঞানী’র পরিচয় দিয়েছেন। অথচ যে ব্যক্তি পৃথিবীতে বেশি অর্থ উপার্জন করতে পারে, টাকা থেকে টাকা কামাই করতে পারে, দুনিয়াকে বোকা বানিয়ে দিতে পটু, তাকেই বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী মনে করা হয়। কিন্তু হুযুর সা. উক্ত হাদীসে বলেছেন, প্রকৃত জ্ঞানী সেই ব্যক্তি, যে নিজের নফস তথা মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং প্রবৃত্তির সকল চাহিদার পেছনে না চলে নফসকে আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুগামী বানায়, মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এর ব্যতিক্রম হলে সে নির্বোধ-বোকা। কারণ সে সারাাঁ জীবন অর্থহীন কাজে ব্যয় করল কিন্তু চিরকাল যেখানে থাকতে হবে তার জন্য কোন পাথেয় সংগ্রহ করল না।

আমরা সবাই বোকা

হারুনুর রশীদকে বাহলুল যা বলেছে, গভীরভাবে চিন্তা করলে আমাদের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য বলে মনে হবে। পৃথিবীতে বসবাসের জন্য সবাই চিন্তা করে, সে কোথায় বাড়ী বানাবে? কেমন গৃহ নির্মাণ করবে? সুখ ও বিলাসিতার কী কী উপকরণ সংগ্রহ করবে? কোথাও ভ্রমণে গেলে ‘সিট পায় কি না’ এই ভয়ে আগেই টিকিট বুকিং করে, প্রস্তুতি শুরু করে। যেখানে যাচ্ছে সেখানে সংবাদ পাঠায়। হোটেলে বুকিং করায়। মাত্র তিন দিনের সফরেও এসব প্রস্তুতি নেয়া হয়।

অথচ যেখানে অনন্তকাল থাকতে হবে, যে জীবনের শুরু আছে শেষ নেই, তার কোন চিন্তাই করে না যে, সেখানে কেমন ঘর নির্মাণ করবে? সেখানকার জন্য কীভাবে বুকিং করবে?

হুজুর সা. ইরশাদ করেছেন, জ্ঞানী ব্যক্তি সেই, যে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নেয়। অন্যথায় সে বেকুব। চাই সে যতবড় বিত্তশালী বা পুঁজিপতিই হোক না কেন। আর আখেরাতের প্রস্তুতির পথ এটিই যে, ‘মৃত্যুর আগেই মৃত্যুর ধ্যান করবে’। এ কথা চিন্তা করবে যে, ‘একদিন আমাকে মরতে হবে’।

মৃত্যু এবং আখেরাতের ধ্যান করার পদ্ধতি

হাকীমুল উম্মাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. বলতেন, সারাদিনের মধ্যে একটি নির্জন-নিভৃত সময় বের করে এভাবে কল্পনা কর, ‘আমার অন্তিম মুহূর্ত এসে গেছে, জান কবজ করার জন্য ফেরেশতা উপস্থিত হয়েছে, আমার জান বের করেছে, আত্মীয়-স্বজন গোসল ও কাফন-দাফনের ব্যবস্থায় লেগে গেছে, কাফন পরিয়ে নিয়ে গেছে, জানাযার নামায পড়ে কবরে রেখেছে, অতঃপর কবর বন্ধ করে দিয়েছে, উপর থেকে মাটি দিয়ে সেখান থেকে চলে গেছে, অন্ধকার কবরে এখন আমি একা, শুধুই একা। অতঃপর ফেরেশতাগণ এসে প্রশ্নোত্তর শুরু করেছে।’

এরপর আখেরাত কল্পনা কর যে, ‘আমাকে কবর থেকে পূনরায় উঠানো হয়েছে, হাশরের মাঠ কায়েম হয়েছে, সব মানুষ সেখানে উপস্থিত হয়েছে, সেখানে প্রচণ্ড গরম লাগছে, দরদর করে ঘাম বয়ে পড়ছে, সূর্য একেবারে নিকটে এসেছে, সবাই দুশ্চিন্তা ও টেনশনে ভূগছে, তখন তারা নবীগণের কাছে গিয়ে হিসাব-নিকাশ শুরু করার জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করার আবেদন করছে।’

এভাবে হিসাব-কিতাব, পুলছিরাত, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদির কল্পনা কর। প্রত্যহ ফজরের পর কুরআন তেলাওয়াত, মুনাজাতে মকবুল এবং যিকির-আযকার শেষ করে কিছুক্ষণ চিন্তা কর, এ সময় অবশ্যই আসবে। জানা নেই কখন আসবে। হতে পারে এখনই আসবে, আজই আসবে। এসব কল্পনা করে দুআ কর- 'হে আল্লাহ! আমি দুনিয়াবী কাজ-কর্মের জন্য বের হচ্ছি। আমার দ্বারা যেন এমন কোন কাজ সংঘটিত না হয়, যা আমার আখেরাতকে বরবাদ ও ধ্বংস করে দেয়।'

প্রতিদিন এভাবে ধ্যান করতে থাক। একবার যদি মৃত্যুর চিন্তা অন্তরে বসে যায়, তাহলে আত্মশুদ্ধির দিকে মনোযোগ যাবে এবং আখেরাতের চিন্তা মাথায় আসবে ইনশাআল্লাহ।

হযরত আবদুর রহমান বিন আবি নুয়াম রহ.

আবদুর রহমান বিন আবি নুয়াম রহ. একজন বড় বুযুর্গ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর জীবনকালে এক ব্যক্তি মনে মনে ভাবল যে, আমি বিভিন্ন আলেম, মুহাদ্দিস, ফকীহ ও বুযুর্গের কাছে প্রশ্ন করব যে, যদি জানতে পারেন 'আগামীকাল আপনার মৃত্যু হবে'। জীবনের শুধুমাত্র একদিন বাকি আছে। তবে আপনারা কীভাবে সে দিনটি কাটাবেন?

প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তাঁরা যেসব ভাল ভাল কাজের কথা বলবেন, তা সে নিজেও করবে। অতঃপর তাঁদেরকে প্রশ্ন করে বিভিন্ন আমলের কথা জানতে পারলেন।

এক পর্যায়ে যখন হযরত আবদুর রহমান বিন আবি নুয়াম রহ.-এর কাছে গিয়ে এ প্রশ্ন করলে তিনি উত্তরে বললেন, প্রতিদিন যে কাজ করি সেদিনও তাই করব। কারণ, আমি প্রথম দিন থেকেই নিজের কর্মসূচী ও কাজের রুটিন এ ধারণাকে সামনে রেখে বানিয়ে নিয়েছি যে, 'হতে পারে এটাই আমার জীবনের শেষ দিন'। 'হতে পারে আজই আমার মরণ এসে পড়বে'। এই সূচীতে পরিবর্তন বা সংযোজন করার মত কোন সুযোগ নেই। প্রতিদিন যা করি, জীবনের শেষ দিনও তাই করব।

এটাই হল 'মূ-তূ কবলা আন তা মূ-তূ' বা 'মরার আগেই মর' হাদীসের বাস্তব নমুনা। এসব মহামণীষী মৃত্যুর চিন্তা ও আখেরাতের খেয়াল দ্বারা নিজের জীবন এমনভাবে ঢেলে সাজিয়েছিলেন যে, সর্বক্ষণ মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতেন। মৃত্যু যখনই আসতে চায় আসুক।

প্রেমময় প্রভুর সাথে মিলনের বাসনা

এ ব্যাপারে হাদীস শরীফে উল্লেখ হয়েছে, 'যে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতে পছন্দ করে, আল্লাহর মিলন প্রত্যাশী হয়, আল্লাহ তাআলাও তার সাক্ষাতে আগ্রহী হন।' (বুখারী শরীফ)

এমন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি সদা-সর্বদাই মৃত্যুর প্রতিক্ষায় থাকেন। তাদের অবস্থাই যেন এ কথা বলছে–

কবির ভাষায়,

কালকে আমার মিলন হবে বন্ধুসনে,
দেখব আমি নবী ও তাঁর সঙ্গীগণে।

অর্থাৎ আগামীকাল আপন প্রিয়জন তথা মুহাম্মাদ সা. ও তাঁর সাহাবীগণের সাথে সাক্ষাত হবে। এই মৃত্যু চিন্তার প্রভাবেই মানুষের জীবন সুন্নাত ও শরীয়তের রাজপথে উঠে আসে এবং তাকে সর্বক্ষণ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত রাখে।

যাহোক প্রতিদিন কিছু সময় বের করে মৃত্যুর কল্পনা কর, এ কথা ভাব, 'মৃত্যু আসছে, আমি কি প্রস্তুত হয়েছি?'

আজই নিজের হিসাব কষে নাও

আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, কেয়ামত দিবসে হিসাব গ্রহণের আগেই তুমি তোমার হিসাব নাও। আখেরাতে প্রতিটি কর্মের হিসাব নেয়া হবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ – وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

'যে ব্যক্তি অনু পরিমাণ ভাল কাজ করবে, সে আমলনামায় তা দেখতে পাবে। আর যে অনু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে সেও আমলনামায় তা দেখতে পাবে'। (সূরা ৯৯ যিলযাল, আয়াত-৭, ৮)

অর্থাৎ, তোমরা যে পূণ্যকর্ম সম্পাদন করেছ, তা সামনে আসবে। আর যে মন্দ কাজ করেছ, তাও সামনে উপস্থিত পাবে।

কবি খুব সুন্দর করে বলেছেন–

প্রতিদান দিবসেতে হবে যা
আজই হয়েছে বলে ভাব তা।

'কেয়ামতের দিন হিসাব নেয়ার আগেই নিজের হিসাব নেয়া শুরু কর'। প্রত্যহ রাতে মনকে জিজ্ঞেস কর, আজ সারাঁা দিন এমন কী কী কাজ করেছি, যে ব্যাপারে কেয়ামতের দিন প্রশ্ন করা হলে আমি উত্তর দিতে পারব না। এভাবে প্রতিদিন করতে থাক।

প্রভাতে মনের সাথে অঙ্গীকার

ঈমাম গাযালী রহ. আত্মশুদ্ধির এক বিরল-বিস্ময়কর পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। আমরা এ পদ্ধতি অনুসরণ করলে তা অব্যর্থ প্রতিষেধক হিসেবে কাজ দেবে। এ থেকে আর কোন ভাল পদ্ধতি পাওয়া মুশকিল।

সেটি হল প্রতিদিন কয়েকটি কাজ করবে। প্রথম কাজ হল, 'সকালে ঘুম থেকে জেগে নফসের কাছে এ মর্মে অঙ্গীকার নেবে যে, আজ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কোন গুনাহ করব না। আমার দায়িত্বে যত ফরয, ওয়াজিব এবং সুন্নাত আছে সব ঠিকমত আদায় করব। আমার ওপর আল্লাহর যত হক আছে, বান্দার হক আছে সব পুরোপুরি আদায় করব। হে নফস! মনে রেখ, ভুলক্রমে অঙ্গীকারের বিপরীত কোন কাজ করলে তোমাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে।' এই হল প্রথম কাজ এর নাম 'মুশারাতা' বা 'আত্ম অঙ্গীকার'।

অঙ্গীকারের পর দুআ

ডাক্তার আবদুল হাই সাহেব রহ. ইমাম গাযালী রহ.-এর কথার সাথে একটু সংযোগ করে বলতেন, এই 'আত্ম অঙ্গীকারের' পর আল্লাহর কাছে দুআ কর, 'হে আল্লাহ! আজ আমি গুনাহ করব না বলে অঙ্গীকার করেছি। আমি সব ফরয, ওয়াজিব আদায় করব। শরীয়ত অনুযায়ী চলব। হুকুকুল্লাহ এবং হুকুকুল ইবাদ সঠিকভাবে আদায় করব। কিন্তু হে খোদা! আপনার তাওফীক ছাড়া এই প্রতিজ্ঞার উপর অটল থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যেহেতু আমি পণ করেছি, তাই আপনি আমাকে তাওফীক দিন। আমাকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা থেকে রক্ষা করুন। পুরোপুরিভাবে এ প্রতিজ্ঞার উপর অটল থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন।

পুরো দিন নিজের আমলের মোরাকাবা

এ দুআ করে জীবিকার জন্য বেরিয়ে যাও। চাকুরী করলে চাকুরীতে, ব্যবসা করলে ব্যবসায়, দোকান করলে দোকানে চলে যাও। সেখানে গিয়ে এই কাজ কর যে, প্রতিটি কাজ শুরু করার আগে একটু ভেবে দেখ, এই কাজটি প্রতিজ্ঞার খেলাফ কি-না। এই শব্দ যা উচ্চারণ করছি তা প্রতিজ্ঞা পরিপন্থী কি না। যদি প্রতিজ্ঞা পরিপন্থী মনে হয়, তাহলে তা থেকে বাঁচার চেষ্টা কর। এটাকে 'মোরাকাবা' বলা হয়। এটাই হল দ্বিতীয় কাজ।

শোয়ার আগে মোহাসাবা

তৃতীয় কাজটি করতে হবে শোয়ার আগে, আর তা হল 'মোহাসাবা'। অর্থাৎ নফসকে বলবে, তুমি সারাদিন গুনাহ করবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলে। প্রতিটি কাজ শরীয়ত মত করবে। হুকুকুল্লাহ তথা আল্লাহর হক ও হুকুকুল ইবাদ তথা বান্দার হক ঠিক মত আদায় করবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলে। এখন বল কোন কাজ তুমি প্রতিজ্ঞামত করেছ, আর কোন কাজ প্রতিজ্ঞামত করনি? এভাবে সারাদিনের সকল কাজের হিসাব গ্রহণ করবে। সকালে যখন বাড়ী ত্যাগ করলে তখন অমুক লোককে কি বলেছ? চাকুরী ক্ষেত্রে গিয়ে নিজ দায়িত্ব কতটুকু পালন করেছ? ব্যবসা কীভাবে পরিচালনা করেছ? হালালভাবে না হারাম পদ্ধতিতে? যত লোকের সাথে সাক্ষাত হয়েছে তাদের হক কীভাবে আদায় করেছ? বিবি, বাচ্চার হক কীভাবে আদায় করেছ? এভাবে যাবতীয় কাজের হিসাব নেয়াকে 'মোহাসাবা' বলা হয়।

অতঃপর শুকরিয়া আদায় কর

এই 'মোহাসাবা'র ফলাফল যদি এই হয় যে, 'সকালের প্রতিজ্ঞায় তুমি সফল' তাহলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় কর। বল, হে আল্লাহ! তোমার অশেষ শুকরিয়া যে, তুমি আমাকে প্রতিজ্ঞার উপর অটল থাকার তাওফীক দিয়েছ। (আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু ওয়া লাকাশ শুকুর) শুকরিয়া আদায় করলে আল্লাহ তাআলা তা বৃদ্ধি করে দেন। তাই আগামী দিনেও প্রতিজ্ঞায় অটল থাকার তাওফীক দেবেন।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

'যদি তোমরা নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় কর আমি তোমাদের নেয়ামত বৃদ্ধি করে দেব।' (সূরা ১৪ ইবরাহীম, আয়াত-৭)

সুতরাং এই প্রতিজ্ঞায় অবিচল থাকার নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করলে ভবিষ্যতে নেয়ামত বৃদ্ধি করা হবে এবং অতিরিক্ত নেকীও অর্জন হবে।

অন্যথায় তাওবা কর

'মোহাসাবা'র ফলাফল যদি এই দাঁড়ায় যে, অমুক স্থানে প্রতিজ্ঞার পরিপন্থী কাজ করেছ, অমুক সময় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছ, পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছ এবং স্বীয় কৃত প্রতিজ্ঞার উপর অটল থাকতে পারনি, তাহলে তৎক্ষণাৎ তাওবা কর,

বল, 'হে আল্লাহ! আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায়, প্রবৃত্তির তাড়নায় প্রতিজ্ঞার উপর অটল থাকতে পারিনি। হে মাবুদ! আমি তোমার কাছে তাওবা করছি এবং ক্ষমা চাচ্ছি। তুমি আমার তাওবা কবুল করে আমার পাপ মাফ করে দাও। ভবিষ্যতে আমাকে প্রতিজ্ঞার উপর অটল থাকার তাওফীক দান কর।

নফসকে শাস্তি প্রদান কর

তাওবার সাথে সাথে নফসকে একটু শাস্তিও দাও। নফসকে বল, তুমি প্রতিজ্ঞার খেলাফ কাজ করেছ, সুতরাং শাস্তি স্বরূপ তোমাকে আঁ রাকাত নফল নামায পড়তে হবে। এ শাস্তিটা প্রভাতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার সময়ই নির্ধারণ কর। সুতরাং রাতে নফসকে বলবে, তুমি নিজের সুখ-শান্তির জন্য, সামান্য আনন্দ উপভোগের জন্য আমাকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গে লিপ্ত করেছ। অতএব এখন তোমাকে সাজা ভোগ করতে হবে। তোমার শাস্তি হল, এখন শোয়ার আগে আঁ রাকাত নফল নামায আদায় কর। তারপর বিছানায় যাও। এর আগে বিছানায় যাওয়া নিষেধ।

শাস্তি হওয়া চাই পরিমিত ও ভারসাম্যপূর্ণ

হযরত থানবী রহ. বলতেন, এমন শাস্তি নির্ধারণ কর, যা ভারসাম্যপূর্ণ, সঙ্গতিপূর্ণ ও পরিমিত। এত বড় ধরনের শাস্তি দিও না যে, নফস বিগড়ে যায়। আবার এত ছোট ও হালকা শাস্তি দিও না, যাতে নফসের কোন কষ্টই না হয়।

হিন্দুস্তানে স্যার সৈয়দ আহমদ আলীগড় কলেজ প্রতিষ্ঠাকালে নিয়ম করলেন, প্রত্যেক ছাত্রকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে আদায় করতে হবে। যারা নামাযে অনুপস্থিত থাকবে তাদের জরিমানা দিতে হবে। এক ওয়াক্ত নামাযের জরিমানা সম্ভবত এক আনা নির্ধারণ করা হয়েছিল। ফল দাঁড়ালো উল্টা। যেসব ছাত্রের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল, তারা এক মাসের সব নামাযের জরিমানা অগ্রিম জমা দিয়ে বলত, এই হল এক মাসের সমুদয় নামাযের জরিমানা। সুতরাং একমাস নামায ছুটি।

হযরত থানবী রহ. বলতেন, এত অল্প ও মামুলি অর্থদণ্ড হওয়া সমীচীন নয়, যা একেবারেই জমা দিতে পারে। আবার এত বেশি হওয়াও ঠিক নয় যে, মানুষ তা থেকে পলায়ন করে। বরং মধ্যম ধরনের ও ভারসাম্যপূর্ণ শাস্তি নির্ধারণ করা উচিত। উদাহরণ স্বরূপ যেমন আঁ রাকাত নফল নামায শাস্তি নির্ধারণ করা একটি ভারসাম্যপূর্ণ সাজা।

একটু সাহস করতে হবে

মোটকথা, আত্মশুদ্ধি করতে হলে হাত-পা নাড়াতে হবে, একটু একটু হিম্মত করতে হবে, কমবেশি কষ্ট সহ্য করতে হবে এবং এর জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও দূরন্ত ইচ্ছা করতে হবে। শুধু ঘরে বসে বসে নফসের তাযকিয়া ও পরিশুদ্ধি হতে পারে না। তাই শাস্তি নির্ধারণ করে নাও যে, নফস ভুল পথে গেলে আঁ রাকাত নফল নামায তাকে অবশ্যই পড়তে হবে। নফস যখন বুঝতে পারবে যে, আঁ রাকাত নফল পড়ার নতুন আপদ খাড়া হয়েছে, তখন সে ভয়ে গুনাহ থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে। নিজের নফস এভাবে আস্তে আস্তে সঠিক পথে উঠে আসবে। ভবিষ্যতে আর তোমাকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করবে না ইনশাআল্লাহ।

করতে হবে শুধু চারটি কাজ

ইমাম গাযালী রহ.-এর উপদেশের সার সংক্ষেপ হল, 'মাত্র চারটি কাজ কর'। এক. সকালে মোশারাতা বা আত্ম অঙ্গীকার। দুই. সব কাজের সময় মোরাকাবা। তিন. রাতে শোয়ার পুর্বে মোহাসাবা। চার. নফস প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলে মোয়াকাবা বা শাস্তি প্রদান।

ধারাবাহিকভাবে এ আমল করে যেতে হবে

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, শুধু দু'চারদিন এ আমল করে এ কথা ভাবা উচিত নয় যে, ব্যাস আমি পূর্ণতায় পৌঁছে গেছি, আমি বুযুর্গ হয়ে গেছি। বরং ধারাবাহিকভাবে এ আমল করে যেতে হবে। কখনো তুমি নফসের উপর বিজয়ী হবে আবার কখনো শয়তান বিজয়ী হবে। কিন্তু এতে ঘাবড়ালে চলবে না। আমল ছেড়ে দেয়া যাবে না। কারণ, এতে আল্লাহর কোন রহস্য ও হেকমত লুকায়িত থাকতে পারে। ইনশাআল্লাহ এভাবে জয়-পরাজয় ও উন্নতি-অবনতির পথ ধরে একদিন কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে।

এ আমল করে প্রথম দিনই যদি কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছে যাও, তবে 'আমি জুনাইদ বাগদাদী ও নিযামুদ্দীন আউলিয়া বনে গেছি' এ ধরনের আত্মতুষ্টি তোমাকে বিভ্রান্ত করবে। সুতরাং এ আমলে কখনো সফলতা কখনো ব্যর্থতার দেখা মিলবে। যেদিন সফলতা আসবে, সেদিন শুকরিয়া আদায় করবে। যেদিন ব্যর্থতা আসবে, সেদিন তাওবা-ইস্তেগফার করবে। নিজের নফসের ওপর শাস্তি প্রয়োগ করবে এবং নিজের খারাপ আমলের ব্যাপারে অনুতাপ ও অনুশোচনা প্রকাশ করবে। এ অনুতাপ মানুষকে নিম্ন থেকে অনেক উচ্চে পৌঁছিয়ে দেয়।

হযরত আমিরে মুয়াবিয়া রাযি.-এর একটি ঘটনা

হযরত আশরাফ আলী থানবী রহ. হযরত মুয়াবিয়ার রাযি.-এর একটি ঘটনা লিখেছেন যে, তিনি প্রতি রাতে তাহাজ্জদ নামায পড়ার জন্য জাগ্রত হতেন। একদিন তাঁর ঘুম অতি গভীর হয়, ফলে তাহাজ্জদ কাজা হয়ে যায়। পরদিন সারাবেলা কেঁদে কেঁদে কাটান আর 'হায় খোদা আমার তাহাজ্জদ কাজা হয়ে গেল' বলে তাওবা-ইস্তেগফার করেন। পরের রাতে তাহাজ্জদের সময় এক লোক এসে তাঁকে জাগিয়ে দেয়। লোকটি একেবারে অপরিচিত হওয়ার কারণে মুয়াবিয়া রাযি. তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কে?' সে উত্তর দেয়, 'আমি ইবলিস।'

– মুয়াবিয়া রাযি. : তুমি ইবলিস হলে আমাকে তাহাজ্জদের জন্য জাগানোর কী মতলব?

– ইবলিস : আরে আপনি উঠুন, তাহাজ্জদ পড়ুন।

– মুয়াবিয়া রাযি. : তোমার কাজতো তাহাজ্জদে বাধা দেয়া। তুমি তাহাজ্জদের জন্য ডাকছ কীভাবে?

– ইবলিস : আসল কথা হল, গত রাতে আমি আপনাকে বিছানায় আঁকে রেখেছিলাম। আমি আপনার তাহাজ্জদ কাজা করে দিয়েছিলাম। কিন্তু আপনি সারাদিন কান্নাকাটি ও তাওবা-ইস্তেগফার করে এত উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছে গেছেন যে, তাহাজ্জদ পড়েও এত উচ্চ মাকামে পৌঁছতে পারতেন না। এর চেয়ে আপনার তাহাজ্জদ পড়াই আমার পক্ষে ভাল। তাই আজ আমি নিজেই আপনাকে তাহাজ্জদের জন্য ডেকে দিচ্ছি, যেন অতিরিক্ত নেকী কামাই করতে না পারেন।

অনুশোচনা ও তাওবা দ্বারা মর্যাদা বৃদ্ধি পায়

মানুষ যদি আপন কৃতকর্মের প্রতি খাঁটি মনে অনুতপ্ত হয় এবং ভবিষ্যতে এর পুনরাবৃত্তি না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তার এত বেশি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেবেন, যার কল্পনাই সে করতে পারে না।

হযরত ডাক্তার আবদুল হাই রহ. বলতেন, যখন কোন বান্দা পাপ করে আল্লাহর কাছে তাওবা করে, তখন আল্লাহ তাআলা সেই বান্দাকে লক্ষ্য করে বলেন, তুমি যে ভুল করে পাপাচারে লিপ্ত হয়েছ, যা তোমাকে আমার সাত্তার (দোষ গোপনকারী) গাফফার (ক্ষমাশীল) ও রহমান (দয়াশীল) গুণের আশ্রয়প্রার্থী বানিয়েছে, তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর ও মঙ্গলবাহী বনে গেল।

হাদীস শরীফে এসেছে, ঈদের দিনে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের স্বীয় ইজ্জত ও জালাল তথা মর্যাদা ও মাহাত্যের শপথ করে বলেন, আজ এসব লোকেরা সমবেত হয়ে কর্তব্য পালন করছে। আমাকে ডাকছে, ক্ষমা প্রার্থনা করছে এবং কাঙ্খিত বস্তুর আবেদন জানাচ্ছে। আমার ইজ্জত ও জালালের কছম, আমি তাদের দুআ কবুল করব। তাদের গুনাহসমুহকে নেকী দ্বারা বদলে দেব।

এখন প্রশ্ন জাগে, এসব গুনাহ নেকী দ্বারা কীভাবে পরিবর্তন হয়ে যাবে? উত্তর হল, মানুষ ভুল করে যখন কোন পাপকাজ করে এবং সে অনুতাপ ও অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে আল্লাহর কাছে ফিরে যায়, আল্লাহকে কাতরভাবে ডেকে বলে, 'হে খোদা অজ্ঞাতে অবহেলায় এ অন্যায় করে ফেলেছি। দয়া করে মাফ করেন। তখন আল্লাহ তাআলা শুধু মাফই করেন না, বরং এর বদৌলতে তার মর্যাদাও বৃদ্ধি করে দেন। এভাবে এ গুনাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হয়ে যায় এবং তার জন্য সুফল হিসেবে আবির্ভূত হয়।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ

'(যারা নিজ গুনাহ থেকে তাওবা করে নেক আমল করবে) আল্লাহ তাআলা তাদের পাপগুলো পূণ্যে রূপান্তরিত করে দেবেন।' (সুরা ২৫ ফুরকান, আয়াত-৭০)

গুনাহ আমার কি ক্ষতি করবে

নাজমুল হাসান নামক এক বুযুর্গ যিনি থানবী রহ.-এর সোহবতে থাকতেন। তিনি একজন বড় মাপের ওলী ছিলেন। তিনি কবিতা আবৃত্তি করতেন। তাঁর একটি পংক্তি আমার ভাল লাগে এবং বারবার মনে পড়ে। যার অর্থ হল–

অনুতাপ প্রকাশের পেয়ে গেছি ধন,
পাপ আর করবে কি অহিত সাধন।

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যেহেতু আমাদেরকে অনুতাপ অনুশোচনা ও রোনাজারি দান করেছেন, আর আমরা দুআও করছি, 'হে আল্লাহ! আমার এ অপরাধ ক্ষমা করে দিন' তাই এ গুনাহ ক্ষতি করতে পারবে না।

গুনাহ আল্লাহ তাআলারই সৃষ্টি। হেকমত ছাড়া কোন কিছুই তিনি সৃষ্টি করেন না। গুনাহ তৈরির হেকমত হল, গুনাহ করার পর তাওবা করলে, অনুতপ্ত হয়ে কান্নাকাটি করলে এবং ভবিষ্যতে না করার প্রতিজ্ঞা করলে এ তাওবার বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা কল্পনাতীত মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেবেন।

আজীবন লড়াই চলবে

সুতরাং রাতে 'মুহাসাবা' করার সময় যখন জানতে পারবে গুনাহ সংঘটিত হয়েছে, তখন তাওবা-ইস্তেগফার করবে। আল্লাহর দিকে ফিরে যাবে, হতাশ হবে না। কারণ, জীবনটা এক ধরনের লড়াইয়ের নাম। মৃত্যু পর্যন্ত নফস ও শয়তানের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। আর লড়াইয়ের অমোঘ নিয়ম হল, কখনো তুমি জিতবে, কখনো প্রতিপক্ষ জিতবে। তাই শয়তান তোমাকে পরাজিত করলে সাহস হারিয়ে বসে পড়ো না বরং পুনরায় সাহস ও শক্তি সঞ্চয় করে শয়তানের সাথে লড়াই কর। 'সাহস না হারিয়ে পুনরায় মোকাবেলার জন্য দাঁড়ালে শেষ বিজয় আমাদেরই হবে' -এ ওয়াদা আল্লাহ তাআলা করেছেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

'শেষ পরিণাম মুত্তাকিদের জন্য এবং বিজয় তোমাদেরই।'

(সূরা ২৮ কাসাস, আয়াত-৮৩)

অগ্রসর হও, আল্লাহ স্বাগতম জানাবেন

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

'যারা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে অবশ্যই আমি তাদের পথ দেখাব।'

(সূরা ২৯ আনকাবুত, আয়াত-৬৯)

'যারা আমার পথে জিহাদ করে' অর্থাৎ নফস ও শয়তানের সাথে তোমরা এভাবে লড়াই করবে যে, শয়তান তোমাদের ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে, আর তোমরা তার মোকাবেলা করছ এবং মরণপণ প্রচেষ্টায় ভ্রান্ত পথ থেকে বেঁচে চলছ, তবে আমার প্রতিশ্রুতি রইল যে, অবশ্যই অবশ্যই আমি প্রচেষ্টাকারী ও লড়াইকারীদের নিজের রাস্তার সন্ধান দিব।

হযরত থানবী রহ. বলতেন, আমি এই আয়াতের অনুবাদ করি এভাবে, যে ব্যক্তি আমার রাস্তায় প্রচেষ্টা চালায়, আমি তার হাত ধরে আমার রাস্তায় পরিচালিত করি।

আয়াতটি বুঝাতে একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন, শিশু যখন হাঁা শুরু করে, বাবা-মা তখন তাকে চলতে ও হাঁতে শেখায়। একটু দূরে দাঁড় করে দিয়ে বলে 'এদিকে আসো'। বাচ্চা যদি সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে এবং সামনে পা না বাড়ায়, তাহলে বাবা-মাও দূরে দাঁড়িয়ে থাকে, তাকে কোলে নেয় না। কিন্তু

বাচ্চা এক পা ফেলে অপর পা ফেলতে পড়ে যেতে লাগলে বাবা-মা পড়ে যাওয়ার আগেই তাকে ধরে ফেলে এবং পরম স্নেহে কোলে নেয়। কারণ বাচ্চা তার সাধ্যমত চেষ্টা করেছে।

এমনিভাবে মানুষ আল্লাহর পথে চলার চেষ্টা করলে, তার পথে পা বাড়ালে, আল্লাহ তাআলা তাকে সাহায্য-সহযোগিতা করবেন না, এগিয়ে এসে তাকে ধরবেন না, এমনটি হতেই পারে না। বরং এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা ওয়াদা দিচ্ছেন, তোমরা চলতে শুরু করলে আমি এগিয়ে গিয়ে তোমাদেরকে কোলে তুলে নেব। অতএব সাহসিকতার সাথে নফস ও শয়তানের মোকাবেলা কর। তাঁর দরবারে হতাশার স্থান নেই। অন্যায় হলেও নিরাশ হয়ো না, চেষ্টা অব্যাহত রাখ। ইনশাআল্লাহ একদিন সফল হবেই।

সারকথা হল, তুমি তোমার কাজ কর, আল্লাহ তাআলা তাঁর কাজ অবশ্যই করবেন। মনে রেখ, তোমার কাজে ত্রুটি হতে পারে কিন্তু আল্লাহ তাআলার কাজে ত্রুটি-বিচ্যুতির কোন সম্ভাবনা নেই। তুমি পা বাড়ালে তিনি পথ খুলে দেবেন। এ দিকে ইঙ্গিত করেই নবী সা. বলেন, 'মূতূ কবলা আন তামূতূ'। মরার আগে মর আর হিসাবের আগেই হিসাব কর।

আল্লাহর সামনে কি জবাব দেবে

হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই রহ. বলতেন, মোহাসাবার একটি পদ্ধতি হল, তুমি কল্পনা কর 'এখন তুমি হাশরের ময়দানে দাঁড়িয়ে আছ, তোমার হিসাব-নিকাশ শুরু হয়েছে, আমলনামা পেশ করা হচ্ছে, তোমার আমলনামায় যেসব অপকর্ম ছিল সকলের সামনে তা উন্মোচিত হচ্ছে এবং আল্লাহ তাআলা প্রশ্ন করছেন– এ অপকর্ম তুমি কেন করেছ?'

এর উত্তরে তখন কী বলবে? আজ কোন মৌলবী যখন তোমাকে বলে, অমুক কাজ কর না, দৃষ্টির হেফাজত কর, সুদ-ঘুষ থেকে বেঁচে চল, মিথ্যা বল না, গীবত কর না, টিভি দেখ না, বিয়ে শাদীর অনুষ্ঠানাদিতে পর্দাহীনতা থেকে বেঁচে চল। উত্তরে তোমরা তাদেরকে বলে থাক, আমরা কি করব, যুগটাই খারাপ। পৃথিবী উন্নতি ও সভ্যতার শিখরে পৌঁছে গেছে। মানুষ চাঁদে গেছে। আমরা কি তাদের থেকে পিছিয়ে থাকব? দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে পড়ব? বর্তমান সমাজে চলতে গেলে এসব না করে উপায় নেই।

এ উত্তর মৌলবীদের দিতে পার। কিন্তু কেয়ামতের ভয়ঙ্কর দিবসে মহাপ্রতাপশালী আল্লাহর সামনে এ অজুহাত দেখাতে পারবে কি? বুকে হাত দিয়ে চিন্তা করে বল, এ জবাব যদি সেখানে না চলে, এখানে কীভাবে চলবে?

আল্লাহর কাছে সাহস ও প্রত্যয় প্রার্থনা কর

তোমরা যদি আল্লাহর কাছে এ উত্তর দাও যে, 'হে আল্লাহ! সমাজ ও পরিবেশ ও লোকলজ্জার ভয়ে, অপারগ হয়ে আমি গুনাহ করতে বাধ্য হয়েছি'। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, 'অপারগ তুমি ছিলে, নাকি আমি ছিলাম?' তোমরা উত্তর দেবে, 'ওহে মাবুদ! আমিই অপারগ ছিলাম'। আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করবেন, 'তবে তুমি তোমার অপারগতা দূর করার প্রার্থনা করনি কেন? আমি কি তা দূর করতে সক্ষম ছিলাম না? আমার নিকট দুআ করতে, হে খোদা! আমি অপারগ, আপনি আমার অপারগতা দূর করে দিন, নয়তো আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমাকে শাস্তি দেবেন না। তাহলে তো আমি তোমার অপারগতা দূর করে দিতাম, তোমাকে ক্ষমা করে দিতাম। তোমাকে কোন প্রকার শাস্তি দিতাম না।

বলুন! আল্লাহ তাআলার পাল্টা এ প্রশ্নের কোন উত্তর আছে কি? কোন উত্তর নেই। যেহেতু কোন উত্তর নেই, তাই একটি কাজ করুন, আর তা হল, নিজেদেরকে যে কাজ করতে অপারগ দেখছেন, চিন্তা করে দেখলেন যে, আমি এই পরিবেশে এই গুনাহ ছাড়তে পারছি না, অথবা অমুক সাওয়াবের কাজ করতে পারছি না। এই অপারগতা চাই বাস্তব সম্মত হোক, অথবা সামাজিক অপারগতাই হোক, এ ব্যাপারে প্রতিদিন দুআ করুন, 'হে আল্লাহ! আমার সামনে এই অপারগতা। আমি এ থেকে বাঁচার সাহস পাচ্ছি না। আপনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। আপনি আমার এই অপারগতা ও সাহসহীনতা দূর করে দিন। গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার সাহস ও হিম্মত দিন। আমীন।

আল্লাহর দানের ভাণ্ডারে কোন অভাব নেই

মোটকথা, আল্লাহর কাছে চাও, তার কাছেই প্রার্থনা কর। অভিজ্ঞতার আলোকে এ কথা অবশ্যই প্রমাণিত, আল্লাহর কাছে চাইলে তিনি খুশি হন, এবং প্রার্থীকে অবশ্যই তার চাহিদা পুরা করে দেন। পক্ষান্তরে না চাইলে তিনি নাখোশ হন। আর না চাইলে দেবেন কী? কবি বলেন–

রোগ যদি কেউ নাহি চেনে, চিকিৎসা তার নাই,
মনে রেখ খোদার দানের, নাই উপমা নাই।

রোগের ব্যথায় কাতরতা না থাকলে, গুনাহ থেকে বাঁচার আকুলতা ও ব্যকুলতা না থাকলে তাকে চিকিৎসা দেবে কে? প্রার্থনাকারীকে দেয়ার জন্য আল্লাহর ভাণ্ডার সদা উন্মুক্ত।

সকাল-সন্ধ্যা যে চারটি আমলের কথা বললাম, এর উপর আমল করলে আলোচ্য হাদীস তথা 'মরার আগেই মর, হিসেবের আগেই নিজের হিসাব কর' অনুযায়ী আমলকারী হিসেবে গণ্য হওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণের তাওফীক দান করুন, ক্ষমা করুন এবং এসব কথার উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন ॥

সমাপ্ত